বনানী শিকদার

রিলি

বিবাহ ডট কম
দ্বিতীয় খণ্ড

banglabooks.in

প্রচ্ছদনির্মিতি: ইন্দ্রনীল ঘোষ

banglabooks.in

রিলি

বনানী শিকদার

প্রিয়া বুক হাউস
৬৪, কলেজ স্ট্রীট
কলকাতা - ৭০০ ০৭৩

বনানী শিকদার

রিলি

লেখকের প্রকাশিত অন্যান্য বই -

১। বাস্তবের আড়ালে
(মাইকেল মধুসূদন স্মৃতি সম্মান ২০১৯ পুরস্কারপ্রাপ্ত)
২। সময় তোমার হাত ধরে
(বাস্তবের আড়ালে দ্বিতীয় খণ্ড)
৩। পিপাসা যখন
(সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত স্মৃতি সম্মান ২০২০ পুরস্কারপ্রাপ্ত)
৪। বিবাহ ডট কম
৫। অন্ধকারে ভালবাসা
৬। গল্প সংগ্রহ

বিবাহ ডট কম
দ্বিতীয় খণ্ড

banglabooks.in

RILI

A Novel by Banani Sikdar

₹ : 280.00

গ্রন্থস্বত্ব ঃ লেখিকা

প্রথম প্রকাশ ঃ কলকাতা বইমেলা ২০২২

প্রকাশক

দুলাল চন্দ্র সিংহ

৪, পটুয়াটোলা লেন,

কলকাতা - ৭০০ ০০৯

মোবাইল ঃ ৯৪৩৩৩২৪৪৬৩

E-mail : priyabookhouse64@gmail.com

Website : www.priyabookhouse.org

ISBN : 978-93-81827-57-4

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

লেখকের অথবা স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোন অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোন যান্ত্রিক উপায়ে (যেমন গ্রাফিক্স, ইলেকট্রনিক্স বা অন্য কোন মাধ্যম যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য সঞ্চয় রাখার কোনও পদ্ধতি)-এর মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না অথবা কোন ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

অক্ষর বিন্যাস

হোপ

১৭৪, বীরেন রায় রোড (ওয়েষ্ট), কেঠোপোল, কলকাতা - ৭০০ ০৬১

মুদ্রক

স্টারলাইন

১৯ এইচ/এইচ/১২, গোয়াবাগান স্ট্রীট, কলকাতা - ৭০০ ০০৬

প্রচ্ছদ

ইন্দ্রনীল ঘোষ

মূল্য ঃ দুই শত আশি টাকা মাত্র

উৎসর্গ

মেয়েকে

লেখকের প্রকাশিত অন্যান্য উপন্যাস ঃ

১। বাস্তবের আড়ালে (মাইকেল মধুসূদন স্মৃতি সম্মান ২০১৯ পুরস্কার প্রাপ্ত)

২। পিপাসা যখন (আন্তর্জাতিক সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত স্মৃতি সম্মান ২০২০ পুরস্কার প্রাপ্ত)

৩। সময় তোমার হাত ধরে (বাস্তবের আড়ালে দ্বিতীয় খণ্ড)

৪। বিবাহ ডট কম

৫। অন্ধকারে ভালোবাসা

৬। মহাপ্লাবন

৭। ছোট গল্প

ড. নজরুল ইসলাম, বি এস-সি, এম এ, এম বি এ, পি-এইচ ডি, ডি লিট,
আই পি এস (অবসরপ্রাপ্ত)
৫৭৯ মাদুরদহ, কলকাতা - ৭০০১০৭

প্রিয়া বুক হাউস থেকে বনানী শিকদার-এর 'রিলি' উপন্যাস প্রকাশিত হচ্ছে। নাম চরিত্র, রিলি উপন্যাসের নায়িকা।

রিলি ভাঙা পরিবারের মেয়ে। মায়ের কাছে বড় হতে হতে, তার মনে, মায়ের প্রতি ভালবাসা-ঘৃণা ও শ্রদ্ধা-অশ্রদ্ধার এক মিশ্র অনুভূতি তৈরী হয়েছে।

রিলি মেধাবী ছাত্রী। কিন্তু ক্লাস টেনে ওঠার পর থেকে তার লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহ কমে যেতে শুরু করে। তবুও স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় তার ফল বেশ ভাল হয়। কিন্তু উচ্চ মাধ্যমিক থেকে রেজাল্ট খারাপ হতে থাকে। বি টেকের ফাইনালে প্রায় ফেল করতে বসেছিল। কোনরকমে পাশ করে।

কোন কাজে যোগ দেবার পরিকল্পনা তার ছিল না। ছিল না জীবনে চাকরি করে প্রতিষ্ঠিত হওয়ারও। বলতে গেলে, তার মায়ের তাড়াতেই সে একটা অফিসে যোগ দেয়। টিন্ডারে রিলির পরিচয় হয় আভাস নামক এক যুবকের সঙ্গে। আভাসের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা তার ছাড়াছাড়ি হয়ে যাওয়া পুরানো প্রেমিকের স্মৃতির ওপর আস্তরণ ফেলতে শুরু করে।

কিন্তু সেখানেও দেখা দেয় নানা সমস্যা। কাজের চাপ তো ছিলই। অফিস পলিটিক্সের সে শিকার হয়। বসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে মেয়েদের প্রোমোশন পাবার চেষ্টা তাকে আহত করে। বাইরের দুনিয়ার অসততা, লোকেদের কূটনৈতিক মেলামেশা, কোন কোন ছেলেমেয়ের যথেচ্ছাচার তাকে আঘাত দেয়। সৎভাবে বেঁচে থাকা তার কাছে কঠিন মনে হয়।

ততদিনে আভাসের সঙ্গে তার সম্পর্ক অনেক এগিয়ে গেছে। কিন্তু সামাজিক বিধিনিষেধ আভাসের রিলির বাড়ীতে আসার পথে বাধা সৃষ্টি করেছে। আভাসের পরিবারের থেকেও সমস্যা ছিল। যার আভাস আভাস রিলিকে আগে কখনও দেয়নি।

এরকমভাবে ঔপনাসিক রিলির জীবনের কাহিনীকে বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। রিলি ছাড়াও তার মা, আভাস, আভাসের পরিবারের সদস্যদের চরিত্রকে কাহিনীর পরিপ্রেক্ষিতে ফুটিয়ে তুলেছেন।

বলা বাহুল্য, কাহিনীর বিন্যাস এবং চরিত্রের পরিস্ফুটন রিলির ব্যতিক্রমী জীবনের রূপরেখাকে ঔজ্জ্বল্য দান করেছে। উপন্যাসে ঔপন্যাসিকের এই মুন্সিয়ানা পাঠকদের মুগ্ধ করবে বলেই আমার ধারণা।

আমি এই উপন্যাসের সাফল্য কামনা করি।

২৫.১০.২০২১

(ড. নজরুল ইসলাম)

লেখকের কথা

বিবাহ ডট কম-এর দ্বিতীয় খণ্ড নিয়ে কোন ভাবনা প্রকৃতপক্ষে এই মুহূর্তে আমার ছিল না। মেয়ের অনুপ্রেরণায় হাত দিয়েছি। তাতে করে যুবক-যুবতীদের জীবনধারার উপর আলোকপাত সম্ভব হয়েছে। তুলে ধরা গেছে দুই প্রজন্মের মিল-অমিল নিয়ে কখনো বন্ধুত্বপূর্ণ কখনো সংঘর্ষময় সহাবস্থানকে।

বনানী শিকদার

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমার প্রিয় ‘লিও’

Click Here For
More Books>>

এই ছেলেটিকে মায়ের কিছুটা বাস্তব লাগে। বাস্তব মানে হল সাচ্চা, আসল,খাঁটি, অকৃত্রিম, অকাল্পনিক অথবা প্রামাণিক। অথবা অকল্পিত। অকল্পিত তো বটেই।

মা একটা সার্জারির পরে পুনেতে ছয় মাস বিশ্রাম নিয়ে তাঁর সন্দীপ, শৈবাল ঘোড়াই, শ্রীধর, শ্রীকুমার, শ্রীগোপাল পর্ব সেরে তিন মাস আগে কলকাতায় ফিরেছেন। মাকে বলেছিলাম, ''তোমার জন্য শ্রীমান লোকটি কিন্তু খারাপ ছিল না।''

মা বলেছিলেন, ''অনিন্দিতাকে বলে দিয়েছি কেন আমার পছন্দ নয়।''

''শ্রীধর প্রশংসার বিনিময়ে তোমার কাছে শুধু একটু সৌজন্যই তো আশা করত!''

''রিলি, শরীরের গঠন নিয়ে তারিফ-বিদ্রূপ কিছুই আমার ভাল লাগে না।''

''তুমিও শ্রীকুমারকে কালো বলেছ!''

''হ্যাঁ, বলেছি, ওর রঙকে বলেছি। মনের রঙ।''

''কি করে দেখলে তুমি মনের রঙ?''

''আমার এখন বলতে ইচ্ছে করছে না। আমি হতাশ।''

তবু মাকে জোর করেছিলাম। মা বলেছিলেন, ''সে আমাকে মিথ্যে বলেছে।''

''কি মিথ্যে?''

''বলেছে সে চিরকুমার। কিন্তু তা নয়। বিবাহিত ছিল।''

''ডিভোর্স হয়েছে?''

''হ্যাঁ।''

''কেন?''

''বউ নাকি খুব কালো ছিল।''

''তুমি কিছু বললে না?''

''সুযোগ পেলাম কোথায়! ননস্টপ কথা বলে।''

*****

এখানে আমি আবার একা। নালায়ক সন্দীপের চটুল প্রেমের বাড়িতে ভাঙা হৃদয়ের মেরামত হয়নি। ডিউটির ঘণ্টাগুলোতে অফিসে কাজের চাপ এবং অফিস পলিটিক্স। ঘরে ফিরলেই একাকীত্ব। সারাদিনের ক্লান্তি, বিরক্তি মনের কাছের কোন মানুষের সঙ্গে কথা বলে ঝেড়ে ফেলব তার উপায় ছিল না। মনের মানুষটিই তো ছিল না। মা কলকাতা যাওয়ার পরপরই আমার সন্দীপ যাদবের সঙ্গে সেপারেশন অ্যানিভার্সারি এসেছিল। অফিস থেকে ছুটি নিয়ে তা বাড়িতে একাকী মৌনতার সঙ্গে পালন

করতে চেয়েছিলাম।

ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার সময় কলেজের কয়েকটি ছেলের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়েছিল। যেমন অনুরাগ, লাভ, সঞ্জয় এবং সঞ্চিত। একই ইয়ারে হলেও সবাই অন্য ডিভিশনে। অনুভব, লাভ, সঞ্জয় ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তি হয়েছে। সঞ্চিত ফার্স্ট ইয়ারে ওয়াই ডি (ইয়ার ড্রপ) হয়ে ফার্স্ট ইয়ারেই থেকে গেছে। চারজনের মধ্যে দু'জনের অর্থাৎ সঞ্জয় এবং সঞ্চিতের কাছ থেকে আমি প্রেমের প্রস্তাব পেয়েছিলাম। কিন্তু একজনেরও প্রস্তাবে রাজি হইনি।

সেই সঞ্জয় কোস্ট গার্ডের ভাইভা ক্লিয়ার করে কয়েক মাস আগে তিরুবনান্থাপুরমে ট্রেনিং করতে গেছে। ট্রেনিংশেষে সে চেন্নাইতে যাবে। সঞ্চিত 'এম বি এ' করতে ইন্দোরে গেছে। অনুভব মুম্বাইতে চাকরি নিয়েছে। লাভ দিল্লিতে পোস্টিং নিয়ে মা-বাবার সঙ্গে থাকছে। সব কিছুই খুব তাড়াতাড়ি ঘটে গেছে। আমি মাঝে মাঝে মাকে ফোন করতাম, "মাম্মা কি করি?"

মা একদিন বলেছিলেন, "তোমার দু'জন ফটোগ্রাফার বন্ধু ছিল যে!"

"ওরা ফটোগ্রাফার মাম্মা। ওদের সঙ্গে ইনস্টাগ্র্যামের জন্য ফটোশুটের দিন ছাড়া অন্য সময় বেরোতে ইচ্ছে করে না।"

কখনো কখনো মা আমার মনের নাগাল একশো শতাংশ পেতে পেতেও ব্যর্থ হন। কাকে ঠিক কোন চোখে দেখছি বুঝতে পারেন না। কাকে বন্ধুত্বের কোন ধাপ থেকে কোন ধাপে উত্তীর্ণ করেছি অথবা কোন ধাপ থেকে কোন ধাপে অবতীর্ণ করেছি এবং কেন করেছি সেসব কথা ব্যাখ্যা না করা পর্যন্ত গোলোকধাঁধার মধ্যে ঘুরতে থাকেন।

মায়ের উত্তর ছিল, "এমন বলো না। দু'জন ফটোগ্রাফারের মধ্যে একজন, সুশীল না কি যেন তার নাম..."

"হ্যাঁ, সুশীল।"

"সে তোমার কলীগও এবং আমি যতদূর জানি, চাকরিটা তুমি তার জন্যই পেয়েছ।"

"ও অন্য অফিসে আছে। চাকরিটা যে তার জন্য পেয়েছি তা নিশ্চিত করে বলা যাবে না। আর পেলেও, আমি তার প্রতি গ্রেটফুল থাকব, ওর সঙ্গে কাজ ছাড়া এমনি এমনি ঘোরাঘুরি করতে পারব না।"

মা চুপ করে রইলেন। নিশ্চয়ই কিছু ভাবছেন।

"কি ভাবছ?"

"ভাবছি। ঠিকই বলেছ। কার সঙ্গে কার কথা বলতে ভাল লাগবে এটা পুরোপুরি তার ব্যক্তিগত ব্যাপার।"

অফিস থেকে ছুটি নিয়ে বাড়িতে শেষপর্যন্ত একাকী নীরবে সন্দীপ যাদবের সঙ্গে সেপারেশন অ্যানিভার্সারি পালন করতে ব্যর্থ হলাম। আমার আসলে সেকেন্ড শিফট

ছিল। অফিসে গেলে ক্যাব আমাকে নিতে আসত সকাল সাড়ে দশটায়। আমি ন'টার সময় বাথরুমের শাওয়ারের নিচে দাঁড়িয়ে ভাবলাম, একবছর অনেক সময়, এবার পরিবর্তন দরকার, প্রেমের জন্য দ্বিতীয় কাউকে নাইবা পেলাম, দু'য়েকটি নতুন বন্ধুর খোঁজ তো করতে পারি যাদের সঙ্গে দেখা হতে পারে, মাঝে মাঝে হ্যাং-আউট হতে পারে। স্নান সেরে সাড়ে দশটাতেই আমি টিন্ডারে 'অনামিকা' নামে একটা অ্যাকাউন্ট খুলে ফেললাম। প্রোফাইলে অন্য মেয়ের ছবি। একরকমের ফেক আইডি। ফেক আইডির মাধ্যমে সত্যিকারের বন্ধু পাওয়ার চেষ্টা। অ্যাকাউন্ট খুলতেই একটি ছেলের কাছ থেকে মেসেজ, ''হেলো।''

তার প্রোফাইল চেক করলাম। রচিত ২৫

ওয়ান্না (ওয়ান্ট টু) এক্সচেঞ্জ নাম্বারস অ্যান্ড মিমস ব্যাক অ্যান্ড ফোর্থ আনটিল উই ফাইন্ড ইচ আদার সো ফানি দ্যাট উই ডিসাইড টু হ্যাং-আউট।

দাড়ি-গোঁফ খুবই সামান্য। তবু দেখতে বেশ। মাথাভর্তি চুল। স্লিম চেহারা। ফর্সা। হাইট কত বোঝা গেল না।

ভাবলাম চলবে। উত্তর টাইপ করি, ''হে। প্রোফাইল পিকচারে তোমাকে সিরিয়াল কিলার-এর মত দেখতে লাগছে।''

আরেকটি ছেলের কাছ থেকে মেসেজ, ''হাই, সুমিত বোস হিয়ার।''

তার প্রোফাইল চেক করলাম। সুমিত ২৭

ইঞ্জিনিয়ার বাই চান্স, ম্যানেজমেন্ট বাই প্যাশন। ফুডি।

ছেলেটির গাবু গাবু চেহারা। জিজ্ঞেস করলাম, ''তুমি কি খেতে ভালবাস?''

''পিৎজা...যে কোন খাবার... বড়াপাও ছাড়া।''

আরেকটি ছেলের মেসেজ, ''হাই অনামিকা।''

তারও প্রোফাইল চেক করলাম। পিয়ুস শ্রীবাস্তব ২৬

দিল্লি থেকে পুনেতে এসেছি। ফিটনেস ফ্রিক। পার্টি অ্যানিমল। একসঙ্গে কখনো প্ল্যান করে কফি শপে বসা যেতে পারে। এখানে (টিন্ডারে) আনন্দ, মজা করতে অ্যাকাউন্ট খুলেছি।

আমার মনে হয় যারা এমন লেখে তারা সাধারণত দু'য়েকটি কথার পরেই ও এন এস বা ওয়ান নাইট স্ট্যান্ড-এর দিকে ঝোঁকে। তবু উত্তর দিই, ''বলো।'' বাতিল যে কোন সময় করা যেতে পারে। করুক সে ওয়ান নাইট স্ট্যান্ড কিন্তু আমার সঙ্গে না করতে চাইলেই হল। অনুরাগও অন্য দু'য়েকটি মেয়ের সঙ্গে ওয়ান নাইট স্ট্যান্ড করেছে কিন্তু সে আমার খুব কাছের বন্ধু। উদার মনের ছেলে অনুরাগ হ্যাং-আউটের সময় একসঙ্গে ডিনার অথবা লাঞ্চ করলে কখনো আমাকে বিল পে করতে দিত না। সঞ্চিতের সঙ্গে কলেজ থেকে একবারই হ্যাং-আউট করেছিলাম, যেদিন সে আমাকে

প্রস্তাব দিয়েছিল। প্রস্তাব দেবে বলেই হয়ত, সে-ই পে করেছিল। সঞ্চিতের মনের কথা সঞ্চিত-ই জানে। লাভ এবং সঞ্জয় 'ওয়ান ইজ টু ওয়ান' হিসেবে চলত। 'ওয়ান ইজ টু ওয়ান'এর অর্থ দু'জন অর্ধেক অর্ধেক পে করা। 'ওয়ান ইজ টু ওয়ান'কে আমরা 'টি টি এম এম'ও বলি। 'টি টি এম এম'এর পূর্ণ রূপ হল 'তু তেরা ম্যায় মেরা'। 'লাভ'-এর সঙ্গে হ্যাং-আউট করলে একদিন সে পে করত, অন্যদিন আমি। অথবা সে পে করলে আমি তাকে অর্ধেক টাকা দিয়ে দিতাম। লাভ-এর আমার কাছ থেকে টাকা নেওয়ার তাড়া থাকত না। কখনো দিলেই হল। 'আজ দে, এখন দে' বলে চাইত না। কিন্তু সঞ্জয় টাকা খুব চিনত। টাকা তার এখনই চাই কি চাই। সেটাও আমার সঞ্জয়ের প্রতি দুর্বলতা সৃষ্টি না হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ। আমাকে মোটেও আকৃষ্ট করতে পারেনি সঞ্জয়।

টিন্ডারের পরের ছেলেটি সাংঘাতিক। সে লিখেছে, "হাই অনামিকা, চেক মাই প্রো। আই থিংক আই উইল বি ইওর বেস্ট ম্যাচ।"

ছেলেটির প্রোফাইলে গেলাম। টেস্টলেস ২৭

লুকিং ফর আ এফ ডব্লু বি (ফ্রেন্ডশিপ উইথ বেনিফিট)। হিয়ার টু ফ্লার্ট সো দ্যাট আওয়ার কনভো (কনভারসেশন) ক্যান বিকাম মিমস। লেট'স গেট ডার্টি। আই ক্যান মেক ইউ ওয়েট উইথ মাই উইট অ্যান্ড ইফ দ্যাট ফেইলস আই হ্যাভ মিমস। মাই হিউমার ইজ অফেনসিভ। মাই ফেস ইজ লাইক মানডে বাট মিমস আর লাইক ফ্রাইডে নাইট। ওয়াকস আর গুড। ওন্ট গেট ইনটু ইওর প্যান্টস অন ফার্স্ট ডেট বাট কিসেস অ্যান্ড লাভ।

মুখে চাপদাড়ি, চোখে বেগুনি কাচের চশমা। মাথায় যেন গোল পাকিয়ে যাওয়া একশো কেন্নোর সমাবেশ—এমনই চুল। কালো রঙের গেঞ্জি পরে আছে টেস্টলেস। টেস্টলেস-এর প্রোফাইলে চেক করে তাকে হাওয়া করে দিই। অর্থাৎ আনম্যাচ করি।

রচিত আমার মেসেজের উত্তর দেয়, "আমার উদ্দেশ্য তাহলে সফল হল। কেননা আমি একটা শর্ট মুভিতে অভিনয় করেছিলাম। ছবিটা সেখান থেকেই নেওয়া।"

"কি নাম মুভির?"

সুমিত বোস লেখে, "চলো, আমরা বিভিন্ন জায়গায় আলাদা আলাদা খাবার টেস্ট করব।"

"পরের মাসে।"

"কেন?"

রচিত তার মুভির লিঙ্ক পাঠায়। দেখি সেটা। তাতে সে ট্রান্সজেন্ডারের অভিনয়

করেছে। একটি র‍্যাম্পে মেয়ের সাজে হেঁটেছে।

উত্তর দিই, "নট টু সাউন্ড লাইক আ পারভার্ট, কিন্তু র‍্যাম্পে তোমাকে দেখে ভাবলাম তোমার পা'গুলো আমার চেয়ে সুন্দর।"

সুমিত বোস আমার কাছ থেকে উত্তর না পেয়ে লেখে, "কি হল?"

আমার কাছে এখন টাকা নেই। "এই মাসে অফিসে কাজের খুব চাপ আছে।"

"ওকে।"

আরেকটি ছেলের মেসেজ, "হাই অনামিকা, আমার নাম রাহুল..."

"আর কিছু লিখো না প্লিজ।"

"কেন? তুমি কি আমাকে চেনো?"

আরে, চেনার জন্য সময় চাইছি। টেস্টলেসটা যা খেলা দেখালো! "না না, তোমার প্রোফাইলটা আগে চেক করতে দাও।"

ছেলেটি পাঞ্জাবি। ফর্সা। দেখে মনে হল লম্বাও। পুরো নাম রাহুল লিয়াকত। বয়স ২৬। মধ্যপ্রদেশের একটা স্যাঙ্কচুয়ারিতে কাজ করে। সেখানে কোয়ার্টারে সে একা থাকে।

সুমিত লেখে, "তুমি বই পড়তে ভালবাস?"

"খুউব।"

"কি ধরণের বই তোমার পছন্দ?"

"রোমান্টিক। তোমার?"

"অ্যাকশন স্টোরি।"

রাহুল লিয়াকতকে লিখি, "তুমি কোন স্যাঙ্কচুয়ারিতে কাজ করো?"

"সিঞ্জরি ওয়াইল্ড লাইফ স্যাঙ্কচুয়ারি। চলে এস। আমার সঙ্গে ঘুরে দেখে নেবে।"

কি ছেলেরে বাবা! আলাপ হল কি চলে এস বলে!

রাহুল লেখে, "চিন্তার কিছু নেই। আমার কোয়ার্টারে থাকবে।"

কত মেয়েকে এভাবে কোয়ার্টারে ডেকে তাদের সঙ্গে থেকেছ? "পরের মাসে।"

"কেন?"

সুমিত লেখে, "তোমার পেট পছন্দ?"

"খুউব।"

"আমারও। আমার বেড়াল চটকাতে খুব ভাল লাগে।"

"বিমান নগরে একটি 'ক্যাফে' আছে—'হয়ার এলস'। ক্যাফের মালিকের পাঁচটা

বেড়াল প্রতিদিন সেখানে বসে থাকে। তাছাড়া ভিজিটরসরাও তাদের পেট নিয়ে আসে। চলে যেতে পারো।"

"তাহলে একদিন আমরা প্ল্যান করি?"

"বলেছি তো এ মাসে সম্ভব হবে না।"

রচিত লেখে, "কি হল? কি করছ?"

"ব্যস্ত আছি। একটু পরে কথা বলছি।"

আরেকটি নতুন ছেলের কাছ থেকে মেসেজ পাই, "হাই।"

প্রোফাইল চেক করি। উত্তর দেব কি না ঠিক করার জন্য প্রোফাইল আমাকে চেক করতেই হবে।

আভাস ২৬

"শুধু কথা বলার জন্য কাউকে চাই।"

এরও স্লিম চেহারা। এও ফর্সা। স্ট্রেট বাদামি চুল মাথায়। চোখ দুটো সবুজ। মুখ লম্বাটে। একেও দেখে লম্বাই মনে হল। আমার অনুমান ছেলেটি দেখতে সুদর্শন। তার প্রোফাইলে কেবলমাত্র এই একটি লাইন-ই দেওয়া আছে। সেই এক লাইন পড়ে আমার তাকে বড় বিষণ্ণ মনে হল। বললাম, "হে।"

"কি করছ?"

"অ্যাটাক অন দ্য টাইটানস সিজন ফোর-এর জন্য অপেক্ষা করছি।"

"বাহ্! আমিও ওটা দেখতে ভালবাসি।"

সুমিতের মেসেজ, "তুমি মিউজিক পছন্দ করো?"

"করতাম এক সময়।"

"কোন মিউজিক?"

"রক অ্যান্ড মেটাল।"

"আমিও। আমাদের অনেক মিল আছে। তাহলে আমাদের দেখা হতেই পারে।"

"ওহো, বলেছি না পরের মাসে!"

আভাস জিজ্ঞেস করে, "তোমার নারুটো সিরিজ কেমন লাগে?"

"নারুটো সিরিজ লম্বা বলে পছন্দ নয়।"

"কোথায় থাকো?"

"বিমান নগরে," মিথ্যে বলি। "তুমি?"

"পিম্পড়িতে।"

"একা?" হঠাৎ করেই জিজ্ঞেস করে ফেলি।

''না না, বাড়িতে আর সবার সঙ্গে।''

একা নেই জেনে একটু শান্তি। তাহলে সে 'আমি স্বাধীন, আমার সঙ্গে কয়েকদিন কাটিয়ে যাও, আমি তোমাকে এখানে নিয়ে যাব, সেখানে যাব' ইত্যাদি প্রস্তাবগুলো দেবে না।

''কতদিন পুনেতে রয়েছ?''

''জন্ম থেকে।''

''কোন বোর্ড থেকে স্কুল ফাইনাল করেছ?''

''মহারাষ্ট্র।''

আমিও মহারাষ্ট্র বোর্ড থেকে স্কুল ফাইনাল করেছি। এখনও পর্যন্ত ছেলেটিকে একমাত্র নারুটো ছাড়া বাকি সব কিছুতে যেভাবে চাই সেভাবেই পেয়েছি। বলি, ''মহারাষ্ট্র বোর্ডে ক্লাস এইট-এর ইংরেজি সিলেবাসে মন্টমেরেন্সি নামে একটা গল্প ছিল। আমার খুব প্রিয়।''

''আমারও।''

রাহুল লিয়াকত লেখে, ''উত্তর দিলে না যে!''

আমি আসলে ওখানে যেতে চাই না। ''ভেবে বলব।''

আভাস জিজ্ঞেস করে, ''তোমার স্কুলের নাম?''

''সেন্ট ক্লেয়ারস গার্লস হাই স্কুল,'' আরেকটা মিথ্যে। আমি সেন্ট ফেলিক্স-এ পড়েছি। ''তোমার স্কুলের নাম?''

''সেন্ট অ্যানড্রিউস হাই স্কুল। তোমার কলেজ?''

''এম আই টি কোথরুড,'' আবার মিথ্যে। ''তুমি?''

''জি এস পি এম।''

রচিত লেখে, ''এখনও ব্যস্ত?''

''হ্যাঁ প্লীজ।''

বাকি সবাইকে ছাঁটাই করে আমি আভাসকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ি।

জিজ্ঞেস করি, ''আর ইউ ক্যাট-ফিশিং মী?'' অর্থাৎ ''তোমাকে নিয়ে যে ইনফরমেশন তুমি দিয়েছ সেগুলো সব সত্যি তো?''

''কেন জিজ্ঞেস করছ?''

''ছেলেমেয়েরা অনেক সময় ফেক আইডি খুলে থাকে।''

''তুমি আমার ফেসবুক অ্যাকাউন্টটা দেখতে পারো।''

আভাস আমাকে তার ফেসবুক আইডি দেয়। টিন্ডারে এবং ফেসবুকে একই ব্যক্তির

ফটো। ফেসবুকের আভাসকে দেখে আমার আরও ভাল লাগল। কারণ যা টিন্ডারে স্পষ্ট ছিল না তা ফেসবুকে স্পষ্ট হয়েছে। আভাস-এর নানা ফটোতে তার চেহারার এবং সেই মডেলটির চেহারা, যাকে সন্দীপ তার নিজের চেহারা বলে আমাকে চার বছর ধরে ধোঁকা দিয়েছে তার ব্যাপক মিল! কে দিল এমন উপহার? ভগবান? নাহ্, ভগবান আমি বিশ্বাস করি না। তাহলে কে দিল? লোকের মুখে শুনেছি, লোকের মুখে জেনেছি এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে অনেকেই আছে যারা বাকি অনেকের মত হিন্দু হয়েও ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর মানে না, যারা মুসলিম হয়েও কোরান-নামাজ পড়ে না, যারা খ্রিস্টান হয়েও যিশু খ্রিস্টকে জানে না। সেই না মানা, না পড়া, না জানা অনেকের মধ্যে আবার অনেকে তাদের জীবনে অঘটন ঘটে যাওয়ার পরেও একদমই বিকারহীন থাকে। আবার অনেকে কি করে ঘটল তা নিয়ে ভাবতে চেয়ে মাথা খারাপ করে বসে থাকে। আবার অনেকে পাগল হওয়া থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে চেয়ে কিছু একটা অদৃশ্য শক্তি আছে ভেবে শান্ত হয়। আমি আগে কিছুই ভাবতাম না। আজ ভাবছি, সত্যিই কিছু একটা অদৃশ্য শক্তি আছে। মনে মনে বলি, "থ্যাঙ্কস টু অদৃশ্য শক্তি।" মনে ঘুর্ণিঝড় নিয়ে আভাসের টিন্ডারের পেজে আমি দেখি শুক্লা-পঞ্চমীর শান্ত, স্নিগ্ধ চাঁদ। আভাসকে তার ফটো দেখার প্রতিক্রিয়া জানাই—ইউ আর হ্যান্ডসাম।

বছরখানেক আগের কথা। সে এক অস্বস্তিকর সময়। একদিকে সদ্য সন্দীপের কাছ থেকে আলাদা হয়ে যাওয়ার কষ্ট, অন্যদিকে মা-বাবার কাছ থেকে অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর হওয়ার চাপ। দু'জনের মধ্যে মিলের খুব অভাব। কিন্তু আমার চাকরির প্রশ্নে তাঁরা ভয়ংকর জোট বেঁধে কাজ করছেন। কোন না কোন কম্পানিতে আমাকে ঢোকাতেই হবে। মা বলেন, "স্যালারি পাঁচ হাজার হলেও না করবে না।" বাবা বলেন, "প্রথম দু'চার মাস স্যালারি না পেলেই বা ক্ষতি কি! অভিজ্ঞতা তো হবে। অভিজ্ঞতার দাম অনেক। তাতে করে তোমার অফিসে যাওয়ার অভ্যেসটাও তৈরি হবে।"

সঞ্চিত এবং লাভ বিমান নগরে বাসা ভাড়া করে আছে। সঞ্চিত 'আই এ এস'এর প্রস্তুতি করছে এবং লাভ অ্যামাজনের কাস্টমার কেয়ারে কুড়ি হাজার টাকা বেতনের চাকরি করছে। অনুরাগ এখনই চাকরির দিকে না গিয়ে উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের আশায় সিমবায়োসিস-এ 'এম বি এ'র সেকেন্ড ইয়ারে উত্তীর্ণ হয়েছে। সে সিমবায়োসিস বয়েজ হোস্টেলে থাকে। সেনাপতি বপত রোডে। প্রেমের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় সঞ্চিত আমার সঙ্গে কথা বলা কমিয়ে দিয়েছে। লাভ আগের মতনই। নিগড়ীতে

সঞ্জয়ের নিজের বাড়ি। সে বাড়িতে থাকে, খায় দায় এবং হিঞ্জেওয়াড়িতে অফিস যায়।

আমাকে চাপমুক্ত করতে অনুরাগ, লাভ এবং সঞ্জয় মাসে দু'বার করে আমার বাড়ি আসে, আমাকে নিয়ে হ্যাং-আউট করে এবং রাতে বাইরে ডিনার করিয়ে বাড়িতে ড্রপ করে।

আমি নোকরি ডট কমে বায়োডেটা আপলোড করে ইনস্টাগ্র্যামের জন্য ফটোশুট চালিয়ে যাই। মনে নোকরি ডট কমের মাধ্যমে চাকরি পাওয়ার যত না আশা তার চেয়ে বেশি আশা ইনস্টাগ্র্যামের ফটো দেখে আগের ড্যানিয়েল ওয়েলিংটন, লিনো পেরস ও ফর এভার টুয়েন্টি ওয়ান-এর মত অন্যান্য কম্পানি আমাকে ডাকবে তার। ডেকেওছিল। মিস্ত্রা। মিস্ত্রার ড্রাই স্টেট ক্লোদিং-এর অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করে আমি উপার্জন করেছি তিনটে ছড়ি ও দুটি ছড়ি ড্রেস টপ। আমার উপার্জনে খুশি না হয়ে মা-বাবা ঘুরে ফিরে সেই একই কথা বলেন—এভাবে প্রতিদিনের খরচা চলতে পারে না। ফ্যাশন চলতে পারে না। একদিন সেই ফটোগ্রাফার, সুশীল ফটো তুলতে এসে যখন কেতাদুরস্ত আমার অর্থনৈতিক দুর্গতির কথা জানতে পারে, জানতে পারে যে আমি চাকরি খুঁজছি অথচ নোকরি ডট কম ছাড়া আর কোথাও বায়োডেটা দিইনি, বলে, ''আমি 'প্যানাসিয়া ইনফোটেক'এ কাজ করি। তুমি তোমার বায়োডেটা আমাকে দাও। আমাদের কম্পানির পোর্টালে আপলোড করে দেব।''

মাত্র কয়েকদিন পরেই গুগল অ্যাকাউন্ট খুলে দেখি প্যানাসিয়া মেল পাঠিয়েছে। জানতে চেয়েছে সাপোর্টিং ইঞ্জিনীয়ার পোস্ট-এ আমি আগ্রহী কিনা। উত্তর দিয়েছি, 'হ্যাঁ'। পরদিনই কম্পানির রিক্রুইটমেন্ট সেল থেকে ফোন। আমাকে সাধারণ জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়—কোন কলেজে পড়েছ, বিষয় কি ছিল, কোন বছরে পাশ করেছ, কোথায় থাকো ইত্যাদি। সবকিছু বায়োডেটাতে দেওয়া আছে তবু। পরে জেনেছি সেটা ছিল আমার ইন্টারভিউ-এর প্রথম রাউন্ড। নিজের অজান্তেই প্রথম রাউন্ডে পাশ মার্ক উঠিয়ে ফেলেছিলাম। ডাক পেয়েছিলাম এইচ আর রাউন্ড-এর।

হিঞ্জেওয়ারিতে ইন্টারভিউ। সকাল এগারোটায়। গাড়ি নিয়ে যেতে দেড় থেকে দু'ঘণ্টা লাগবে। তার মানে আমাকে পৌনে ন'টায় গাড়িতে স্টার্ট দিতে হবে। মাকে বলব না ভেবেও সিদ্ধান্তে অটল থাকতে পারলাম না। সকাল আটটায় ফোন লাগিয়েই ফেললাম।

মা সেইসময় কলকাতায় একটা অন্ধকার ফ্ল্যাটের মধ্যে দিন-রাত্রির পার্থক্য বোঝার জন্য সংঘর্ষ করে চলেছেন। ভাড়াতে নেওয়া হয়েছে ফ্ল্যাট, বাড়িওয়ালাকে মাসে মাসে বারো হাজার টাকা দিচ্ছেন অথচ বিনিময়ে ঘরের বাইরে না বেরোলে নতুন সকালের স্বাদ পাচ্ছেন না। জানালার সমানে না দাঁড়ালে কখন সকাল গড়িয়ে দুপুর হল, দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল, বিকেল গড়িয়ে রাত এবং রাত গড়িয়ে পুনরায় সকাল বোঝাই যাচ্ছে না। পৃথিবী চলছে তার নিজের চক্রে, মা চলেছেন ফ্ল্যাটের

জানালা এবং ঘড়ির চক্রে। ঘরে থাকলে কালো কাচ বসানো জানালা খুলে দিয়ে বাইরের আলো অন্ধকার দেখেন, ঘড়ি দেখেন এবং বোঝেন সময়টা ভোর পাঁচটা নাকি বিকেল পাঁচটা। জানালা খুলে দিন-রাতের প্রহর বুঝতে গেলে বারো সেকেন্ডে বারো খানা মশা ঘরে ঢুকে পড়ে। মনুষ্যরক্ত পানের জন্য মরিয়া হয়ে চতুর্দিকে হেলিকপ্টারের মত উড়ে বেড়ায় এবং সবগুলোকে মৃত্যুদণ্ড দিতে সফল হওয়ার আগেই কয়েকটি সুযোগ খুঁজে তাঁর শরীরে অবতরণ করে রক্তপানে সফলও হয়ে যায়। ফ্ল্যাটের মেন দরজা খুলে বাইরে যাওয়ার উপায় নেই, রান্নাঘরের জানালা খুলে রান্না করার উপায় নেই। বসার ঘর অথবা শোবার ঘরের জানালা খুলে ঘনসন্নিবিষ্ট বিল্ডিং-এর দেওয়াল ঘেঁষা সংকীর্ণ গলির সঙ্গে একটা ছোট্ট শুদ্ধ-অশুদ্ধ হাওয়ার আদান-প্রদান করে নেবেন তারও উপায় নেই। মালিককে নেট বসানোর কথা বলে বলে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন।

ফোনে কথা বলে মা'র আরও অনেক সমস্যার কথা জেনেছিলাম—শোবার ঘরের একটা জানালার লক খারাপ, বিল্ডিং-এর এনট্রান্স-এর ছোট লোহার গেটের চাবি তাঁর কাছে নেই, ফ্ল্যাটের ভেতরের সব দরজাগুলো বর্ষাকালে ফুলে-ফেঁপে উঠেছে। এখন বর্ষাশেষে শরৎ এসে বিদায় নিতে চলল অথচ দরজা শুকোলো না। বন্ধ হলে খুলতে চায় না। এসব কথাও বলা হয়েছে মালিককে। তাঁর ক্যাটারিং-এর ব্যবসা। ব্যস্ত মানুষ। আমার মনে হয় অসৎ মানুষ। মা'র সঙ্গে তাঁর শুধু ভাড়ার সম্পর্ক। না চাইতেই প্রতি মাসে মা'র ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে বারো হাজার টাকা তাঁর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ঢুকে পড়ে, তাই গা করেন না। মা তাঁকে এক মাসের ভাড়া না দিয়ে তাঁর প্রতিক্রিয়া দেখতে চাইলেন। তাতেও মালিকের কোন বিকার নেই। নিশ্চয় ভেবেছেন অগ্রীম টাকা থেকে কেটে নেবেন। তারপর একদিন যা ঘটল তাতে তিনি না এসে পারলেন না।

বেডরুমে মশার প্রবেশ নিষিদ্ধ করতে রাতে মা দরজা এবং চৌকাঠের মাঝখানে কাগজ রেখে আলতোভাবে দরজা বন্ধ করেছিলেন। সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখলেন দরজা খুলছে না। জানালা খুলে চিৎকার করে ডাকতেই সিকিউরিটি গার্ড ধনঞ্জয়দা এলেন। বললেন, "ইন্টারলকের চাবিটা দাও। আমি ভেতরে ঢুকে ড্রয়িংরুম থেকে বেডরুমের দরজায় ধাক্কা দেব।"

"ইন্টারলকের চাবি ড্রয়িংরুমে। তাছাড়া, ড্রয়িংরুমের দরজায় ছিটকিনি লাগানো আছে।"

"বড় সমস্যা হয়ে গেল।" ধনঞ্জয়দা মালিককে ফোন করে। বেহালা থেকে বাইকে করে অবশেষে মালিক এলেন। মা'র কাছে মৃদু অভিযোগ রাখলেন, "আপনার জন্য প্রাতঃক্রিয়া করারও সময় পাইনি।"

"আমার জন্য নয়। আপনার দরজার জন্য বলুন। কতদিন ধরে বলছি, কানে নিলেন না। ভাঙুন এখন ড্রয়িংরুমের দরজা।"

"কেন? কি প্রয়োজন?"

"আরে, সেখানে ঢুকলে তবেই না বেডরুমের দরজায় ধাক্কা দিতে পারবেন!"

"দাঁড়ান, দেখছি অন্যভাবে করা যায় কিনা।" মালিক ধনঞ্জয়দাকে একটা লম্বা মোটা নারকেলের দড়ি আনতে বললেন। ধনঞ্জয়দা দড়ি নিয়ে আসে। মালিক তাকে দড়িতে একটা ফাঁস তৈরি করতে বলেন। ধনঞ্জয়দা ফাঁস তৈরি করে। মালিক মাকে ফাঁসটি 'রাউন্ড বল ডোর নব'টির সঙ্গে লাগাতে বলেন। মা লাগিয়ে দেন। মালিক ধনঞ্জয়দাকে দড়ির অন্য প্রান্ত ধরে জোরে টান দিতে বলেন। ধনঞ্জয়দা টান দেয়। খুলে যায় দরজা। এসব করতে দশ মিনিট সময় লাগে। দশ মিনিটে একশোটা মশা ঘরে ঢুকে মাকে ছেঁকে ধরে। মালিক তার দুর্দশা স্বচক্ষে দেখে দয়াপরবেশ হন, কয়েকদিনের মধ্যেই জানালায় নেট লাগিয়ে দেন, নেট লাগাতে এসে নিজেও মশাকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ রক্তদান করেন।

যেদিন মা'র মশার উপকথা শেষ হল তার পরদিনই আমার ইন্টারভিউ। ফ্ল্যাটে এখন মশার উৎপাত নেই। দিনের আলোও নেই। তাই সকালের অন্ধকারে তিনি নিদ্রাচ্ছন্ন। আমার ফোন পেয়ে ধড়ফড় করে জেগে ওঠেন।

বলি, "আমাকে এখন ইন্টারভিউ দিতে যেতে হবে।"

"এত রাতে কীসের ইন্টারভিউ?"

"রাত নয়, এখন সকাল। আটটা বাজে।"

"ওহ্, সুখবর। কিন্তু কোথায়?"

"হিঞ্জেওয়ারির একটা কম্পানিতে।"

"বেস্ট অফ লাক।"

"আমি জানি আমার হবে না।"

আমার আত্মবিশ্বাসের অভাব মাকে ঘা দেয়। "কতবার বলেছি আগে থেকেই এমন না ভাবতে!" তাঁর গলা থেকে নিদ্রার আবেশ অন্তর্হিত।

"যদি জিজ্ঞেস করে পাশ করার পর একবছর আমি কেন চাকরিতে জয়েন করিনি, তাহলে কি বলব?"

"বলবে মডেলিং করেছি।"

"তুমি বুঝতে পারছ না। তাহলে আমার পয়েন্ট কমে যাবে।"

"যা খুশি বলো।"

"সিলেবাস থেকে শুধু কয়েকটি বেসিক জিনিস দেখেছি। ভয় করছে। আমার চেয়ে অনেক বেশি যোগ্য ছেলেমেয়ে আছে।"

আমার ভয়কে মা'র অমূলক মনে হয়। তিনি তাঁর রেকর্ডপ্লেয়ার চালিয়ে দেন। "আমি জানি ইঞ্জিনিয়ারিং-এ তুমি ব্যাকলক টেনে সেকেন্ড ক্লাস পেয়ে কোনওরকমে পাশ করেছ। কারণ, একদমই পড়াশোনা করনি। মন দিয়ে পড়াশোনা করলে ফার্স্ট

ক্লাস ফার্স্ট হতে পারতে। আমি শুনেছি টেকনিক্যাল লাইনে কলেজে বা ইউনিভার্সিটিতে ছেলেমেয়েরা যা শেখে চাকরিক্ষেত্রে তার খুব অল্পই কাজে লাগে। আমি এটাও শুনেছি কেমিক্যাল লাইন নিয়ে পড়াশোনা করে কেউ প্রোগ্রামিং-এ চাকরি পেয়েছে, মেকানিক্যাল নিয়ে পড়াশোনা করে কেউ আই টি সেক্টরে চাকরি পেয়েছে, আবার ইলেকট্রিক্যাল নিয়ে পড়াশোনা করে কেউ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিতে চাকরি পেয়েছে। যদি তাই-ই হয় আমার বিশ্বাস এক্ষেত্রে ইন্টারভিউ ছেলেমেয়েদের উপস্থিত বুদ্ধি পর্যালোচনা করা ছাড়া আর কিছুই নয়। উপস্থিত বুদ্ধি বোঝানোর জন্য ভাষার দরকার। তোমার ভাষার কোন সমস্যা নেই। চাইলে কোন জিনিস বোঝা এবং বোঝানোর প্রতিযোগিতায় তুমি বাকি সবাইকে পেছনে ফেলে দিতে পারো। ফ্যাশন এবং সাহিত্য জগৎকে গুলে খেয়ে বসে আছ। এই দুটো বিষয় নিয়ে অবিরত পাঁচদিন বক্তৃতা দেওয়ার ক্ষমতা রাখো...।"

"তুমি যে বলো রাজনীতি নিয়ে আমি মোটেও ওয়াকিবহাল নই!"

"হ্যাঁ, শুধু ওটা নিয়েই আমার চিন্তা।" মা আমায় জিজ্ঞেস করেন, "আমাদের দেশের বর্তমান রুলিং পার্টির নাম কি?"

"জানি না।"

"প্রেসিডেন্টের নাম?"

"জানি না।"

"আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রি কে?"

"কঠিন কঠিন প্রশ্ন করে তুমি আমাকে কেন নার্ভাস করে দিচ্ছ?"

"এই কয়েকটি নাম জেনে নিও। পাশ হয়ে যাবে।"

"ঠিক আছে। বাই বাই..."

"দাঁড়াও। আর একটা কথা।"

"কি? তাড়াতাড়ি বলো।"

"ভাল ড্রেস পরে যেও।"

"ওহো মাম্মা! আমি র‍্যাম্পে হাঁটতে যাচ্ছি না। সেজে গিয়ে কোন প্রশ্নের উত্তর না দিতে পারলে লজ্জার ব্যাপার হবে।"

"নিশ্চয় শর্ট-স্কার্ট, ক্রপ-টপ এবং ছয় ইঞ্চির হিল নয়। তবে কাজের মেয়ের মত একেবারে পোশাক-উদাসীন হয়ে বেরিয়ে পড়ো না।"

ইন্টারভিউ-এ একশোর বেশি ছেলেমেয়ে। 'এস এ পি প্রোজেক্ট'এর জন্য কম্পানি মোট আট জনকে বাছাই করবে। প্রার্থী বেশি থাকায় এইচ আর রাউন্ড বাতিল করা হয়েছে। গ্রুপ ডিসকাশন হবে। পাঁচ জনকে নিয়ে এক একটি গ্রুপ। এক একটি করে গ্রুপ ভেতরের রুমে যাবে। আমার গ্রুপে আমি ছাড়া আরও দুটো মেয়ে এবং দুটো ছেলে। কথাবার্তা শুনে বুঝলাম একটি মেয়ে ছাড়া অন্য কেউই ইংরেজিতে স্বচ্ছন্দ

নয়। রাজনীতি নিয়ে অনেক কিছু জানলেও বিশ্লেষণমূলক আলোচনায় তারা ভাষার অভাবে জড়তা নিয়ে বসে থাকবে অথবা বলতে গিয়ে আটকে যাবে। সুতরাং এই মুহূর্তে শুধুমাত্র গ্রুপের সেই ইংরেজি জানা মেয়েটিকে হারানো আমার লক্ষ্য হওয়া উচিত।

প্রথম গ্রুপকে ভেতরে ডাকা হল। বাকি চারটে বাইরের ঘরে বসে। প্রথম গ্রুপ কুড়ি মিনিট বাদে ছাড়া পেল। ছাড়া পেয়ে ডান দিকে বাঁ দিকে না তাকিয়ে অফিস থেকে বেরিয়ে গেল। ভেতরের ঘরে ডাক পড়ল দ্বিতীয় গ্রুপের। তারপরে তৃতীয় গ্রুপ। তারপরে আমরা। প্রশ্নকর্তা দু'জন—একজন স্যার এবং একজন ম্যাডাম। ম্যাডাম গ্রুপের পাঁচজনকেই নিজেদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে বললেন। প্রথমে একটি ছেলে উঠে দাঁড়ালো। সে তার নাম, কোন স্কুল থেকে স্কুল ফাইনাল করেছে, কোন কলেজ থেকে হায়ার সেকেন্ডারি করেছে এবং কোন কলেজ থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং করেছে, ইঞ্জিনিয়ারিং-এ কত পার্সেন্ট পেয়েছে ইত্যাদি বলল।

ম্যাডাম জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি আমাজনে কাজ করো?"

"ইয়েস।"

"কেন ছাড়তে চাইছ?"

ছেলেটি ভুলভাল ইংরেজিতে বোঝালো সে আমাজনে মার্কেটিং-এ আছে। নন-টেকনিক্যাল জব তার ভাল লাগছে না।

"ওকে। নেক্সট..."

অন্য ছেলেটি দাঁড়ালো। সে আগের ছেলেটিকে অনুসরণ করে কোনরকমে ইংরেজিতে নিজের স্কুল এবং কলেজের নাম বলল।

তারপর একটি মেয়ে দাঁড়ালো। সেও তোতাপাখির মত ওই কয়েকটি জিনিস বলেই থেমে গেল। ম্যাডামের প্রশ্ন, "তোমার হবি কি?"

"হবি?" থতমত খেয়ে গেল মেয়েটি। "উঁ উঁ উঁ, গার্ডেনিং।"

"তোমরা কি বাংলোতে থাকো?"

"হ্যাঁ।"

"বাংলোর সামনে ফুলের বাগান আছে?"

"হ্যাঁ।"

"আর কিছু বলবে?"

"না।"

আমার মনে হল ওরা বিষয় নিয়েই তৈরি হয়ে এসেছিল। সিলেবাস থেকে জিজ্ঞেস করা হলে বরং কিছু বলতে পারত।

আমি শেষের স্লট নেব বলে বসে আছি। ইংরেজি জানা মেয়েটি আমার দিকে দু'চারবার তাকিয়ে যখন বুঝল আমি নড়ব না, দ্বিধা নিয়ে দাঁড়ালো। সে কিছু না বলে ম্যাডামের দিকে তাকিয়ে রইল। ম্যাডাম ওরও বায়োডেটা ঘেঁটে দেখছিলেন।

"কেপজেমিনি নামকরা কম্পানি!"

ভয় পেলাম। তাহলে আমার কোন সম্ভাবনা নেই।

"কিন্তু ম্যাম, নাইট শিফট করে আমি অসুস্থ হয়ে পড়ছি।"

স্যার বললেন, "আমাদের এখানে জেনারেল শিফট নেই।"

আবার মনে সাহস।

মেয়েটি বলল, "ওহ্।"

এবার আমার পালা। নিজের নাম, স্কুল-কলেজের নাম, ডিগ্রির রেজাল্ট বলে, চাকরিতে অভিজ্ঞতা শূণ্য জানিয়ে আমি আমার বই পড়ার নেশার উল্লেখ করি। ম্যাডাম জিজ্ঞেস করলেন, "সম্প্রতি কোন বই পড়েছ?"

"রিশেল মিড-এর একটা সিরিজ।"

"তার আগে?"

"লোইস লোরির দ্য গিভার সিরিজ।"

"তার আগে।"

"ফিলিপ পুলম্যান-এর হিজ ডার্ক মেটেরিয়াল সিরিজ।"

"তার আগে।"

"সুজান কোলিন্স-এর দ্য হাঙ্গার গেমস সিরিজ।"

"তার আগে।"

"দ্য ডাইভার্জেন্ট সিরিজ, তার আগে টোয়ালাইট সিরিজ, তার আগে ভ্যাম্পায়ার অ্যাকাডেমি সিরিজ, তার আগে হ্যারি পটার সিরিজ..."

"মনে হচ্ছে তুমি সিরিজ পড়তে ভালবাস।"

স্যার জিজ্ঞেস করলেন, "অন্য কিছু?"

"এস ই হিন্টন-এর দ্য আউটসাইডারস, উইলিয়াম গোল্ডিং-এর লর্ড অব দ্য ফ্লাইজ এবং দ্য প্রিন্সেস ব্রাইড..."

"শুধু বইয়ের নাম বললেই হবে।"

"টু কিল আ মকিং বার্ড, দ্য ফল্ট ইন আওয়ার স্টারস, লুকিং ফর আলাস্কা, পেপার টাউনস..."

"ব্যস। আর প্রয়োজন নেই। বুঝতে পেরেছি সাহিত্য নিয়ে তুমি ননস্টপ পাঁচদিন লেকচার দিতে পারবে।"

ঠিক এই কথাটিই মা আমায় বলেছিলেন। সাহিত্য নিয়ে আলোচনায় আমি খুব সাবলীল। এখানে আমাকে হারায় কার সাধ্য!

ম্যাডাম জিজ্ঞেস করলেন, "আমাদের দেশের বর্তমান রুলিং পার্টির নাম কি?"

বললাম নাম। মাকে বলেছিলাম, 'জানি না'।

"প্রেসিডেন্টের নাম?"

বললাম নাম। মাকে বলেছিলাম, 'জানি না'।

''আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রি কে?''

তাঁর নামও বললাম। মাকে বলেছিলাম, 'কঠিন কঠিন প্রশ্ন করে তুমি আমাকে নার্ভাস করে দিচ্ছ'।

স্যার এবং ম্যাডামের সঙ্গে আমার কথাবার্তা এগিয়ে গেল অনেকদূর। অনেক সময় নিল সেই অদৃশ্য যাত্রা। তারপর আবার আমরা ইন্টারভিউ রুমে ফিরে এলাম।

স্যার ম্যাডামকে বললেন, ''এবার বাকিদেরকেও কিছু বলার সুযোগ দেওয়া হোক।''

''নিশ্চয়।'' ম্যাডাম আমাদের জিজ্ঞেস করলেন, ''জি এস টি-এর পক্ষে কে বলবে এবং বিপক্ষে কে বলবে?''

যা ভেবেছিলাম তাই হল—ভাষাতে দক্ষতার অভাবহেতু সুযোগ পেয়েও বাকি তিনজন চুপ রইল। ইংরেজি জানা মেয়েটি বলল সে বিপক্ষে বলবে। বিপক্ষে সে তিনটি পয়েন্ট রাখল।

—জি এস টি দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করেছে।

—জি এস টি ইনসিয়োরেন্স-এর প্রিমিয়াম-এর মূল্য বৃদ্ধি করেছে।

—জি এস টি ব্যবসায়ীদের মধ্যে জটিলতা সৃষ্টি করেছে।

কোন ব্যাখ্যা নেই।

আমি বললাম, ''আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এক্সসাইজ ডিউটি, সার্ভিস ট্যাক্স, সি এস টি, কাস্টম ডিউটি, ভ্যাট, এন্ট্রি ট্যাক্স, এন্টারটেনমেন্ট ট্যাক্স, লাক্সারি ট্যাক্স দিয়ে থাকি। সব ট্যাক্সগুলোকে একত্রিত করে জি এস টি চালু করা হয়েছে। খারাপ কি! জি এস টি হিসেবে আমাদের ক্ষেত্র বিশেষে পাঁচ, বারো, আঠারো এবং আটাশ শতাংশ ভরতে হলেও তাদের গড় পরিমাণ আলাদা আলাদা করে যত দিতে হয় তার গড় পরিমাণের চেয়ে কম হবে। 'গুডস অ্যান্ড সার্ভিস ট্যাক্স' নামক এই সিনগল ট্যাক্সেশন সিস্টেমটি অন্যান্য অনেক দেশেও আছে এবং আমার কাছে আসা খবর বলে নিউজিল্যান্ড-এর নাগরিককে পনেরো শতাংশ, অস্ট্রেলিয়ার নাগরিককে দশ শতাংশ, ফ্রান্সের নাগরিককে উনিশ দশমিক ছয় শতাংশ, সুইডেনের নাগরিককে পঁচিশ শতাংশ এবং জার্মানির নাগরিককে উনিশ শতাংশ জি এস টি ভরতে হয়।''

ম্যাডাম এবং স্যারের মুখ দেখে মনে হল আমার বিশ্লেষণে তাঁরা খুশি হয়েছেন।

বললাম, ''কিন্তু জি এস টি আমার জিনিসের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে।''

''যেমন?'' ম্যাডামের প্রশ্ন।

''অনলাইন জামা, জুতো, ব্যাগ, নেকলেস, ইয়ার রিং, কসমেটিক্স।''

ম্যাডাম এবং স্যার চোখ বড় বড় করে একে অন্যের দিকে চাওয়া-চাওয়ি করলেন। খুব অপেশাদারি কথা বলে ফেলেছি। ইন্টারভিউ শেষ হল। আমাদের বলা হল পরে ফোন করে জানানো হবে।

এক সপ্তাহের মধ্যেই অফার লেটার পেলাম। অফার লেটারটা আমি পড়ে দেখার চেষ্টা করেছি। টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনস্-এর অনেক কিছুই মাথার উপর দিয়ে গেছে। যে কটিকে ধরতে পেরেছিলাম সেকটিই আমার মাথাকে বনবন ঘুরিয়ে দিয়েছে। তাই বাবার মেল-এ অফার লেটার ফরওয়ার্ড করে দিয়েছি। তাঁর চাকরির অভিজ্ঞতা অনেক। তিনি বোঝেন কিন্তু স্বভাবদোষে আমাকে সাহস দিতে পারেন না। নড়বড়ে তিনি। বাড়ি এবং আমি সংক্রান্ত কোন ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে আগেও শূণ্য অবদান রেখেছেন, এবারও রাখলেন। ব্যবহারে কোন পরিবর্তন নেই। বাবা আমার অফার লেটার মাকে পাঠিয়ে দিলেন। পরিবর্তন নেই মায়েরও। যে কোন কঠিনতাকে ভেঙ্গেচুরে সহজ-সরল রূপ দিতে তিনি সিদ্ধহস্ত। মা আমাকে ফোন করলেন, "এত ভয় পাওয়ার কি আছে?"

"দেখোনি? নম্বর ১.১.১, ১.১.২-এই তো লেখা আছে প্রোবেশন ছ'মাস থেকে বেড়ে আট মাসও হতে পারে।"

"ক্ষতি কি? জব চলে যাচ্ছে না!"

"যেতেই পারে। নম্বর ১.১.৩-এ লেখা আছে কম্পানি কোন কারণ উল্লেখ না করেই একমাসের নোটিস দিয়ে আমাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করতে পারে।"

"যে কোন জবের ক্ষেত্রেই এমন শর্ত থাকে। তুমিও একমাসের নোটিসে চাকরি থেকে ইস্তফা দিতে পারো।"

"তা পারি, কিন্তু আমাকে তার জন্য কারণ বলতে হবে। কম্পানি নিজের এবং এমপ্লয়ীদের মধ্যে পার্শিয়ালটি করছে।"

"সব কম্পানিতেই এমন হয়। এমনকি গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশনেও।"

"নম্বর ৪.৪.৩-এ লেখা আছে ন'ঘণ্টার ডিউটি। কিন্তু কম্পানি চাইলে আমাকে দিয়ে বেশি সময় ধরে কাজ করাতে পারে। এমনকি পুরোদিনও। সপ্তাহে একদিনও ছুটি না দিতে পারে। বছরের তিনশো পঁয়ষট্টি দিনই আমাকে অফিসে যেতে হতে পারে।"

"আমাকে বলো না, বলো আমাদের।"

"কেন? অফার লেটার তো আমাকেই দিয়েছে!"

"তোমাকে দিয়েছে, কিন্তু শুধু তোমাকেই দেয়নি। আরও অনেককে দিয়েছে। অফার লেটারে এসব লেখা থাকে যাতে কখনো কোন প্রয়োজন এসে গেলে তোমরা না করতে না পারো। আমার বিশ্বাস এটা বেশিরভাগ কম্পানিরই সাধারণ ফর্মাট। তুমি বন্ধুদের জিজ্ঞেস করে দেখতে পারো।"

"লাভ এবং অনুরাগকে জিজ্ঞেস করেছিলাম।"

"কি বলেছে তারা?"

"একই কথা।"

"সঞ্জয় নাকি হিঞ্জেওয়ারি ফেজ থ্রীতে চাকরি করছে! ওর সঙ্গেও আলোচনা করো।"

"আরও সমস্যা আছে।"

"কি?"

"আমাদের শিফট ডিউটি। শিফট ডিউটিতে রোটেশন করে নাইট ডিউটিও আসবে।"

"এটা নিয়ে একটু ভাবতে হবে।"

"তাহলে কি করি? কনফার্মেশন দেব কি দেব না?"

"কনফার্মেশন না পেলে কম্পানি তোমাকে রিজেক্ট করে দেবে। এখন হ্যাঁ বলে দাও। ভাবার সময় আছে।"

সাইন করে অফার লেটার পাঠিয়ে দেওয়ার পরে মা আরও পনেরো দিন সময় পেলেন। কিন্তু আমার সুবিধার্থে কিছুই করলেন না। বললেন, "জয়েন করেই ফেলো। বেটার অফার পেলে ছেড়ে দেবে। বাবা মা'র মতামত জেনে আবার আমার উদ্দেশ্যে একই কথা রিপিট করলেন, "অভিজ্ঞতা হবে। অভিজ্ঞতার দাম অনেক।"

জয়েনিং-এর জন্য আমাকে মগরপাট্টাতে ডাকা হল। কম্পানির নির্দেশমত আমি আগেই আমার সব মার্কশীট এবং সার্টিফিকেটের অরিজিনাল কপি স্ক্যান করে মেল-এ পাঠিয়ে দিয়েছি। ওরা স্ক্যান কপি খুঁজে পাচ্ছে না। সুতরাং অরিজিনালের হার্ড কপি চাইছে। আমি হার্ড কপি নিয়ে যাইনি। আমার মোবাইলে ইন্টারনেটও চলছে না।

কেনিয়া থেকে বাবা এবং কলকাতা থেকে মা ক্রমাগত কি হল কি হল করে ফোন করছেন। দু'জনেই খুব উদবিগ্ন। দু'জনেই অসহায়। মা-বাবা একে অন্যকেও ফোন করে চলেছেন। ঘেঁটে দেখছেন নিজেদের মোবাইল, ল্যাপটপ। যদি ভুল করেও আমার মার্কশীট, সার্টিফিকেটের স্ক্যান কপি সেখানে পৌঁছে গিয়ে থাকে তাহলে কম্পানির মেল-এ পাঠিয়ে দেবেন। তাঁরা অস্থির, আমি বিরক্ত। মনে হচ্ছিল বেরিয়ে যাই। এই চাকরি তো করবই না, ভবিষ্যতে কদাপি অন্য চাকরির চেষ্টাও করব না।

মা আমাকে শান্ত করতে মরিয়া, "এমন করে না রিলি। ওরা মেল হারিয়ে ফেলেছে, এটা ওদের মিসটেক। তার জন্য ওদের তোমাকে আর একটা ডেট দেওয়া প্রয়োজন। না রাজি হলে আমাকে এইচ আর-এর নম্বর দাও। আমি তোমার ফেভারে কথা বলব।"

অবশেষে আমার মোবাইলেই সবকিছু পেয়ে গেলাম। কম্পানির মেল 'আইডি'তে আবার মেল করলাম। ফর্মালিটিজ কমপ্লিট করতে এগারো ঘণ্টা লেগে গেল—একটা

পুরো শিফটের চাইতেও বেশি সময়।

মা'র স্বস্তির নিঃশ্বাস। ''তাহলে রিলি, কাল থেকে তুমি মগরপাট্টাতে যাচ্ছ।''

''মগরপাট্টা নয়। আমাকে হিঞ্জেওয়ারিতে যেতে বলা হয়েছে।''

''কখন?''

''সকাল ন'টায়।''

পরদিন, মঙ্গলবারে সকাল সাড়ে ছ'টায় ঘুম থেকে উঠে স্নান-ব্রেকফার্স্ট সেরে জামাকাপড় পরে উবারে উঠে পড়লাম। আমাকে যেতে হবে হিঞ্জেওয়ারি ফেজ ওয়ানে, কিউবিকল আইটি পার্কে।

জীবনে প্রথমবার কোন কম্পানির এমপ্লয়ী হয়ে কাজ করতে যাচ্ছি। ভাবছি এবার হাতে টাকা আসবে, কিন্তু ইনস্টাগ্র্যামে ফটোশুটগুলো নিয়মিত করতে পারব না, বিজ্ঞাপনের অফার আরও কমে যাবে। ভাবছি আমি দাঁড়িয়ে গেলে মা আমাকে নিয়ে অনেকটা নিশ্চিন্ত হবেন। মা'কে নিশ্চিন্ত দেখে আমি জ্বলব। মনে খুশি, দুঃখ এবং যন্ত্রণার মিশ্রণ। মায়ের সঙ্গে আমার সম্পর্ক বড় জটিল—মাকড়সার জালের মত। জটিলতার কারণ অবশ্য মা জানেন না। তাঁকে নিয়ে আমার বিভিন্ন রকমের অনুভব। অনুভবগুলো মাকড়সার জালে চক্রাকারে ঘুরে বেড়ায়, তাঁকেও ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ায়। আমার আচার ব্যবহারে তিনি কখনো কখনো অনেক অসহায়বোধ করেন।

মাকড়সার জালে ঘুরে বেড়ানো কয়েকটি অনুভবের একটি হল তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা। চাকরিসূত্রে আমার অনেক ছোটবেলা থেকেই বাবা বাড়ির বাইরে। সুতরাং আমাকে বড় করার দায়িত্ব মোটামুটিভাবে মায়ের হাতে পড়েছিল। ভালবেসে বিয়ে করে সব আত্মীয়স্বজন থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন। আমাদের বাড়িতে কোন অতিথি আসে না—না মামা, না মাসি, না কাকু, না পিসি। আমি তাদের প্রায় চিনি না। মায়ের বান্ধবীর সংখ্যাও অতি সীমিত। দু'মাস, তিনমাসে একবার দেখা-সাক্ষাৎ। বাবার মাইনে স্বল্প হওয়ার কারণে বাড়ির অর্থনৈতিক অবস্থাও সচ্ছল নয়। আমার দায়িত্ব সামলে সম্ভব হবে মনে করলে মা কখনও সামান্য মাইনের চাকরি ধরেন, সম্ভব হচ্ছে না মনে করলে চাকরি ছাড়েন। চাকরি থাকুক বা না থাকুক তিনি আমাকে বুঝতে দেন না আমাদের টাকা পয়সার এত টানাটানি। আমার কোন প্রয়োজন অর্থাভাবে অপূর্ণ থাকে না। অধিকন্তু অধিক পাই— আধুনিকতম খেলনা, পোশাক—সব ভূরি ভূরি। তাঁর অন্য কোন সন্তান নেই। তিনি আমার প্রতি নিবেদিতপ্রাণ। বাড়ির এবং বাইরের সব কাজ একা করেন। বেশিরভাগ কাজই আমাকে কেন্দ্র করে। আমার টিফিন, লাঞ্চ, ডিনার তৈরি; আমার জামাকাপড় কাচা, ইস্ত্রি করা; হোমওয়ার্ক দেখা; পরীক্ষার প্রস্তুতি করানো; নাচের ক্লাসে নিয়ে যাওয়া; নাচের প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করানো; তার প্রস্তুতি... ক্যাসেট অথবা সিডি তৈরি; গান রেকর্ডিং...বলে শেষ করা যাবে না। আমার স্কার্টের হারিয়ে যাওয়া বোতামের ম্যাচিং বোতাম কিনতে উনি স্কুটার নিয়ে

একা একা সারা শহর ঘুরে বেড়ান, না খেয়ে সারাদিন কাটিয়ে দেন। আমার অসুস্থতার রাতগুলোতে দু'চোখের পাতা এক না করে থার্মোমিটার নিয়ে আমার পাশে বসে থাকেন, কপালে জলপট্টি দেন। মহাবিশ্বের গ্রহ-নক্ষত্রের মত তাঁর কর্মে কোন ক্ষান্তি নেই, কোন বিচ্যুতি নেই। কোন বিরাম নেই তাঁর, কোন ক্লান্তি নেই—না মানসিক, না শারীরিক। আমার লেখাপড়ার ক্ষতি হবে ভেবে ঘরের টিভিটা পর্যন্ত অন করেন না।

মাকড়সার জালে ঘুরে বেড়ানো আমার কয়েকটা অনুভবের আরেকটি হল তাঁর প্রতি অসহিষ্ণুতা। তাঁর কাছে পড়া জমা দিয়ে দিয়ে আমি অবসাদগ্রস্ত। বাড়িতে একটিমাত্র মুখ দেখে দেখে এবং সেই মুখ থেকে এটা কোরো না সেটা কোরো না, এটা করো সেটা করো শুনে শুনে তিতিবিরক্ত।

স্কুল শুরু হত সকাল আটটা পঁয়ত্রিশে। চলত বিকেল তিনটে বেজে পঁচিশ মিনিট পর্যন্ত। সপ্তাহে পাঁচদিন। শনি রবি ছুটি। সোম থেকে শুক্রবার প্রাত্যহিক 'টাইম-টেবিল'এ এতটুকু পরিবর্তন নেই। ক্লাসে কোন টিচার অনুপস্থিত থাকেন না বললেই চলে। থাকলেও তাঁর জায়গায় অন্য টিচার আসেন। কোন পিরিয়ড ফাঁকা যায় না। মেয়েদের চিৎকার চেঁচামেচি করা, ক্লাসরুমের বাইরে ঘুরে বেড়ানোর স্বাধীনতা একদমই থাকে না। ছুটির আগে স্কুল কম্পাউন্ডের বাইরে যাওয়ার অধিকার থাকে না। সেখানে ছাত্রছাত্রীরা কড়া নিয়মশৃঙ্খলাতে বাঁধা। তাদের অবস্থা খাঁচার পাখির মত। স্কুলে না গেলে না যাওয়ার কারণ বিশ্লেষণ করে প্রিন্সিপ্যালকে চিঠি দিতে হবে। গেলে সাত ঘণ্টা প্রিন্সিপ্যালের নির্দেশ মেনেই চলতে হবে। সেই নির্দেশে ছাত্রছাত্রীদের নিজেদের ইচ্ছের মালিক হওয়ার কোন স্বাধীনতা স্বীকার করা হয় না। কেউ 'ধুর ইতিহাস ক্লাস করব না' বা 'ইংরেজি ক্লাস করব না' বলে ক্লাসরুম থেকে বেরিয়ে যেতে পারে না। টয়লেটে গিয়ে দশ মিনিট কাটিয়ে আসতে পারে না। একটু দেরি হলেই টিচারকে কেন দেরি হল তার কৈফিয়ত দিতে হয়—আমাশয় হয়েছে নাকি পাতলা পায়খানা, নাকি বমি—বিস্তৃত বিবরণ চান টিচার। শুনে বিশ্বাসযোগ্য মনে হলে প্রিন্সিপ্যালের কাছে খবর যাবে, তাকে ওষুধ দেওয়া হবে এবং গুরুতর মনে হলে অভিভাবককে ডেকে বাড়ি পাঠানো হবে। যদি বিশ্বাসযোগ্য না মনে হয় তাহলেও খবর যাবে প্রিন্সিপ্যালের কাছে। তাহলেও তাকে ওষুধ দেওয়া হবে। তবে সেক্ষেত্রে ওষুধ আলাদা—শাস্তি। ক্লাসরুমের বাইরে কান ধরে দাঁড়িয়ে থাকো, নইলে ক্লাসে সবার সামনে দশবার কান ধরে ওঠবস করো, নইলে দশবার বলো 'আর কোনদিন করব না'। এমন কড়া নিয়মশৃঙ্খলার মাঝখানেও ক্লাস নাইনে উঠে আমরা নিজেদের বেশ বড় বলে ভাবতে শুরু করলাম। টিচারদেরকে একটু একটু অবজ্ঞা করতে সাহস পেলাম। ক্লাস টেন-এ গিয়ে প্রায় লাগামছাড়া। হোমওয়ার্ক করি না, প্রোজেক্ট জমা দিই না, ক্লাস টেস্ট-এ কম নম্বর পেয়েও ফাইনাল পরীক্ষার রেজাল্ট নিয়ে চিন্তিত হই না। গার্জেন কল করে করে ক্লাস টিচার ক্লান্ত। গার্জেন

কল-এ আমার কোন ভয় নেই। আমার একমাত্র গার্জেনকে আমি নিজেই মানি না। বাড়িতে আর কেউ নেই, বাড়ি থেকে দূরে অন্য কোন গুরুজন নেই যিনি আমাকে টেলিফোনে বলবেন আমার কি করা উচিত অথবা কি করা উচিত নয়।

মাকড়সার জালে ঘুরে বেড়ানো কয়েকটি অনুভবের আরেকটি হল তাঁর প্রতি ঘৃণা। বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার প্রবল স্মৃতিশক্তি তাঁর প্রতি আমার এমন অনুভবের জন্ম দিয়েছে। মনে পড়ে আমার যখন চার বছর বয়স তখন একটা জলভর্তি গ্লাস মেঝেতে ফেলে দেওয়ায় উনি আমার পেটে ঘুষি মেরেছেন। যখন আট বছর বয়স, ক্লাস থ্রীতে, পড়া মুখস্থ না করতে পারায় বিজ্ঞান বই ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন। তারপর থেকে তাঁকে ধোঁকা দিয়ে আমি চুপি চুপি তাই-ই করেছি যা আমার মন চেয়েছে। তা থেকে আমার কিছু ভাল হওয়ার নেই জেনেও। যখন বয়স চৌদ্দ বছর, ক্লাস নাইনে, তখন মা আরেকবার আমাকে শাস্তি দিলেন—আমার পড়ার বইয়ের নিচে লুকিয়ে রাখা 'টোইয়ালাইট' বইটি আবিষ্কার করে তার কয়েকটি পাতা ছিঁড়ে ফেললেন।

ঘৃণার কারণেই কখনো কখনো মাকে আমার থেকে বেশি অসুবিধের মধ্যে দেখলে, কষ্টে দেখলে আমার চোখে মুখে খুশির ঝলক ভেসে ওঠে। উল্টোটা হলে ব্যথা। স্কুল ফাইনালে আমার রেজাল্ট মায়ের আশানুরূপ হল না। একানব্বই শতাংশ। তবু তিনি হাল ছাড়লেন না। বড় ইচ্ছে আমি 'আই আই টি' থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং করি। আমাকে প্রাইম নামে পুনের একটা নামকরা 'আই আই টি কোচিং ক্লাস'-এ পঁয়ষট্টি হাজার টাকা ফি ভরে ভর্তি করে দিলেন। স্কুলের কাছেই। এদিকে প্রাইম থেকে পায়ে হাঁটা দূরত্ব নওরসজি ওয়াদিয়াজ কলেজেরও। বলা বাহুল্য, একাদশ শ্রেণিতে আমি ওয়াদিয়াজ কলেজে সায়েন্স-এর ছাত্রী হলাম। মা বললেন, কলেজ থেকে পায়ে হেঁটেই ক্লাসে চলে যেতে পারবে। বাইক চালাতে দেন না। ভয় পান। আমাকে সকালে কলেজে ছাড়া এবং সন্ধ্যেয় ক্লাস থেকে নিয়ে আসার কাজটি নিজেই নিজের কাঁধে নেন।

কলেজের ছাত্রছাত্রীরা স্বাধীন। তারা হঠাৎ করে কোনদিন কলেজে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারে। কোন কৈফিয়ত দেওয়ার প্রয়োজন নেই। একদিন শুনেছিলাম নিলেশ নামে একটি ছেলে গুঞ্জনকে ডাকছে, "এই গঞ্জা শিবরামের মোশন-এর ক্লাস করব না রে। চল, বাইরে থেকে একটা সিগারেট ফুঁকে আসি।" গুঞ্জন হে হে করে দু'গাল হেসে নেচে ওঠেছিল, "নিলা, আজ সব পিরিয়ডেই শালা ডান্ডি মারব।"

আমার ডিভিশনে আস্মিতা নামে একটি মেয়ে ছিল। খুব নেকা। আস্মিতা প্রাঞ্জল-এর সঙ্গে প্রেম করত। সে প্রাঞ্জলকে বলেছিল, "শিবরামের মোশনের ক্লাসে আমার শরীরের সব মোশন বন্ধ হয়ে যায়, বড্ড ঘুম পায়।"

"কে বলেছে তোকে ক্লাস করতে? চল, মৌচাক-এ গিয়ে কচুরি সাঁটিয়ে আসি।"

দীর্ঘ বারো বছর স্কুলে শিক্ষক-শিক্ষিকার অত্যাচার সহ্য করে এখন তারা মরিয়া,

কলেজের অধ্যাপকদের ওপর অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এমন ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আমিও পড়ি। আমি সিগারেট ফুঁকি না, তাই নিলা-গঞ্জার সঙ্গে যাওয়ার প্রশ্ন নেই। আমি প্রেমও করি না, সুতরাং মৌচাকের কচুরিও আমাকে টানে না। বাড়ি চলে আসি। আমার মনে হয় ছাত্রছাত্রীদের অতিরিক্ত বেয়াদব আচরণের জন্য কলেজের অত্যধিক ঢিলে অনুশাসনও কম দায়ী নয়। প্রায়ই অধ্যাপকরা অনুপস্থিত থাকেন। প্রায়ই একটা ক্লাসের পরে দু'টো বা তিনটে ক্লাস অফ থাকে, সেই অফের পরে আবার একটা ক্লাস থাকে। সেই একটা ক্লাসের জন্য আগ্রহও কম হতে থাকে। একাদশ শ্রেণির মাঝের দিকে স্কুল ফাইনালে একানব্বই শতাংশ পাওয়া মেয়ে আমি নিজেকে কলেজের একজন নিষ্ঠাহীন ছাত্রী হিসেবে আবিষ্কার করি। মাকে রীতিমত হতাশ করে দিয়ে দেখি আমার দিনের নিয়মানুবর্তিতা বলে কিছু নেই। সকালে দশটা থেকে এগারোটার মধ্যে কলেজে যাই। মা ছাড়েন। কিন্তু তাঁর হিসেবমত আমার কলেজ থেকে পায়ে হেঁটে সরাসরি 'আই আই টি'র কোচিং ক্লাসে যাওয়া হয়ে ওঠে না। তিনটে অফের পর সুদূরের একটা বা দুটো পিরিয়ডের মুখ চেয়ে বসে থাকা সম্ভব হয় না। আমি বাসে করে বাড়ির দিকে রওনা হই। কখনো একটাতে, কখনো আড়াইটাতে, কখনো তিনটেতে। সন্ধ্যে ছ'টায় প্রাইম-এর ক্লাস। হতাশাগ্রস্ত মা আমাকে তাঁর বাইকের পেছনে বসিয়ে নেন। রাতে মা'ই নিয়ে আসেন সেখান থেকে।

বাড়িতে অন্য কাউকে না পাওয়ায় আমার তুলনা শুধু মায়ের সঙ্গে। গুডস অ্যান্ড সার্ভিস ট্যাক্স প্রথমদিকে তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না। কিন্তু অনেক পরে ভেবে দেখেছেন এটা মন্দ নয়। আমি তাঁকে তীর ছুঁড়েছিলাম, "তোমার ভালই হয়েছে, অনেক মশলা জি এস টি ফ্রী।"

উনি কিছু বলেন না। আমার হিংসের স্বাদ নিঃশব্দে আস্বাদন করেন।

কমপ্লেক্সের মেন গেটের সামনে উবারকে থামিয়ে দেওয়া হল। মেন গেটে নেমে হেঁটে হেঁটেই অফিসে পৌঁছলাম।

অফিসে আমার সঙ্গে অভিলাষা নামে আরেকটি মেয়ে জয়েন করে। ম্যানেজার আমাকে, অভিলাষাকে এবং সাক্ষী ও প্রাজক্তা নামে আরও দুটো মেয়েকে তাঁর কেবিনে ডাকলেন। কেবিনে আমাদের বাঁ দিকের দেওয়াল জুড়ে কালো রঙের বুক শেলফ। পেছনে কেবিনের দরজার একপাশে লেদার সোফা, অন্য পাশে দেওয়ালে একটা এল ই ডি টেলিভিশন। দরজার উপরে দেওয়াল ঘড়ি। তিনি বসে আছেন মেজনাইট হাই ব্যাক ব্ল্যাক অফিস চেয়ারে। তাঁর সামনে কাঠের তৈরি এক্সিকিউটিভ অফিস টেবিল। টেবিলে বড় ডেস্কটপ। বোধ হয় সাতাশ ইঞ্চির। ডেস্কটপের চারিদিকে কাগজপত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে। তিনি প্রোজেক্টের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন—আমাদের কম্পানি প্যানাসিয়া ইনফোটেক 'এস এ পি' প্রোজেক্টটা পেয়েছে

মারাফুফু থেকে। মারাফুফুও একটি আই টি কম্পানি। মারাফুফু প্যানাসিয়াকে প্রোজেক্ট দিয়েছে তাই মারাফুফু হল প্যানাসিয়ার ক্লায়েন্ট এবং প্যানাসিয়া হল মারাফুফুর সার্ভিস প্রোভাইডার।

ম্যানেজার জানান, ''এখন গো লাইভ হয়ে গেছে অর্থাৎ প্রোজেক্ট চলছে—সময় খুব কম, তাই ট্রেনিং-এর জন্য আলাদা করে পনেরো দিন দেওয়া যাবে না।''

বলি, ''ইন্টারভিউয়ের সময় আমাদের বলা হয়েছিল প্রোজেক্টের জন্য পনেরো দিনের ট্রেনিং বাধ্যতামূলক।''

''তোমরা প্রাজক্তা এবং সাক্ষীর কাছে এক সপ্তাহে সব শিখে নাও।''

''ঠিক আছে।''

''নাইট ডিউটি করতে হবে।''

''অফার লেটারেই বলা হয়েছে।''

''একটানা একমাস নাইট ডিউটি।''

অভিলাষার প্রশ্ন, ''কেন স্যার?''

''কেননা এক একটা শিফট একমাস ধরে চলবে।''

''আমাদের কোন শিফট দিয়ে শুরু হবে স্যার?''

''মর্নিং শিফট। একমাস মর্নিং-এর পরে একমাস আফটারনুন শিফট চলবে। তারপরে নাইট শিফট।''

''শিফটের সময় কি?''

''মর্নিং শিফট সকাল সাড়ে ছ'টা থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত। আফটারনুন শিফট শুরু দুপুর দুটো থেকে রাত সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত এবং নাইট শিফট রাত সাড়ে দশটা থেকে সকাল আটটা পর্যন্ত। আগামীকাল থেকে তোমাদের সকাল সাড়ে ছ'টায় অফিসে পৌঁছতে হবে।''

তিনি শিফটের বিস্তারিত বর্ণনা দেন। প্রোজেক্টে লেভেল ওয়ানে তাঁকে নিয়ে মোট বারোজন ইঞ্জিনিয়ার কাজ করবে। বারোজনের মধ্যে তিনজন ছেলে বাকি দশজন মেয়ে। দু'মাস আগে সাক্ষী, প্রাজক্তা, বেদান্তি, কানুপ্রিয়া, রুচিরা নামে ছয়টি মেয়ে জয়েন করেছে। টিমলিড নিযুক্ত হয়েছিল তারও আগে। নাম লোকনাথ। শচীনকে অ্যাপয়েন্ট করা হয়েছে মারাফুফু থেকেই। সে প্রোজেক্ট-এক্সপার্ট।

বাইরে বেরিয়ে প্রাজক্তাকে জিজ্ঞেস করলাম, ''টিমলিড কেন আমাদের ট্রেনিং দেবে না?''

''সে রোস্টার বানাতে ব্যস্ত থাকবে।''

সাক্ষী বলে, ''অন্যের পেছনে পড়া ছাড়া সে জানেই বা কি!''

প্রাজক্তা সাক্ষীকে খোঁচা দেয়, ''তোর ইতিমধ্যেই তিনটে এস্কেলেশন এসে গেছে।''

আমি প্রাজক্তাকেই জিজ্ঞেস করি, ''এস্কেলেশন মানে?''

''সাক্ষীই তোকে বলে দেবে।''

ঠিক হল আমি সাক্ষীর পাশে বসে কাজ শিখব এবং অভিলাষা শিখবে প্রাজক্তার পাশে বসে।

*****

বাড়ি থেকে অফিস পঁচিশ কিলোমিটার। যাতায়াতের জন্য কম্পানি ট্রান্সপোর্ট পাইনি। 'আই টি'তে প্রায় প্রতিটি অফিসেরই নিজস্ব ট্রান্সপোর্ট থাকে। অফিসের নামে সেই ট্রান্সপোর্টের নামকরণ হয়, যেমন অরেকল ট্রান্সপোর্ট, নিলা ট্রান্সপোর্ট, এক্সাসিস ট্রান্সপোর্ট, এইচ সি এল ট্রান্সপোর্ট, উইপ্রো ট্রান্সপোর্ট। সুতরাং আমাদের ট্রান্সপোর্টের নাম যে প্যানাসিয়া ট্রান্সপোর্ট হবে সে ব্যাপারে আমি মোটামুটি নিশ্চিত। বিভিন্ন ক্যাব ম্যানেজমেন্ট কম্পানি আই টি কম্পানিতে ট্রান্সপোর্ট প্রোভাইড করে অর্থাৎ সাপ্লাই করে। প্যানাসিয়াকে কোন ক্যাব ম্যানেজমেন্ট কম্পানি ক্যাব সাপ্লাই করছে তা নিয়ে আমাদের মাথাব্যথা নেই। আমার মাথা এমনিতেই ধরে আছে। পাঁচদিন আগে আমি ম্যানেজারকে আমার ডিটেলস দিয়েছি। ডিটেলস বলতে আমার ঠিকানা। এমপ্লয়ি'জ আইডি ম্যানেজারের কাছেই আছে এবং আমি কেন হিঞ্জেওয়ারিতে জয়েন করেছি তার কারণ ম্যানেজার জানেন। দেহু রোড এবং মগরপাট্টাতে প্যানাসিয়ার দুটো ব্রাঞ্চ অফিস । আমি থাকি বিশ্রান্তওয়ারিতে। আমার বাড়ি থেকে হিঞ্জেওয়ারির দূরত্ব বাইশ কিলোমিটার, 'দেহু রোড'-এর দূরত্ব পঁচিশ কিলোমিটার এবং মগরপাট্টার দূরত্ব বারো কিলোমিটার। কম্পানির পলিসি হিসেবে এমপ্লয়িদের বাড়ির কাছের অফিস দেওয়া হয়। আমার তাহলে মগরপাট্টার অফিস পাওয়ার কথা। কিন্তু আমি পেয়েছি হিঞ্জেওয়ারির, যেহেতু আমাকে এস এ পি প্রোজেক্টের জন্য অ্যাপয়েন্ট করা হয়েছে। এস এ পি প্রোজেক্ট দেহু রোড বা মগরপাট্টাতে নেই।

মর্নিং শিফটের জন্য ভোর সাড়ে চারটেয় ঘুম থেকে উঠতে হচ্ছে। জামা কাপড় পরে উবার বুক করে পেতে পেতে পাঁচটা। স্নান-খাওয়া করার সময় হয় না। একটা ওট-এর প্যাকেটকে আমার হ্যান্ড ব্যাগে স্থায়ী জায়গা দিয়ে ফেলেছি। রাতে দু'তিনটে করে ফলও ভরে রাখছি।

কিউবিকলে মোট সাতচল্লিশটা বিল্ডিং। সব দশ থেকে বারোতলা। বিল্ডিং-এর নামকরণ হয়েছে আই টি ওয়ান, আই টি টু, আই টি থ্রী, আই টি ফোর...এইভাবে। প্যানাসিয়া 'আই টি টু'-এর পুরোটা, 'আই টি থ্রী'-এর পুরোটা এবং 'আই টি ফোর'-এর অর্ধেকটা দখল করে আছে। আমি কাজ করছি 'আই টি ফোর'-এ। কম্পানির ট্রান্সপোর্ট এমপ্লয়িদের তাদের অফিস বিল্ডিং-এর পাদদেশে নামিয়ে দেয়। উবারের কিউবিকলের ভেতরে ঢোকার অনুমতি না থাকায় আমাকে দশ মিনিট হাঁটতে হয়। লিফটে সাততলায় চড়ে মেন দরজা এবং তারপরে আরও দুটো দরজা অর্থাৎ মোট তিনটে দরজায় আইডি কার্ড সোয়াইপ করে 'বে'তে পৌঁছতে অতিরিক্ত সাত মিনিট। আলাদা আলাদা 'ওয়ার্কিং এরিয়া (কাজের জায়গা)'কে বলা হয় 'বে'। আমাদের 'বে'তে আছে লেভেল

ওয়ান এবং লেভেল টু। সেখানে অ্যাম্পিথিয়েটারের মত বসার বসার ব্যবস্থা। অর্ধচন্দ্রাকৃতি চার ফুট চওড়া ও বারো ফুট লম্বা সিঁড়ি। প্রথম তিনটে ধাপের প্রত্যেকটাতে তিনটে করে, পরের দুটোর প্রত্যেকটাকে চারটে করে এবং শেষের ছ'টা ধাপের প্রত্যেকটাকে পাঁচটা করে ডেস্কটপ। সিঁড়ির সামনের দিকের দেওয়ালে আটটি এল ই ডি স্ক্রিন। সেখানে ড্যাশবোর্ড বা গ্রাফে লোকা অর্থাৎ লোকনাথ আমাদের কাজের আপডেট পর্যবেক্ষণ করে। 'বে'তে পৌঁছে ব্যাগ রেখে সিস্টেম-এ লগ ইন করতে আরও তিন মিনিট। লগ ইন করলেই ক্ল্যায়েন্টের কাছ থেকে প্রবলেম টিকিট আসতে শুরু করে। টিকিটে সমস্যা বা প্রবলেমস-এর ডিটেলস থাকে। ডিটেলস অ্যানালাইজ করে তা সলভ করার জন্য আলাদা আলাদা ল্যান্ডস্কেপ-এ রাউট করার তাড়া থাকে। ল্যান্ডস্কেপের অর্থ হল ডিভিশন বা ডেস্টিনেশন। রাউট-এর অর্থ হল টিকিটকে উপযুক্ত ডেস্টিনেশন-এ পাঠানো।

মোট সাড়ে ন'ঘণ্টা ডিউটি আওয়ারের মধ্যে দেড় ঘণ্টা ব্রেক। যে কেউ যে কোন সময়ে ব্রেক নিতে পারে। ব্রেক একবারেও নিতে পারে অথবা ভেঙে ভেঙে। ভেঙে ভেঙে যতবার খুশি ততবার, তবে নিশ্চয় কাজ সামলে।

ব্রেকফাস্ট বা লাঞ্চ করতে হয় ব্রেকআউটে। অফিসে ঢোকার সময় মেন ডোরের পরেই ব্রেকআউট এরিয়া। সেখানে একটা উঁচু প্ল্যাটফর্মের উপর একটা বিশাল বড় টেবিল চারপাশে দশটি চেয়ার নামক চ্যালাচামুণ্ডা নিয়ে দাঁড়িয়ে। এছাড়াও আছে আরও কয়েকটি ছোট ছোট টেবিল। তাদের প্রত্যেকটির চারপাশে দুই থেকে চারটে চেয়ার। সেগুলোকে ক্লাস্টার বলে। ব্রেকআউটে কফি-মেশিনও আছে। 'সি সি ডি'র কফি মেশিনের মত দেখতে। পুরো জায়গাটা নানারকম ফুল এবং পাতাবাহারের গাছ দিয়ে অভিজাত রেস্তোরাঁর ন্যায় সাজানো গোছানো হলেও তাতে 'ওয়ার্কপ্লেস লুক' বর্তমান।

প্রাজক্তাকে দেখেছি পাঁচ মিনিটের ব্রেক নিয়ে 'বে'তে বসেই চাকলি চিবোয়। আমি নতুন, একইসঙ্গে কাজ শিখছি এবং কাজ করছি। কাজের ভারে বিভ্রান্তও হয়ে পড়ছি। খিদের যন্ত্রণায় পেট কাতর হলেও ব্রেকফাস্টের জন্য দশ মিনিটও বের করতে পারছি না। চারদিন পেটকে কষ্ট দিয়ে চতুর্থ দিনে কাজ করতে করতে ব্যাগ থেকে আপেল বের করে মুখে দিতেই ম্যানেজার এসে সামনে দাঁড়ালেন। বললেন, "টিফিন নট অ্যালাউড ইন বে।" হতভম্ব হয়ে অর্ধচন্দ্রাকৃত কামড়ের দাগ পাওয়া আপেলকে ব্যাগে ঢুকিয়ে দিই। প্রাজক্তা পরে বলে, "ম্যানেজার তোর সঙ্গে মজা করছিলেন।"

"অসম্ভব। ওঁর মুখ খুব গম্ভীর ছিল।"

প্রাজক্তা ব্যাগ থেকে আপেল বের করে আমার মুখের সামনে ধরে, "খা এটা। কিচ্ছু বলবেন না। তুই জানিস না, উনি নিজেই একজন পেটুক লোক।"

প্রাজক্তা ঠিকই বলেছে। ঘণ্টাখানেক পরে 'বে'তে মেয়েরা স্ন্যাক্স বের করতেই

তার বেশিভাগটাই তাদের পেটে না গিয়ে ওয়াইড বল হয়ে ম্যানেজারের পেটে ঢুকে পড়ল। সবার টিফিনবক্সেই তিনি হাত মারছেন। সবার টিফিন খেয়ে বেড়াচ্ছেন অথচ কাউকে নিজের টিফিন খাবার সুযোগ দিচ্ছেন না। নিজের টিফিন কেবিনে ফেলে এসেছেন। ম্যানেজার কখন হাসেন কখন রাগেন বোঝা যায় না। তাঁর মুখে হাসি বা রাগের কোন প্রকাশ নেই। গলার স্বরেও কোন উত্থান-পতন নেই। এই বৈশিষ্ট্যগত দোষ জন্মসূত্রে পাওয়া নাকি পরে জন্মেছে কে জানে! এই দোষের কারণে আমাকে ভুগতে হচ্ছে। আমি তাঁকে ক্যাবের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে উনি আমার খুব কাছে আসেন, প্রায় গা ঘেঁষে দাঁড়ান, জিজ্ঞেস করেন, ''কি?''

''স্যার, ক্যাব...''

আমার টিফিনবক্স থেকে একটা গোটা আপেল হাতে উঠিয়ে নিরুত্তর তিনি 'বে'তে ঢুকে পড়েন।

সাপ্তাহিক ছুটি দু'দিন। তবে মেয়েরা আলাদা আলাদা বারে সাপ্তাহিক ছুটি পায়। আমাকে দেওয়া হয়েছে রবি এবং সোম। আমার জয়েনিং-এর প্রথম রবিবারে মন একটু শান্ত থাকার কথা। কিন্তু আমি অশান্ত। সোমবারে মগরপাট্টাতে যেতে আসতে ছ'শো টাকা লেগেছে। হিঞ্জেওয়ারির জন্য ওয়ান ওয়েতেই চারশো করে দিনে আটশো টাকা খেয়েছে উবার। আলাদা আলাদা উবার। মঙ্গল থেকে শনি এই পাঁচদিনে খেয়েছে চার হাজার টাকা। টাকা খেয়ে টাকা তাদের হজম হয়ে গেছে কিন্তু টাকা দিয়ে খালি হয়ে যাওয়া আমার পকেট শোক ভুলতে পারছে না। আমার পকেটের শোক মানেই আমার শোক। পাঁচদিনের মধ্যে তিনদিন ব্রেকের সময় সঞ্জয় আমার সঙ্গে কিউবিকলে দেখা করতে এসেছে। আমাকে আনন্দ দিতে চেয়ে একসঙ্গে লাঞ্চ করতে চেয়েছে। আমাদের ব্রেকআউটে আমরা বাড়ি থেকে বহন করা টিফিন নিয়ে বসি। অন্য কিছু খেতে চাইলে বিল্ডিং-এর নিচের ক্যান্টিনে যেতে হয়। প্রথম দিনই আমি অভিলাষার সঙ্গে নিচের ক্যান্টিনটি দেখে এসেছিলাম। জেনেছিলাম সেখানে বেশ সস্তায় পোহা, ব্রেড-প্যাটিস, উপমা, বড়া, ইডলি, দোসা, রুটি-সবজি, আলু-পরোটা, পনির-পরোটা পাওয়া যায়। আমি অবাক হয়েছিলাম মাত্র কুড়ি টাকায় পোহা এবং ব্রেড-প্যাটিসের প্লেট দেখে। দুটোই খেতে ইচ্ছে হয়েছিল। হাফ প্লেট করে দুটোরই স্বাদ নিয়েছিলাম। কুড়ি টাকায় পেট ভরে গিয়েছিল। অভিলাষা খেয়েছিল ডাল, তরকারি, ভাজা, চাটনি, দইসহ ভাতের থালি, মাত্র চল্লিশ টাকায়। প্রত্যেকটা বিল্ডিং-এই এমন নিজস্ব ক্যান্টিন আছে। কিন্তু যেহেতু ব্রেকআউট এবং বিল্ডিং ক্যান্টিনে বাইরের লোককে ঢুকতে দেওয়া হয় না, বাড়ি থেকে বয়ে নিয়ে আসা টিফিন দিয়ে অথবা বিল্ডিং ক্যান্টিনে উপলব্ধ সস্তা খাবার দিয়ে সঞ্জয়ের সঙ্গে লাঞ্চ উপভোগ করা আমার সম্ভব হয়নি। সে আমাকে নিয়ে গেছে কিউবিকলের সাধারণ ক্যান্টিনে। অনেকটা দূরে অনেক বড় সেই ক্যান্টিন। পাঞ্জাবি, সাউথ-ইন্ডিয়ান এবং

কন্টিনেন্টাল ডিশ পাওয়া যায়। অনেক তাদের দাম। সেখানে খাওয়াশেষে সঞ্জয় 'টি টি এম এম' অর্থাৎ 'তু তেরা ম্যায় মেরা' করেছে। শেষপর্যন্ত দেখা গেছে উবারের সঙ্গে খাওয়ার টাকা যোগ হয়ে আমার দুঃখ আরও ফুলে ফেঁপে উঠেছে।

সিদ্ধান্ত প্রায় নিয়েই ফেলি এই চাকরিটা আমি ছাড়বই।

চাকরি ছাড়ার সিদ্ধান্ত জানাতে রবিবার রাতেই মাকে ফোন লাগালাম।

মা বললেন, "তোমার অফিস মগরপাট্টাতে হলে উবারের খরচাটা কম হত।"

মগরপাট্টা পুনের হডপসার এলাকাতে চারশো পঞ্চাশ একরের একটা বিশাল গেটেড কমিউনিটি। সেখানে ডেস্টিনেশন সেন্টার নামে কমার্শিয়াল এরিয়া আছে। এছাড়াও আছে রেসিডেনশিয়াল এরিয়া, শপিং মল, রেস্টরেন্ট, জিম, হসপিটাল, স্কুল এবং পঁচিশ একর জমির উপর তৈরি অদিতি গার্ডেন নামে একটি পার্ক। মগরপাট্টার কন্সট্রাকশন শুরু হয়েছিল কুড়ি বছর আগে। এখনও শেষ হয়নি। এখনও নতুন নতুন হাউজিং সোসাইটি তৈরি হয়ে চলেছে। তবু মগরপাট্টা আমার পছন্দ নয়। মগরপাট্টাতে আমার পোস্টিং হলে আমি নিশ্চয় জয়েনিং-এর আগেই চাকরি ছেড়ে দিতাম।

"তুমি আমার অফার লেটারে ট্রাভেল আলাউন্সের ব্যাপারে কিছু পড়োনি?"

"নম্বর ৬.৬.৩-এ লেখা ছিল কম্পানি তোমাকে ট্রাভেল আলাউন্স দেবে কিদেবে না তা কম্পানির ট্র্যাভেল অ্যান্ড এক্সপেন্স পলিসি নির্ধারণ করবে।"

"সঞ্জয় বলেছে প্রায় সব কম্পানিই এমন বলে কিন্তু প্রায় কোন কম্পানি ট্র্যাভেল আলাউন্স দেয় না। বলে গরীব প্রোজেক্ট। চাকরি আমি ছাড়বই মাম্মা।"

মা কথাটাকে ঘুরিয়ে দেন, "হিঞ্জেওয়ারি জায়গাটা কেমন?"

হিঞ্জেওয়ারির রাজীব গান্ধি ইনফোটেক পার্ক অনেক বড়। দু'হাজার আটশো একর জমির উপর তৈরি। সেখানেও আই টি কম্পানির সঙ্গে অন্যান্য বিজনেস সেন্টার, শপিং মল, হসপিটাল, স্কুল, কলেজ, জিম, রেস্টরেন্ট আছে। এবং আছে যোগা ও মেডিটেশন সেন্টার, আই বি স্কুল, স্পোর্টস বার, ডান্স স্টুডিও। চাকরি পাওয়ার আগেই আমি সঞ্জয়ের সঙ্গে জায়গাটাতে অনেক ঘুরেছি। দেখেছি কাছেই সবুজ পাহাড় এবং কয়েকটি প্রফেশন্যাল ট্রেকিং অর্গানাইজার। তবু মাকে বলি, "এমন কিছু না। তুমি নিশ্চয় পড়েছ আমাদের কোন বন্ড নেই? আমি কালকেই একমাসের নোটিশ দেব।"

"আমি গুগল পে থ্রু তোমাকে আট হাজার ছ'শো টাকা পাঠিয়ে দিচ্ছি। আর এক

সপ্তাহ দেখো।"

*****

অফিসের দিনগুলোর মত ভোর সাড়ে চারটাতে অ্যালার্ম সেট করে না রাখায় সোমবার সকাল আটটায় পায়রার অত্যাচারে ঘুম ভাঙ্গে। ইঞ্জিনিয়ারিং করার সময় কলেজে যাওয়ার পালা মোটামুটি চুকিয়ে ফেলে নিশাচর হয়ে গিয়েছিলাম। রাত জেগে গল্পের বই পড়তাম। আমাকে জেগে থাকতে দেখে মা বেশিক্ষণ চোখের পাতা বন্ধ রাখতে পারতেন না। মধ্যরাতে একাধিকবার বিছানা থেকে উঠে আমার ঘরে চলে আসতেন, "রিলি কি করছো?"

বলতাম, "ঘুম আসছে না, তাই বই পড়ছি।"

"চোখ বন্ধ করে দশ মিনিট শুয়ে থাকো, ঘুম আসবে।"

"আমার ওইভাবে ঘুম আসে না।"

মা হাল ছাড়ার পাত্রী নন। "শুধু চোখ বন্ধ করলে হবে না। মনের দরজাকেও বন্ধ করতে হবে। মনে কোন ভাবনার প্রবেশ যেন না ঘটে। দেখবে..."

"ওহো মাম্মা, আমার গল্পের বই পড়তে পড়তেই ঘুম আসে। তুমি এখন যাও।"

সকাল সাড়ে ছ'টায় ঘুমোতাম আর ওই পায়রা দুটো দেড় ঘণ্টা বাদেই, ঠিক আটটার সময় আমার জানালার গ্রিলের মধ্যে ঢুকে প্রতিদিন বিশ্রীভাবে আমার ঘুম ভাঙ্গাতো। আমার খুব রাগ হত। আমি গল্পের বই-এর জন্য নিশাচর। মা আমার জন্য ওই জাতীয়ই কিছু একটা। তিনি আধঘুমে রাত কাটান। কখনো পায়রার অত্যাচার থেকে নিজেকে বাঁচাতে সকালে তাঁর বিছানায় তাঁর পাশে শুলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়েন। আমার চিন্তায় আধঘুমে থাকেন বলেই সামান্যতম আওয়াজ তাঁকে জাগিয়ে দিতে পারে। এভাবেই তাঁর রাতের ঘুম শেষ হয়, শুরু হয় আমার দিনের ঘুম।

মা আমাকে নানাভাবে ভয় দেখানোর চেষ্টা করেছেন। কখনো বলেছেন, রাতে না ঘুমলে চিন্তাশক্তি কমে যাবে, কখনো বলেছেন ডিপ্রেশনে ভুগবে, কখনো বলেছেন তাড়াতাড়ি বার্ধক্য এসে যাবে, কখনো বলেছেন টেলোমিয়ার ছোট হয়ে যাবে।

মা টেলোমিয়ার ছোট হয়ে যাওয়ার জ্ঞানটা ইন্টারনেট থেকে প্রাপ্ত করেছেন। বায়োলজি নিয়ে এম এস সি করায় অনেক না জানা জিনিস পড়ে ফটাফট বুঝে যান। আমাকে বোঝান টেলোমিয়ার হল নন-কোডিং ডি এন এ সিকোয়েন্স দ্বারা তৈরি ক্রোমোজোমের ক্যাপ যা ক্রোমোজোমের উপক্ষয় প্রতিরোধ করে। টেলোমিয়ারের দৈর্ঘ-হ্রাস অকালমৃত্যুর কারণ হয়।

আমি মায়ের কথা এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে বের করে দিই। আমাকে ভয় দেখানোর তাঁর সব প্রয়াস ব্যর্থ হয়। আমার অন্য কোন সমস্যা নিয়ে ডাক্তারের কাছে গেলে মা ডাক্তারকে আমার রাত জাগার কথা বলেন। ভাবেন যদি ডাক্তার আমাকে শোধরাতে পারেন। অন্য সমস্যা নিয়ে গেছি বলে ডাক্তার এই সমস্যাকে

তেমন গুরুত্ব দেন না। আমি এখন শিশু নই। প্রাপ্তবয়স্কা। আমার চিকিৎসার জন্য প্রেসক্রিপশনে ওষুধের নাম লিখতে হবে এবং তার জন্য আমার অনুমতি দরকার। উনি শুধু মুখে আমাকে সাবধান করেন, ''রাতে না ঘুমনোর অর্থ হল বায়োলজিক্যাল ক্লকটাকেই পরিবর্তিত করে দেওয়া। বায়োলজিক্যাল ক্লক পরিবর্তন করার অর্থ হল শরীরে হরমোনের ক্ষরণগুলোকে উল্টোপাল্টা করে দেওয়া।'' উচ্চ মাধ্যমিকে বায়োলজি না থাকায় হরমোন নিয়ে বিশদ জ্ঞান আমি লাভ করিনি। মায়েরও ভয় দেখানোর সিলেবাসের মধ্যে হরমোন নামক শব্দটি ঢোকেনি। তাই ডাক্তারকেই জিজ্ঞেস করি, ''যেমন?''

''যেমন কর্টিসল হরমোনের ক্ষরণ বৃদ্ধি পাবে। কর্টিসল হল একটা স্ট্রেস হরমোন। তারপরে তোমার ইনসুলিনেরও পরিমাণ বাড়বে। ফলে ব্লাডে সুগারের পরিমাণ কম হয়ে যাবে, যাকে বলা হবে হাইপোগ্লাইসেমিয়া। ইনসুলিন ব্লাড সুগারকে কন্ট্রোল করে। তারপরে ঘ্রেলিন নামে একটা হরমোন আছে। সেটাও বাড়বে।''

কর্টিসল, ইনসুলিন নাম দুটো চেনা চেনা লাগে। ঘ্রেলিন-এর নাম এই প্রথম শুনলাম। ''কি করে ঘ্রেলিন?''

''ঘ্রেলিনকে হাঙ্গার হরমোনও বলে। ঘ্রেলিন তোমার খিদেকে বাড়িয়ে দেবে। জেগে রইলে তোমাকে বারবার খেতে হবে যার ফলে তোমার ওজন বাড়বে। খালি পেটে রক্তে ঘ্রেলিনের মাত্রা সব থেকে বেশি থাকে, ভরা পেটে সব থেকে কম।''

গতবার বাড়ি এসে মা গ্রিলের বাইরে নেট লাগিয়ে দিয়েছেন। আজকে ওই পায়রা দুটোর আসার কথা ছিল না। বৃষ্টিতে ভিজে গিয়ে মারামারি করতে করতে নেট-এ এসে বাড়ি খেয়েছে। রাতে কখন ঝিরি ঝিরি বৃষ্টি শুরু হয়েছিল জানতে পারিনি। বৃষ্টি এখনও চলছে। সেপ্টেম্বর মাস শেষ হব হব। বাতাসে তাপমাত্রা বর্ষাতেই কমে গিয়েছিল। এখন তাপমাত্রা আরও নিচের দিকে।পায়রাকে অভিসম্পাত সেরে আরেকটু ঘুমনোর চেষ্টা করলাম। কিন্তু লাভ হল না। টাকার দুঃখ আবার পেয়ে বসল। আবার মাকে কল করলাম, ''টাকাটা এখনও পাঠালে না তো!''

''এই পাঠিয়ে দিচ্ছি।''

জানালার কাচ ভেদ করে সূর্যের আলো আমার চোখে এসে পড়েছে। পর্দা টেনে দিয়ে সময় নষ্ট না করে সিডনি শেল্ডন-এর 'দ্য আদার পার্ট অফ মিড নাইট' খুললাম। অনলাইন অর্ডার করেছিলাম। গত পরশু ডেলিভারি পেয়েছি। মাত্র এগারো পাতা পড়া হয়েছে কি সঞ্জয়ের ফোন, ''আগামী মাসের সাত তারিখ থেকে তিরুবনান্থাপুরমে আমার ট্রেনিং শুরু হবে।''

''সুখবর।''

সঞ্জয় চুপ করে রইল।

''কি হল? যাওয়ার ইচ্ছে নেই?''

"মন খারাপ করছে।"

"কেন?"

"তোর জন্য।"

*****

ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার সময়ও কলেজে অনুপস্থিতির কারণে। ক্লাসের অনেক স্যারের, অনেক ম্যাডামের অনেক নোটই কাছে থাকে না। অনেক জার্নালই আমি সমাপ্ত করি না। করলেও সময়মত করি না। আমাদের সি ডিভিশনের দুটো ছেলে অনুরাগ এবং সঞ্জয় আমাকে নোট পেতে যথেষ্ট সাহায্য করে। আমার বাড়িতে এসেও তারা দিয়ে যায় নোট। তবু চক্ষুলজ্জা বলে একটা জিনিস আছে। চক্ষুলজ্জা বাঁচাতে আমি সি ডিভিশনেরই অঙ্কিতা নামের একটি মেয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছি। আমারই মত ফাঁকিবাজ হতে হতে সে একটু আলাদা হয়ে গেছে। অন্তত জার্নালগুলো অসমাপ্ত রাখে না। একদিন অঙ্কিতার সঙ্গে আমাদের নতুন বারোতলা বিল্ডিং-এর সিঁড়িতে বসে আড্ডা মারছি। সে বলেছে আগামীকাল সে আমাকে পি টু জার্নালটা দেবে। হঠাৎ দেখি একটি ছেলে সামনে এসে দাঁড়ালো, "এক্সকিউজ মী রিলি..."

অবাক হয়ে তাকাই তার দিকে।

"তোমার জার্নালটা আমার একটু দরকার ছিল।"

"তোমাকে ঠিক চিনতে পারলাম না।"

"সঞ্চিত। ফার্স্ট ইয়ারের ডি ডিভিশনে পড়ি।"

"না না, আমার জার্নালে তোমাকে কিছু লিখতে হবে না। আমি নিজেই...।"

"তোমার জার্নালে আমি কিছু লিখব না। তোমারটা দেখে আমি আমার জার্নালে লিখব।"

"আমার জার্নাল কমপ্লিটই হয়নি..."

"তবু দরকার।"

"কেন?"

"যতটুকু লিখেছ সেটুকুই যথেষ্ট।"

"কিন্তু...।"

"চিন্তার কিছু নেই, কালকেই দিয়ে দেব।"

তাকে আমি আমার প্রায় সাদা পাতায় ভরা জার্নাল দিই। অঙ্কিতা বলে, "বুঝতে পারলি না? ছেলেটি তোর প্রেমে পড়েছে।"

"মিথ্যে কথা।"

"বাজি রাখ। সত্যি হলে তুই আমার কাছ থেকে জার্নাল পাবি না।"

পরদিন সঞ্চিত আমাকে জার্নাল ফেরত দিল। খুলে দেখলাম তার মধ্যে একটা চিঠি। লেখা আছে, "ইউ হ্যাভ নো আইডিয়া হাউ মাচ মাই হার্ট রেসেস হোয়েন

আই সী ইউ।" একজন অজানা, অচেনা ছেলের কাছ থেকে ইন্টারনেট ঘেঁটে বের করা এমন মেসেজ পেয়ে আমি স্ফুলিঙ্গ, ইংরেজিতে যাকে বলে স্পার্ক অনুভব করিনি। উল্টে বিরক্তি। পরদিন কলেজে গেলে সে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে। জিজ্ঞেস করে তাকে নিয়ে আমার সিদ্ধান্ত। বললাম প্রেম করব না। শুধু বন্ধু হয়ে থাকব। সে রাজি হল না। বলল, ডেট না করলে এমনি এমনি কথা বলব না। আমার তখন প্রেমিকের প্রয়োজন নেই। বন্ধুও না হলেও চলবে। আমার প্রয়োজন জার্নাল। অঙ্কিতার কাছে বাজি হেরে আবার সঞ্জয়ের দ্বারস্থ হলাম। সে এবারও না বলল না। উপরন্তু এক বিকেলে আমার বাড়ি এসে আমাকে লিখতে সাহায্য করল। রাতে বাইরে নিয়ে গেল। অ্যাটমসফিয়ার সিক্স-এর ছ'তলায় ক্যান্ডল লাইট ডিনারে বসিয়ে বলল, "আই লাইক ইউ রিলি।"

সঞ্জয়ের প্রস্তাবেও কোন স্পার্ক নেই আমার মধ্যে। ছেলেটি লাজুক, ভদ্র, বিশ্বাসযোগ্য এবং সবথেকে বড় কথা সব প্রয়োজনে সাহায্য করতে এক পায়ে খাড়া। তবু সমস্যা, ওকে ভাই ভাই লাগে। ভাবি, দেখা যাক, যদি ভবিষ্যতে তেমন কিছু মনে হয় বলব। ভাই-এর জায়গা থেকে পদোন্নতি ঘটিয়ে একেবারে...

সঞ্জয় জিজ্ঞেস করল, "কি ভাবছিস?"

ভাবছি একেবারে কি হবে? কি হবে আমাদের এই বন্ধু-ভাইয়ের সম্পর্কের? শুক্রগ্রহের মত ঝিকমিক করবে? দূরের গ্রহ ঝিকমিক করে না। পৃথিবীর কাছে হলে করে। যেমন শুক্রগ্রহ, শুকতারা। আমাদের সম্পর্ক শুকতারাতে অবস্থান করবে। শুকতারা তারা না হয়েও তারা। আমরা প্রেমিক-প্রেমিকা না হয়েও...। কি আমরা? মিয়া-বিবি? সঞ্জয় কি ভাইজান থেকে মিয়াজান-এ পরিবর্তিত হবে?

"কিছু না।" ওকে বলি, "আপাতত শুধু প্রকৃত বন্ধ হয়ে থাকি?"

"ঠিক আছে।"

সঞ্জয় সঞ্চিত নয়। ওয়েটার টেবিলে বিল রাখে। আটশো ষোলো টাকা। সঞ্জয় চারশো আট টাকা পকেট থেকে বের করে বিলের উপরে রেখে বুঝিয়ে দেয় বাকিটা আমাকে দিতে হবে।

*****

ভাবছিলাম, সঞ্জয়কে সেদিন 'হ্যাঁ' বললে সে নিশ্চয় আমার খাবারের টাকাটা পে করত।

সে বলল, "তুই বলেছিলি পরে বলবি।"

ওকে কি করে বলি আমি সেই রাতে একটু পরেই আমার ভাগের চারশো আট টাকা বের করতে করতে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলাম, সঞ্জয়ের সঙ্গে প্রেম নয়। "সঞ্জয়, তুই যে পেশা বাছতে চলেছিস তাতে তোর সঙ্গে আমার নিয়মিত যোগাযোগই সম্ভব নয়..."

''হ্যাঁ, বছরের বেশিরভাগ দিনই সমুদ্রে কেটে যাবে...''

''অল দ্য বেস্ট।''

''কি করবি আজ?''

''বই পড়ব।''

''চল, সিনেমা দেখে আসি।''

টাকা হারিয়ে আমার মন খারাপ। সঞ্জয় মনের ক্ষততে মলম দিতে এসে টাকার উপরই আবার বাড়ি মারবে। সিনেমা দেখতে গেলে আমার টাকা আমাকেই দিতে হবে। তাই অনিচ্ছা দেখাই, ''না রে, ভীষণ ক্লান্ত। তবে তোর যাওয়ার আগে একদিন অবশ্যই আমরা অনেকটা সময় একসঙ্গে কাটাবো।''

আজকে লাভকে নিয়েও হ্যাং-আউট-এর কথা ভাবতে পারছি না। ওর সঙ্গে বেরোলেও এখন না হলেও পরে আমাকেই আমার টাকাটা দিতে হবে।

লাভ...

সেকেন্ড ইয়ারে আমার এবং সঞ্চিতের দু'জনেরই ম্যাথ থ্রীতে ব্যাকলগ। সঞ্চিতের বন্ধু লাভ সব সাবজেক্ট-এ পাশ। সঞ্চিত ঠিক করল লাভের কাছে টিউশন নেবে। কথা না বলার প্রতিজ্ঞা ভেঙে সে আমাকে জিজ্ঞেস করল আমি লাভ-এর কাছে টিউশন নিতে ইচ্ছুক কিনা। অসম্মতি দেখাইনি। সে আমায় লাভ-এর ফোন নম্বর দিল। ওকে কল করে জিজ্ঞেস করলাম, ''ফ্রীতে শেখাবি?''

''কোন সন্দেহ?''

সন্দেহ তো আছেই। সঞ্চিতের বন্ধু সঞ্চিতের মতই প্রেমের প্রস্তাব দিয়ে বসতেই পারে। আশা রাখতেই পারে আমি সেই প্রস্তাব প্রত্যাখান করব না। সে আমাকে বিনে পয়সায় পড়িয়েছে। বিনে পয়সার অর্থ টাকা সে পেত কিন্তু নেয়নি। মাফ করে দিয়েছে। যতই মাফ করুক ঋণী আমি হয়েই গেলাম তার কাছে। এই ধরণের ঋণ শোধ হয় কৃতজ্ঞতা দেখিয়ে। লাভ-এর ক্ষেত্রে কৃতজ্ঞতা দেখানোর উপায় হল তার প্রেমের প্রস্তাবকে স্বীকার করা। ''লোকের কিছু না কিছু এক্সপেকটেশন থাকে, তাই...''

''থাক পড়তে হবে না,'' রেগে ফোন রেখে দেয় লাভ।

লাভের ক্লাসে কোচিং নেওয়া আমার হল না। কোচিং ছাড়াই সেকেন্ড ইয়ারের ব্যাকলগ টেনে দিলাম। থার্ড ইয়ারের দুটো সেমিস্টারও ক্লিয়ার করলাম। দু'বছর আমাদের মধ্যে কোন কথা হল না। ফাইনাল ইয়ারের শেষ সেমিস্টারের প্রাক্টিক্যালের সময় আমরা সবাই কলেজের ল্যাব-এ টার্ন-এর জন্য বসে ছিলাম। লাভ আমায় বাইরে ডাকল, ''আমাদের মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিংটা দূর করে নিই। আমি খুব হেল্পফুল। কিছু পাওয়ার আশা নিয়ে কাউকে সাহায্য করি না।''

শুরু হল আমাদের মেলামেশা, বুঝে নিলাম আমাদের হ্যাং-আউট চাঁদা তুলেই

হবে।

আজ আমার অনুরাগকে দরকার। একমাত্র অনুরাগই আমার জন্য খরচা করতে পারে। নন-রিফান্ডেবল মানি ওর কাছেই থাকে। ফোন লাগাই ওকে। দু'জনে বেরিয়ে পড়ি।

*****

পরদিন অফিসে গিয়ে সাক্ষীর কাছে একটা নতুন খবর পাই—আমাদের কম্পানির ক্যাবগুলো গিরিধর ট্রান্সপোর্ট নামে চলে।

জিজ্ঞেস করি, ''কেন?''

''আমাদের ম্যানেজারের নাম গিরিধর পামিরেড্ডী। ট্রান্সপোর্ট কম্পানিটা তাঁর।''

গিরিধর নামটা আমি অনেক শুনেছি। পছন্দ নয়। পামিরেড্ডী পদবীটা প্রথম শুনলাম। ওটাও পছন্দ নয়। ম্যানেজারের চেহারাটাও আমার কাছে বিরক্তিকর। লম্বায় টেনেটুনে পাঁচ ছয়। গায়ের রঙ কালো। মাথাভর্তি কালো ঝাঁকড়া চুল। চোখে অধিকতর কালো এবং মোটা ফ্রেমের চশমা। চোখের নিচে মোটা ধাবড়া নাক। নাকের নিচে একগুচ্ছ মোটা কালো গোঁফ।

অফিসে আমার তৃতীয় দিনেই ব্রেকআউট এরিয়াতে টিফিন খেতে খেতে ম্যানেজারের গোঁফকে কেন্দ্র করে সাক্ষী এবং প্রাজক্তার মধ্যে তুমুল ঝগড়া শুনেছিলাম। প্রাজক্তা গলা বড় করে বলেছিল, ''ইংলিশ গোঁফ আমার মামার আছে। আমি ঠিকই জানি—ফিল্ট্রামের জায়গাটাতে ফাঁকা থাকে। মামা ষোলো বছর লন্ডনে ছিলেন। উনি ইংলিশ গোঁফ রাখতেই অভ্যস্ত হয়ে গেছেন।''

তর্কের মাঝে সাক্ষীকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ''ফিল্ট্রাম কি জিনিস?''

''আরে, উপরের ঠোঁটের মাঝখানে এই লম্বা গর্তটা,'' নিজের ঠোঁটের গর্ত প্রদর্শন করে প্রাজক্তা। সাক্ষীর দিকে ফিরে বলে, ''তুই পেনসিল গোঁফের সঙ্গে ইংলিশ গোঁফ মিশিয়ে ফেলছিস। পেনসিল গোঁফ একদম সোজা হবে, পেনসিলের মত এবং তাতে কোন ফাঁক থাকবে না।''

সাক্ষী আমার সমর্থন পাওয়ার আশায় আমার দিকে তাকায়। ওই দুটো গোঁফের ব্যাপারে কোন জ্ঞান না থাকলেও আমার মনে হয় প্রাজক্তাই ঠিক বলছে। মাঝখানে ফাঁক থাকার অর্থ পেনসিল ভেঙে যাওয়া। আমি বাবার গোঁফের কথা জানি। ওয়ালরাস। ঠোঁটের উপর চুলের ঘন ঝাড় ঠোঁটটিকে পুরো ঢেকে দিয়েছে। মামার শেভ্রন। মামা এবং বাবা বন্ধু ছিলেন। মা বলেন দু'জনেরই আগে ওয়ালরাস গোঁফ ছিল। বিয়ের আগে কিছুদিনের জন্য বাবা তাঁর গোঁফকে চার্লি চ্যাপলিনের টুথব্রাশ গোঁফের রূপ দিয়েছিলেন। বিয়ের পর সেটাকে বাড়িয়ে আবার ওয়ালরাস করেছিলেন। বোনকে বিয়ে করায় মামা রেগে বাবার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন এবং ছিন্ন সম্পর্কের প্রতীক হিসেবে তিনি ওয়ালরাসকে কেটে শেভ্রনের রূপ দেন।

তর্ক করতে করতে গলায় খাবার আটকে গেলে জোর বিষম খেয়েছিল প্রাজক্তা। অভিলাষা তাকে জল খাইয়েছে। আমি মাথায় ধীরে ধীরে চাপড় মেরেছি। কাশি কমলে সে আবার সাক্ষীর বিপক্ষে নেমে পড়েছে, ''তুই এখানেও ভুল করছিস, আমাদের ম্যানেজারের হর্স-শু গোঁফ। ডালাস অনেকটা কাউবয়-এর মত। ওটা থুতনি পর্যন্ত নেমে আসে না।''

সাক্ষী হারার পথে। ''যা-ই বল, ম্যানেজারের গোল প্যাঁচার মত মুখে ওই গোঁফটা একদমই মানায় না।''

ম্যানেজারের চেহারা আমার বিরক্তিকর লাগে তাঁর ভুঁড়ির জন্য। যেদিন আমি ফ্ল্যাট জুতো পরে যাই উনি কোন কারণে সামনে এলেই আমার মনে হয় ওঁর ভুঁড়ির সঙ্গে আমার বুক ঠেকে যাবে। খুব গা ঘেঁষে দাঁড়ান গিরিধর।

গিরিধর এই কম্পানিতে চাকরি করছেন এবং কম্পানির সঙ্গে ব্যবসাও করছেন। কিন্তু কথা হচ্ছে প্যানাসিয়া একেবারে নতুন কম্পানি নয়! হিঞ্জেওয়ারিতে প্যানাসিয়ার টেকনোলজি ডেলিভারি সেন্টারটা চালু হয়েছে দু'হাজার বারো সালে, আজ থেকে আট বছর আগে। সাক্ষীর কথায়, লোকটা আগে প্যানাসিয়ারই অন্য প্রোজেক্ট-এ ছিলেন। সেখানে আমাদের ডেলিভারি-লিডও ছিলেন। এখন ডেলিভারি-লিড এস এ পি প্রোজেক্ট-এ আসায় ম্যানেজারও পেছন পেছন এসেছেন। ডেলিভারি-লিডই ওকে পেছনে টেনেছে। ডেলিভারি-লিড-এর চ্যালা ম্যানেজার।

আরও সাতদিন অতিবাহিত হল, অর্থাৎ আমার জয়েনিং-এর পনেরো দিন। পনেরো দিন বাদেও কম্পানি আমার জন্য কোন ক্যাবের ব্যবস্থা করল না।

আমার দ্বিতীয় সাপ্তাহিক ছুটির পরে মঙ্গলবার সকালে অফিসে পৌঁছতেই একটা নতুন মেয়েকে দেখলাম। সুনইনা। ম্যানেজার আমাকে ডেকে বললেন, ''হঠাৎ করে একজনকে অ্যাপয়েন্ট করা হয়েছে। তুমি ওকে কাজ শেখাও।''

বললাম, ''স্যার, আমার ক্যাব...''

''অ্যাপ্লিকেশন কোথায়?''

''আপনাকে দিয়েছিলাম...।'' আমার শ্বাস রুদ্ধ হওয়ার উপক্রম।

ম্যানেজার টেবিলের উপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখা কাগজগুলো উঠিয়ে খুঁজতে শুরু করলেন।

''স্যার, আমি আপনাকে মেল করে দিয়েছি।''

উত্তর না দিয়ে তিনি টেবিল তোলপাড় করতে থাকেন।

''আপনি মেল-এ খুঁজুন স্যার।''

''আমি জার্মানিতে একটা...।'' গলার আওয়াজ নিচু হতে হতে অফ হয়ে গেল ম্যানেজারের।

লোকটির কাণ্ড দেখে আমি স্তম্ভিত। হৃদপিণ্ডের ধুকপুক বন্ধ হয়ে যাবে মনে

হচ্ছে। উনি আমার মেলটার কথাই ভুলে বসে আছেন। মনে করিয়ে দেওয়ার পর লজ্জা পাওয়া উচিত। তা নয়! টেবিলের জঞ্জালের নিচে অন্য কিছু খুঁজতে বসেছেন! অবহেলার চূড়ান্ত!

'বে'তে সুনইনাকে আমার চেয়ারের পাশে বসতে বলে পাঁচ মিনিটের ব্রেক নিয়ে ব্রেক-আউটে গেলাম। মাকে কল করলাম, "এই চাকরিতে অনেক ঝামেলা হচ্ছে..."

"কি হল আবার?" মায়ের গলা শুকনো।

"আরে, ম্যানেজার এখনও আমার মেল-ই খুলে দেখেনি। জিজ্ঞেস করছে, তুমি কি ক্যাবের জন্য রিকোয়েস্ট লেটার দিয়েছ? অপদার্থ একটা!"

"টেনশন নিও না। নিশ্চয় উনি ভুলের জন্য লজ্জা পেয়েছেন। এবার দেখবেন..."

"না লজ্জা পায়নি। সে তবু মেল চেক করল না।"

"ঠিক আছে, আর কয়েকটা দিন দেখো।"

"আরও কথা আছে।"

"কি?"

"অফিসে একটা নতুন মেয়ে এসেছে। আরও তিনটে মেয়ে থাকতে ম্যানেজার আমার উপর তাকে কাজ শেখানোর চাপ দিচ্ছে।"

"এটাকে চাপ বলে না রিলি। এটা তোমার কাজের অ্যাকনলেজমেন্ট। এত কম সময়ে তুমি নিশ্চয় ভাল কাজ শিখে নিয়েছ, তাই উনি তোমাকে এই দায়িত্ব দিতে পেরেছেন। আমি তোমাকে আরও আট হাজার টাকা পাঠাচ্ছি।"

এক মিনিটেই আমার অ্যাকাউন্টে টাকা পৌঁছে গেল। আট হাজার সংখ্যাটার দিকে তাকিয়ে দেখি আর ভাবি গত এগারো দিনের আট হাজার ছ'শো টাকা বাঁচানো গেল না, ভোর পাঁচটায় অফিসে আসার সময় উবারের ওপর নির্ভরশীল হতেই হবে, কিন্তু যদি কাল থেকে অন্তত বিকেলে আসাটা অন্য কোনভাবে ম্যানেজ করতে পারি তাহলে এই আট হাজার থেকে কিছুটা বাঁচবে। এধরণের অযথা খরচা আমাকে সাপের মত কাটে।

সুনইনাকে আমাদের অর্গানাইজেশন্যাল লেভেল হায়ারার্কি এক্সপ্লেন করলাম, "প্যানাসিয়া ইনফোটেক-এর সবথেকে নিচে থাকে লেভেল তেরো। লেভেল তেরোতে সায়েন্স অথবা কম্পিউটার গ্র্যাজুয়েটদের সাধারণত কন্ট্রাকচুয়াল বেসিস-এ অ্যাপয়েন্ট করা হয়। লেভেল বারোতে অ্যাপয়েন্ট করা হয় সাপোর্টিং ইঞ্জিনিয়ারদের। আমরা হলাম সাপোর্টিং ইঞ্জিনিয়ার। কোন কোন কম্পানিতে সাপোর্টিং ইঞ্জিনিয়ারদের সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাসোসিয়েটও বলা হয়। আমাদের উপরে লেভেল এগারোতে আছে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যানালিস্ট। লেভেল টেন-এ আছে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং সিনিয়র অ্যানালিস্ট। সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং টিমলিড হতে পারা যায় লেভেল নাইন-এ গিয়ে। লেভেল এইট-এ থাকে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাসোসিয়েট ম্যানেজার। লেভেল সেভেন-এ সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং

ম্যানেজার এবং লেভেল সিক্স-এ সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং সিনিয়র ম্যানেজার। লেভেল ফাইভ-এ ডেলিভারি ইউনিট লিড...”

সুনইনা জিজ্ঞেস করল, ‘‘তুই কোন কলেজ থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং করেছিস?”

‘‘ডি ওয়াই পাটিল। শোন, টিকেটিং সফটওয়্যার মার্কেট হল কম্প্রিহেনসিভ সেগমেন্টাল অ্যানালিসিস। প্রোডাক্ট -এর টাইপ, অ্যাপ্লিকেশন এবং কী-রিজন দেখে তাদের আলাদা করতে হয়। আমরা টাইপ এবং কী-রিজন দেখে আলাদা করি। প্রোডাক্ট-এর টাইপ-এর মধ্যে আসছে ফায়ার ওয়াল, লোড ব্যালান্সার এবং রাউটিং অ্যান্ড সুইচিং। কী-রিজন-এর মধ্যে আসছে ইউনাইটেড স্টেটস, ইউরোপ, জাপান, চীন, ইন্ডিয়া, সাউথ-ইস্ট এশিয়া এবং সেন্ট্রাল ও সাউথ আমেরিকা। প্রোডাক্ট-এর টাইপ অ্যানালিসিসে, রিজন অ্যানালিসিসে ভুলভাল হয়ে গেলেই সমস্যা...।”

সুনাইনা বলে,‘‘আচ্ছা। আমি আসলে জার্নালিজম নিয়ে পড়তে চেয়েছিলাম। বাবার ইচ্ছেতে কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে পড়তে হল।”

‘‘এস্কেলেশন হল ক্ল্যায়েন্ট-এর অভিযোগ...।” শব্দটির মানে আমাকে প্রাজক্তা বা সাক্ষী কেউই বলতে চায়নি। আমি জেনেছিলাম যখন প্রাজক্তার এস্কেলেশন এসেছিল। এস্কেলেশন অভিলাষারও এসেছে। এইজন্যই বুঝি ম্যানেজার সুনইনাকে আমার কাছে ট্রেনিং-এর জন্য ছেড়েছেন। ওকে বলি, ‘‘...সাধারণত এস্কেলেশন বলতে আমরা মাঝখানের কোন ধাপ অথবা কোন ব্যক্তিকে ডিঙিয়ে কোন কাজের গতি বা তীব্রতা বৃদ্ধি করাকে বুঝি। অনেকে বলে ‘আই টি’তে শব্দটির মানে বিকৃত করা হয়েছে। ‘আই টি’তে এস্কেলেশন মানে হল ট্রাবল অর্থাৎ সমস্যা বা অসুবিধে। এখানে প্রত্যেক প্রোজেক্টের নিজস্ব এস্কেলেশন মেকানিজম থাকে। অফিসে এক একটি কাজের জন্য এক একটি লেভেল। সেই এক একটি লেভেলে যারা কাজ করে তাদের সবাইকেই মোটামুটিভাবে একই র‍্যাঙ্ক দেওয়া হয়, একই বেতন দেওয়া হয়। তাদের সবাইকেই মোটামুটিভাবে একই ধরণের কাজ করতে হয়। তারা তাদের কাজ সমাপ্ত করে সেই কাজ অন্য লেভেলে পাঠিয়ে দেয় এবং সেই লেভেলের কর্মীদেরও একই ধারায় কাজ সম্পন্ন করতে হয়। এভাবেই প্রোজেক্ট ধাপে ধাপে এগোয়, কাজ সম্পন্ন হয়...”

হয়ত এভাবে শেখানোর প্রয়োজন ছিল না। সাক্ষী আমাকে এভাবে শেখায়নি। কেউ মন খুলে শেখাতে চায় না। সবার মধ্যে কাজ, কথা, বিবাদ, সমঝোতা, সহযোগিতা, অসহযোগিতার অব্যক্ত প্রতিযোগিতা চলছে। কাজ শিখতে শিখতে আমাকে এসব বুঝে নিতে হয়েছে। আমার যা কিছু প্রশ্ন, কৌতূহল যখন যাকে পেরেছি জিজ্ঞেস করেছি, বিভিন্ন উৎস থেকে ছোট ছোট জানাগুলোকে একত্রিত করে জ্ঞান প্রাপ্ত করেছি এবং করছি। তবু আমার মনে হয়েছে মেয়েটিকে বলা দরকার। অথচ মেয়েটির মধ্যে কাজ শেখার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই, কম্পিউটারের স্ক্রিনে কোন

মনোযোগ নেই। সে আমার পাশে বসে অনবরত কথা বলছে। মনে হচ্ছে না অফিসে আজ তার প্রথম দিন। মনে হচ্ছে না আজ আমার সঙ্গে তার প্রথম পরিচয়, প্রথম দেখা, প্রথম কথা। মনেই হয় না সে অফিসে বসে আছে, কোন রেস্তোরাঁতে নয়।

"মাকে বলেছিলাম বি টেক করে আমি আবার জার্নালিজম নিয়ে ব্যাচেলর করব। মা বলেছিলেন আচ্ছা..."

"মন দিয়ে শোন।"

"বল।"

"আমরা আছি নেটওয়ার্কিং-এ। নেটওয়ার্কিং সিস্টেম-এর কাজকে একমাত্র ও এস আই (ওপেন সিস্টেম ইন্টারকানেকশন) মডেল দ্বারাই ব্যাখ্যা করা সম্ভব। 'ও এস আই মডেল'এর সাতটি স্তর বা লেয়ার—ফিজিক্যাল, ডেটা লিঙ্ক, নেটওয়ার্ক, ট্রান্সপোর্ট, সেসন, প্রেজেন্টেশন এবং অ্যাপ্লিকেশন। ফিজিক্যাল লেয়ার-এ ফিজিক্যাল রিসোর্স যেমন কেবলিং, নেটওয়ার্ক হাব, রিপিটার, নেটওয়ার্ক অ্যাডাপটার, মডেম এসে জমা হয়। ডেটা লিঙ্ক লেয়ার ফিজিক্যাল লেয়ারের ভুলভ্রান্তিগুলোকে ঠিক করে। আমরা নেটওয়ার্ক লেয়ারে যাকে লেভেল তিন বলা হচ্ছে। আমাদের কাজ টিকিটের মধ্যে ডিভাইসের লজিক্যাল অ্যাড্রেস, ইন্টারনেট প্রোটোকল দেখে তাকে উপযুক্ত ডেসটিনেশনে পাঠানো। ডেসটিনেশনকে বলা হয় ল্যান্ডস্কেপ। টেকনিক্যাল কাজ শুরু হয় ট্রান্সপোর্ট লেয়ারে। লেভেল টু'র কর্মীরা ট্রান্সপোর্ট লেয়ারে কাজ করে। প্রবলেম সলভ করে তারা ফিক্স করে দেয় টিকিটকে। কেউ একজন ভুল করলে কাজ থেমে যায়। তার প্রভাব প্রোজেক্টে পড়ে। কাস্টমারের মনে, লোকের মনে কম্পানির কার্যক্ষমতা নিয়ে সংশয় দেখা দেয়। তাই ভুলকে এস্কেলেশন বলে। কার দ্বারা ভুল হয়েছে তা বোঝাতে তার নাম ধরে বলতে হয় এস্কেলেশন। বলতে বলতে এটাও ভাবছিলাম, ভুল করছি না তো!..."

"কিন্তু আমার জার্নালিজম নিয়ে পড়া আর হল না। চাকরিতে লেগে গেলাম। আমার দু'বছর নষ্ট হয়েছে। একবার...যখন আমি ক্লাস সেভেনে পড়ি, আরেকটা ফার্স্ট ইয়ারে। ইঞ্জিনিয়ারিং-এর প্রথম বছরটা খুব টাফ গেছে..."

"ল্যান্ডস্লেপ কাকে বলে জানিস?"

"না, তুই বল। আমি গতমাসেই হিঞ্জেওয়ারিতে এসেছি। ভাই বলছিল, আগে গিয়ে দেখ জায়গাটা কেমন লাগে...তুই জানিস আমার একটা ভাই আছে?"

"আচ্ছা, রাউট কাকে বলে বল।"

"বলছি..."

ভাবলাম মেয়েটি এবার লাইনে এল। কিন্তু নাহ্, 'বলছি' বলে সে আগের কথাই টেনে চলল, "ভাই আমার থেকে তিন বছরের ছোট। সে মেডিক্যাল পড়ছে। আমি যেই মেয়েটির সঙ্গে আছি তার নাম অঞ্চলা। সে সাতারারই মেয়ে। জানিস আমার সাতারাতে বাড়ি?"

"জানতাম না, এখন জানলাম।"

"অঞ্চলা আমার ভাইয়ের বন্ধুর দিদি। একবছর আগে সে প্রতীক নামে একটা ছেলের সঙ্গে ফ্ল্যাটটা ভাড়াতে নিয়েছে। প্রতীক কিন্তু ওর বয়ফ্রেন্ড না..."

"তাহলে?" আমার মন ঘুরিয়ে দিল সুনইনা।

"ওরা শুধুই বন্ধু। প্রতীকের গার্লফ্রেন্ড অন্য।" সুনইনা আমাকে জিজ্ঞেস করল, "তুই কার সঙ্গে থাকিস?"

"একা।"

"একা! স্যালারির অর্ধেক তো তোর ভাড়া দিতেই চলে যাবে।"

"আমি আমার বাড়িতে থাকি।"

"তাই বল। কোথায় তোর বাড়ি?"

"বাইশ কিলোমিটার দূরে। আচ্ছা বল, রাউট কাকে বলে।"

"বলছি। অফিসে কিভাবে আসিস?"

"ক্যাব-এ," টাকার দুঃখ আবার আমার মনকে ছেয়ে ফেলল।

"শাটল বাসে কেন আসিস না? সস্তা পড়ত।"

মন চঞ্চল হলেও মেয়েটি অনেক খবর রাখে। আমিই বোকা ওর কাছে। বললাম, "শাটল বাস আমার দু'চোক্ষের বিষ।"

"কেন?"

আগে থেকে না জানা থাকলেও ধারণা পেতে মাত্র এক সেকেন্ড লাগল। "ধ্যুর! ওইভাবে বসে বসে এত লম্বা জার্নি করা যায় নাকি! ওটা অনেক ঘুরে ঘুরে আসে।"

আফিসেই শাটল বাসের অ্যাপ ডাউনলোড করে নিয়েছিলাম। ছুটি হতেই তাতে বুক করে নিলাম একটা সীট। পঁচাশি টাকা নিল। পঁচাশি টাকা আমার জন্য অনেকটা হলেও উবারের ভাড়ার তুলনায় অনেক কম।

একমাস বাদে কম্পানি আমার জন্য ক্যাবের ব্যবস্থা করল। কিন্তু এল অন্য সমস্যা। একমাস বাদে আমার আফটারনুন শিফট শুরু হল। আফটারনুন করে ক্যাবে ফিরতে ফিরতে রাত বারোটায় ফোন পাই পরদিন মর্নিং-এ যেতে হবে। অর্থাৎ একটায় বাড়িতে পৌঁছে দেড়টায় বিছানায় গিয়ে দুটোয় ঘুমিয়ে আড়াই ঘণ্টা পরে সাড়ে চারটেয় ওঠো। দু'দিন মর্নিং চলে। মর্নিং-এর দ্বিতীয় দিনে ক্যাবে ফিরতে ফিরতে বিকেল সাড়ে চারটেয় ফোন পাই সেদিনই নাইটে যেতে হবে বলে। সন্ধে সাড়ে পাঁচটায় বাড়িতে পৌঁছে আবার সাড়ে ন'টায় অফিসের জন্য বেরোনো। লোকা খুব

বাজে রোস্টার তৈরি করছে। অনেক মেয়েরই ডিউটির সময় পাল্টে যাচ্ছে। কিন্তু আমি দূরে থাকায় আমার অতিরিক্ত আরেকটি সমস্যা হচ্ছে। অফিসে যাওয়ার জন্য চার ঘণ্টা আগে এবং অফিস থেকে ফেরার জন্য দুই ঘণ্টা আগে ক্যাব ম্যানেজমেন্ট সাইটে এমপ্লয়ী'জ আইডি দিয়ে অ্যাড-হক রেজ করতে হয়। অনেকবারই অ্যাড-হক রেজ-এর জন্য চার ঘণ্টা সময় আমার হাতে থাকছে না। ফলে ক্যাবও আসছে না। ঘুরে-ফিরে আমাকে সেই উবারই ভাড়া করতে হচ্ছে। টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে হু হু করে। বাড়ি ফিরেও শান্তি নেই। স্নানে যাবো বলে বাথরুমের দরজা খুলেছি শুনি ফোন বাজছে, জামাকাপড় খুলে শাওয়ারের নিচে দাঁড়িয়ে ঝিরঝির ঠাণ্ডা জলে শরীরের তৃষ্ণা মেটাচ্ছি—শুনি ফোন বাজছে, রেফ্রিজারেটরে রাখা চিকেন-এর লেগ পিসটা বের করে মাইক্রোওয়েভ ওভেন-এ গরম করতে ঢেলেছি—শুনি ফোন বাজছে। সব ফোন অফিস কলীগদের। সোফায় বসতে গেলে ফোন, টিভির রিমোট হাতে নিতে গেলে ফোন, পেচ্ছাব করতে গেলে ফোন, পায়খানা করতে গেলে ফোন। সন্ধেতে এমনিতেই ঘুম আসতে চায় না। আড়াই তিন ঘণ্টা বাদে উঠতে হবে বলে টেনশন থাকে। তার ওপর ফোনের উৎপাত। কলীগদের কনফিউশনের শেষ নেই।

দু'মাস বাদে যখন আমার নাইট শিফট এল লোকা একমাসে একদিনও আমাকে অন্য শিফট দিল না। সব মেয়েদের সঙ্গেই সে এমন মাতলামি করছে। আমাদের শিফট-মেটও অনবরত পরিবর্তিত হচ্ছে। লোকাকে একশোবার ঠিকঠাক রোস্টার বানাতে বলা হয়েছে। কিন্তু কোন লাভ হয়নি। সে আমাদের মত ফ্রেশার নয়, এখানে জীবনের সর্বপ্রথম চাকরির অভিজ্ঞতা নিতে সে ঢোকেনি। লোকা 'আই টি'তে ছ'বছরের অভিজ্ঞতা নিয়ে ফেলেছে। আগে কোথাও লেভেল টেন করে আমাদের কম্পানিতে টিমলিড হিসেবে জয়েন করেছে এবং তারই অহংকার নিয়ে এখন আমাদের ওপর অত্যাচার চালাচ্ছে। এতগুলো মেয়ের একটিকেও ইম্প্রেস করার ইচ্ছে না রেখে মেয়েদের স্বৈরাচারী বাপের ভূমিকা পালন করছে সে।

অবশেষে লোকার বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে আমার এবং আমার ওভারল্যাপিং শিফটের মোট ছয়জন মেয়ে ম্যানেজারের সামনে হাজির হল। ম্যানেজারকে বলে আরেক বিপত্তি। বোঝার উপায় নেই তিনি আমাদের সমস্যাটা আদৌ বুঝলেন কিনা, বুঝলেও গুরুত্ব দিলেন কিনা। যেহেতু তাঁর কথা এবং মুখের ভাব মেয়েদের থেকে হাজার কিলোমিটার দূরত্ব রেখে চলে আমাদের অপেক্ষা করতে হয় বাস্তবিক তিনি কোন পদক্ষেপ নিচ্ছেন কিনা তা দেখার জন্য। পেরিয়ে যায় মাস। অসহনীয় হয়ে ওঠে আমার চাকরির অভিজ্ঞতা। ভাবি আগের জীবনই ভাল ছিল। ফটোশুট এবং মাঝেমধ্যে জামাকাপড়, ব্যাগ, জুতো এবং খাবারের বিজ্ঞাপন।

শুনেছি অন্য শিফটের মেয়েরাও ম্যানেজারের কাছে লোকার রোস্টার নিয়ে অভিযোগ করেছে। তাদের সঙ্গে প্রোজেক্ট-এক্সপার্ট শচীনও ছিল। অভিযোগ করে

তারাও আমাদেরই মত ফেঁসে আছে। লম্বা অপেক্ষা করতে হচ্ছে। লোকার বিরুদ্ধে আমরা সব মেয়েরা একজোট হলেও আমাদের মধ্যে কখনো মিল, কখনো অমিল। হাসিঠাট্টা, খুনসুটি, টিফিন ভাগাভাগি আমাদের মধ্যে যে হয় না তা নয়। দু'য়েকজন বন্ধুত্বের মাঠে আমার কাছে এসে হাত যে একদমই মেলায়নি তা নয়, কেউ তার ব্যক্তিগত জীবন যে আমার সামনে মেলে ধরেনি তা নয়, আমিও যে কারও সঙ্গে কিছু মুহূর্ত হাসিখুশিতে কাটাইনি তাও নয়, তবু আমার কাউকেই কাছের মনে হয় না। অমিলের কারণেই। মনে হয় প্রত্যেকেই কোন না কোন জায়গাতে নিজের স্বার্থ নিয়ে চলছে। এরা কেউই আমার এবং সায়লির বন্ধুত্বের বেড়াজালের মধ্যে প্রবেশ করতে পারছে না। বেড়াজালের মধ্যে প্রবেশ করার ক্ষমতা রাখে না এরা। এদের সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের সেতুর ওপর দাঁড়িয়ে আছে এক প্রাচীর। সেই প্রাচীর যেনতেনপ্রকারেণ একে অন্যকে পেছনে ফেলে এগিয়ে চলার প্রতিযোগিতা দিয়ে তৈরি। এই প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রকে বলে অফিস পলিটিক্স।

*****

সায়লির সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব প্রাইমেই। প্রাইম বেশিদিন ঢোলে পাটিল রোডে রইল না, জায়গা বদল করে চলে গেল তিন কিলোমিটার দূরে, এম জি রোডে। ক্লাসের সময়ও পাল্টে গেল। সন্ধে সাতটা থেকে রাত সাড়ে ন'টা। সেখানে সায়লি নামে একটি নতুন মেয়েকে আমি ক্লাসে ভর্তি হতে দেখলাম। কথায় কথায় জানলাম সে আমাদের কাছেই ভাড়া বাড়িতে থাকে। তার মা-বাবা এবং একটি দাদা আছে। সে উচ্চমাধ্যমিক কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় থেকে করেছে। মেয়েটি মাল্লু অর্থাৎ মালয়ালি। উচ্চতা পাঁচ তিন, গায়ের রঙ ফর্সা, চেহারা স্লিম, চুল সোজা এবং কোমর পর্যন্ত লম্বা, মুখশ্রী গোল এবং চ্যাপ্টা অথচ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। অনেকের মাঝখানে চোখে পড়ার মত। লোকে আমাকে সুন্দর বলে। আমার মনে হয় আমার সৌন্দর্য সায়লির সৌন্দর্যের কাছে ম্লান। সায়লি তার বাবার সঙ্গে বাসে করে বাড়ি ফেরে।

অসহিষ্ণুতা এবং ঘৃণার মাঝখানে কৃতজ্ঞতা নামের অনুভূতিটা আমার মনে মায়ের প্রতি অনুকম্পা জাগায়। ভাবি সায়লির পরিবারে অনেক কাজ তার মা এবং বাবার মধ্যে বিভক্ত হয়ে গেছে, বিভক্ত হয়ে গেছে বলেই ওর মাকে আমার মায়ের মত বাড়ির বাইরে মেয়ে নিয়ে দৌড়দৌড়ি করতে হয় না, সায়লির মা হয়ত একা একা বাড়ির বাইরে চলাফেরা করারই সাহস রাখেন না, এদিকে আমি আমার বাড়ির একজন সাহসী, আত্মনির্ভরশীল এবং শক্ত ব্যক্তিত্বের মহিলার মাথা তাঁর স্নেহ এবং দুর্বলতার কাছে অবনত করে রেখে দিয়েছি—এটা অন্যায়। মায়ের ধৈর্য্য, সহ্যক্ষমতা আমাকে তাঁর প্রতি দুর্বল করে দেয়। মনে তাঁর বোঝা হাল্কা করার ইচ্ছে জাগে। তাঁকে বলি, "রাতে সায়লি এবং ওর বাবার সঙ্গে ফিরব, তোমাকে এত দূরে আসতে হবে না।"

আমি ফেরার পথে সায়লির সঙ্গে একই বাসে চড়ি। বিশ্রান্তওয়ারির একই বাসস্ট্যান্ডে নেমে রাস্তা পার হই। তারপর সায়লি ও তার বাবা আমাদেরই বাড়ির রাস্তায় হাঁটতে থাকেন। মা আমাকে তাঁর স্কুটারে বসিয়ে নেন। সুতরাং মা এম জি রোডে গিয়ে আমাকে বাড়িতে নিয়ে আসার দায়িত্ব থেকে মুক্ত হন।

আমি জানতাম মেয়েটি লাজুক। মা মনে করতেন অহংকারী। ক্লাসের শুরু থেকে শুরু করে বিশ্রান্তওয়ারির বাসস্ট্যান্ডে রাস্তা পার করা পর্যন্ত লম্বা সময়টাতে আমাদের মধ্যে বেশি কথাবার্তা হয় না। আমি ওর সঙ্গে অনেক বকবক করার চেষ্টা করেছি। বকবক করতে গিয়ে দেখেছি আমার কথা লম্বা হয়েছে, তার সংক্ষিপ্ত। ওকে অনেক হাসানোর চেষ্টা করে দেখেছি আমার হাসি অকারণে অট্টহাসিতে পরিণত হয়েছে, সে থেমে গেছে একটা মুচকি হাসি দিয়ে। ওর কাছে অনেককিছু জানতে চেয়ে দেখেছি আমার প্রশ্ন বড়, তার উত্তর এক অক্ষরের 'হ্যাঁ' অথবা 'না'তে।

সায়লির বন্ধুত্ব লাভের আশায় আমি ওর সঙ্গে আরেকটু বেশি সময় কাটাতে চাইলাম। মাকে বললাম, ''রাতে আমাকে বাসস্ট্যান্ড থেকে পিক-আপ করতে হবে না। আমি সায়লির সঙ্গে হেঁটে চলে আসব।''

তবু আমাদের বন্ধুত্ব গভীরতার দিকে এগোল না। একদিন বিকেলবেলা মা এবং আমি আমাদের সোসাইটির কাছেই একটা মুদিখানা থেকে জিনিসপত্র কিনে বেরিয়ে আসতেই সামনের রাস্তায় ওকে একা সাইকেল চালাতে দেখলাম। মা ডাকলেন, ''সায়লি...সায়লি...''

সায়লি দাঁড়ালো। মা জিজ্ঞেস করলেন, ''কোথায় থাকো তুমি?''

''এই তো এদিকে।'' পেছনের দিকটাকে হাত দিয়ে দেখিয়ে দিল সে।

''বাহ্। মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ি চলে আসতে পারো তো!'' মাও চান সে আমার বন্ধু হোক। আমরা একত্রে বসে পড়াশোনা করি।

সায়লি মুচকি হাসে, ''ঠিক আছে।''

আমি মোটামুটি নিশ্চিত ছিলাম যে সায়লি শুধু বলার জন্য বলেছে। কিন্তু পরদিনই সে আমাদের বাড়ি এল। তারপরে আরও কয়েকদিন এল। সে আমাকে তার বাড়িতে যেতে বলল। এইভাবে ধীরে ধীরে আমরা এক অন্যের ঘনিষ্ঠ হতে থাকলাম। ঘনিষ্ঠ হলেও মায়ের চাওয়ামত একসঙ্গে লেখাপড়ার চর্চা আমাদের মধ্যে তৈরি হল না।

আমি 'আই আই টি'র এন্ট্রান্স পরীক্ষায় ফেল করলাম। সায়লিও ফেল করল। মহারাষ্ট্র বোর্ডের উচ্চমাধ্যমিকের রেজাল্ট খারাপ হল আমার। সায়লির সি বি এস ই বোর্ড। তারও রেজাল্ট খারাপ হল।

মা আমাকে ব্যাঙ্গালোর, হায়দ্রাবাদ এবং কলকাতায় স্টেট-এর জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিতে নিয়ে গেলেন। প্রত্যেকটি পরীক্ষাতেই অনেক নিচের দিকে আমার র‍্যাঙ্ক। মা বললেন, ''একবছর ড্রপ নাও। মন দিয়ে 'আই আই টি'র প্রস্তুতি করো।'' আমি রাজি হলাম।

সায়লিও আমার দেখাদেখি ড্রপ নিল। ড্রপের বছরে আমি প্রাইমে আরও অনুপস্থিত রইলাম। কি কারণে জানি না সায়লিও তাই করল। দু'জনেই আবার ফেল করলাম।

পরস্পরের প্রতি এত মিল রেখেও ইঞ্জিনিয়ারিং-এ আমরা আলাদা কলেজে ভর্তি হলাম। আমার কলেজ ডি ওয়াই পাটিল, পিম্পড়িতে। সায়লির কলেজ 'জে এস পি এম এস, ওয়াগলিতে। দুটো কলেজ শহরের দুই প্রান্তে। আমাদের স্ট্রিমও আলাদা। আমার কম্পিউটার সায়েন্স। সায়লির মেকানিক্যাল। তবু তার সঙ্গে আমার যোগাযোগ অব্যহত রইল।

সায়লি আসলে 'ই এন টি সি'তে ভর্তি হয়েছিল। কলেজে তাদের ছয় জনের একটি গ্রুপ ছিল। তারা একসঙ্গে আড্ডা দেয়, টিফিন খায়, ঘুরতে যায়, ট্রেকিং করে এবং সিনেমাতেও যায়। গ্রুপে অক্ষয় নামে মেকানিক্যালের একটি ছেলে ছিল। সে সায়লিকে নিয়ে সবসময় মজা করে। সায়লি অস্থির অক্ষয়কে নিয়ে। আমায় জিজ্ঞেস করে, "কি করি বল। আমাদের কলেজে কোন ইউনিফর্ম নেই। চুড়িদার পরে গেলে অক্ষয় বলে, চুড়িদার পরে কেন এসেছিস? জিনস পরে গেলে বলে, জিনস পরে কেন এসেছিস? লং স্কার্ট পরে গেলে বলে, লং স্কার্ট পরে কেন এসেছিস? শাড়ি পরে গেলে বলে, শাড়ি পরে কেন এসেছিস?"

"অক্ষয় আসলে তোকে কিছু না পরে দেখতে চায়।"

"মার খাবি।"

"সে তোর প্রেমে পড়ে গেছে।"

একদিন অক্ষয় সত্যি সত্যিই সায়লির কাছে প্রেম জাহির করে বসল। সায়লিও রাজি হল। প্রেমিকা হিসেবে পেয়ে সায়লিকে সব পোশাকেই পছন্দ করল অক্ষয়। বলল,

—তোকে চুড়িদারটা বেশ মানিয়েছে।

—জিনসটা বেশ মানিয়েছে।

—লং স্কার্টে দারুণ লাগছে তোকে দেখতে।

—শাড়িতে দারুণ লাগছে তোকে দেখতে।

সায়লি বলল, "তাহলে আগে ওভাবে বলতিস কেন?"

"তোকে দেখে স্থির থাকতে পারতাম না, তাই।"

সায়লি ও অক্ষয়ের চার বছরের প্রেমের অধ্যায়ে আমি দেখেছি সায়লি সেকেন্ড ইয়ারে স্ট্রিম পরিবর্তন করে মেকানিক্যালে গেছে, সে প্রতিদিন লেখাপড়ায় মনোযোগ দিয়েছে কিন্তু অক্ষয় কেবল উড়ো উড়ো ঘুরে বেড়িয়েছে। সায়লি প্রত্যেক সেমিস্টারের আগে গ্রুপে ছেলেমেয়ে নির্বিশেষে সবাইকে পড়িয়েছে, ছেলেদের মধ্যে অবশ্যই অক্ষয়ও ছিল কিন্তু অন্য ছেলে থাকাতে সে সায়লির কাছে বারবার অভিযোগ করেছে 'ওদের বেশি মন দিয়ে পড়াচ্ছিস' বলে এবং শেষপর্যন্ত দেখা গেছে পরীক্ষায় সায়লির চেয়ে উড়ো অক্ষয়ই বেশি নম্বর পেয়েছে। সায়লি ফার্স্ট ক্লাস পেলে অক্ষয় পেয়েছে

ডিসটিংকশন। অক্ষয় চন্ডীগড়ের ছেলে। বাবা আর্মি অফিসার। পুনেতে পোস্টিং ছিল। বাবার সঙ্গে সে খাড়াডিতে থাকত। মা দিদিকে নিয়ে চন্ডীগড়ে। অক্ষয় প্রতিদিন সায়লিকে বাড়ির কাছে একটি গলিতে ছেড়ে দিত। দু'জনেই প্রেমের ব্যাপার মা-বাবার কাছে গোপন রেখেছিল। গোপন রেখেছিল বলেই একবার যখন দাদার বাইকে বসে সায়লির অ্যাক্সিডেন্ট হল, থেবড়ে গেল ওর মুখ, নড়ে গেল কয়েকটি দাঁত অক্ষয় একবারও দেখতে এল না। মানে ভয়ে আসতে পারল না। শুধু ফোনে ফোনে খবর নিল।

প্রথম দিন সায়লি এবং অক্ষয় দু'জনই একা হ্যাং-আউট করতে লজ্জা পেয়েছিল। তাই অক্ষয় তার একটি ছেলে বন্ধুকে সঙ্গে নিয়েছিল। সায়লি সঙ্গে নিয়েছিল আমাকে। অক্ষয়ের বন্ধুটির গায়ের রঙ নিগ্রোদের মত চকচকে কালো। চোখে সে বেমানান নীল রঙের লেন্স পরেছিল। আমি সায়লির কানে ফিসফিস করেছিলাম, "অক্ষয় এই সস্তামার্কা মালটাকে কোত্থেকে জোটাল রে?" সায়লি অক্ষয়কে একই প্রশ্ন করল। সেই প্রশ্ন বন্ধু শুনল। ওদের দ্বিতীয় দিনের হ্যাং-আউটে আমাদের মুভি দেখতে যাওয়ার কথা ছিল। দেখলাম অক্ষয় বাহন ছাড়া। সেদিন সায়লি এবং অক্ষয় গায়ে গায়ে সেঁটে গিয়ে হাঁটছিল। আমি হাঁটছিলাম পেছন পেছন। হাঁটতে হাঁটতে আমি সেদিন মনে মনে এমন একটা অটোরিকশা কল্পনা করেছিলাম যার সামনে দুটো চাকা, পেছনে একটি। নিজেকে সেই পেছনের চাকা মনে হচ্ছিল।

ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ফাইনাল পরীক্ষা দিয়ে অক্ষয় চন্ডীগড়ে গেল। মা-বাবা চেয়েছিলেন সে ওখানেই বছরখানেক প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজেস-কোর্স করুক, ওখানেই চাকরি করুক। অক্ষয় সায়লিকে ভালই বেসেছিল। আমার বিশ্বাস অক্ষয় চাকরি পেয়ে বেশিদিন অপেক্ষা করত না। যেভাবেই হোক বিয়ের ব্যবস্থা করতই। কিন্তু সায়লি পাল্টে গেল। আট মাস ধরে নানা জায়গায় ইন্টারভিউ দিয়ে সে চাকরি পেল 'প্যারামাউন্ট টেকনোলজিস ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড'এ। কোচিতে তিন মাসের ট্রেনিং। সেই গ্রুপে তাকে নিয়ে তিনটে মেয়ে, সতেরোটি ছেলে। বাকি দুটো মেয়ের একটি টিংটিঙে লম্বা, একটি মোটা ও বেঁটে। সায়লির দিকে সবার নজর। যারা ট্রেনিং দেয় তাদের মধ্যে ব্যাঙ্গালোর থেকে আসা একটি ছেলেও ছিল। শিব। সে এক বছরের সিনিয়র। ক্লাসে সায়লির দিকে প্রায়ই তাকাত, সায়লি ক্লাসের বাইরে বন্ধুদের সঙ্গে কোথাও দাঁড়িয়ে থাকলে সেখান দিয়ে কোন না কোন বাহানায় প্রায়ই হেঁটে যেত। কিছু বলব বলব ভাব কিন্তু কিছু বলে না। আসলে অন্যের সামনে বলতে পারে না। সায়লিও সব বুঝেও যেন কিছু বোঝে না। অথচ তার চোখে এক পলকের দৃষ্টি ফেলে বুঝিয়ে দেয়, 'তোমার মুখ থেকে ভালবাসার কথা শোনার জন্য আমি উদগ্রীব। হয়ত সঙ্গে সঙ্গে আমি তোমাকে মুখে ভালবাসি বলে স্বীকার করে নেব না, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনেক কথা বলব, অনেক নাটক করব...তবু...তবু তাকে এক প্রকারের স্বীকৃতি বলেই জেনো।"

ট্রেনিংশেষে ব্যাঙ্গালোরে যাওয়ার আগে শিব ক্লাসের সবাইকে প্রকৃতপক্ষে সায়লির ফোন বা মেসেজ পাবে বলেই তার ফোন নম্বর দিল।

সায়লি একদিন আমাকে বলল, ''ভাবছি অক্ষয়ের সঙ্গে সম্পর্ক কেটে দেব। সে হরিয়ানার ছেলে। আমাদের মাতৃভাষা মিলছে না। মা-বাবা ঘোর আপত্তি করবেন। এই ছেলেটি মাল্লু।'' আমার মনে পড়ল একদিন সায়লি এবং আমি চেতন ভগতের কাহিনী অবলম্বনে তৈরি মুভি 'টু স্টেটস' দেখতে গিয়েছিলাম। মুভি দেখে সায়লি বলেছিল, ''আমাকে অক্ষয়ের জন্য এমনই লড়াই করতে হবে।'' আজ মাল্লুকে পেয়ে সে সেই লড়াই-এর ঝামেলা থেকে মুক্তি পেতে চায়।

সেই রাতেই অক্ষয়কে সে মেসেজ করে, ''আমাদের সম্পর্কের কোন ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছি না। সুতরাং আমি তোর থেকে আলাদা হয়ে যেতে চাইছি।''

মেসেজ পেয়ে অক্ষয় খুব আহত। সঙ্গে সঙ্গে সে সায়লিকে ফোন করে, ''তুই আমার সঙ্গে এমন করতে পারিস না। হোয়াট দ্য হেল! আমার সঙ্গে এমন করতে পারিস না তুই। তুই আমাকে ধোঁকা দিতে পারিস না।''

সায়লি চুপ। অক্ষয় কাঁদে, সায়লিও কাঁদে। অক্ষয় চিৎকার করে কাঁদে, ''তুই আমাকে ধোঁকা দিতে পারিস না সায়লি।'' সায়লি ফুস ফুস করে কাঁদে, ভাবে কি করি আমি! কষ্ট হলেও আমার আর ইচ্ছে করছে না। তার 'না' 'না'ই থাকে।

সায়লি প্রথম পোস্টিং-এ ব্যাঙ্গালোরেই গেল। ট্রেনিং-এর তিনমাস তাকে কনসলিডেটেড স্যালারি দেওয়া হয়েছিল। ব্যাঙ্গালোরে পোস্টিং-এর একমাস পরে সে আমাকে ফোন করে জানালো, ''আজ আমি প্রথমবার পে-স্কেল ধরে স্যালারি পেলাম।''

নিঃসন্দেহে খুশির খবর। আমি উৎসুক ছিলাম মাল্লু শিবের খবর জানতে। জিজ্ঞেস করলাম, ''কেমন দেখতে রে সে?''

''দাঁড়া ফটো পাঠাচ্ছি।''

''কি খবর তার?''

''জানি না।''

''যোগাযোগ করিসনি?''

''না রে। ফোন করতে ভয় করছে।''

''ভয় লাগার কি আছে!''

''কি বলবে কি জানি...''

''তাহলে মেসেজ কর। বেচারা তোর ফোন, মেসেজের অপেক্ষা করছে। ওর কাছে তোর নম্বর থাকলে সে-ই প্রথমে যোগাযোগ করত দেখতিস।''

''আমারও তাই মনে হচ্ছে। দেখি...মেসেজই করব।''

এক সপ্তাহ পরে জিজ্ঞেস করি, ''করলি মেসেজ?''

''না রে,'' নাক কুঁচকিয়ে উত্তর।

"কেন?"

"বুঝতে পারছি না কি লিখব।"

"কাজের ব্যাপারেই কিছু জানতে চেয়ে লেখ।"

"ঠিক বলেছিস...এমনই কিছু লিখতে হবে।"

আবার এক সপ্তাহ বাদে জিজ্ঞেস করি, "করলি?"

"না, করব।"

মাল্লুকে মেসেজ করে ওঠার আগেই কিছুদিন বেজোড় দিশাহীন ঘুরে বেড়িয়ে একদিন ব্যাঙ্গালোরের রাস্তায় সায়লি বিষ্ণুর দেখা পেল। বিষ্ণু হল আরেক মাল্লু।

*****

ভালবাসার অনেক রকম থাকে। বন্ধুত্বের ভালবাসা, পারিবারিক ভালবাসা, প্রণয়মূলক ভালবাসা। প্রণয়মূলক ভালবাসার ক্ষেত্রে গিয়ে অনেকেই বুঝে উঠতে পারে না নিজের মনে যা চলছে তা প্রকৃত ভালবাসা নাকি মোহ যাকে বলা হয় পাপ্পিলাভ। পাপ্পিলাভ সাধারণত অতি অল্প বয়সের ছেলেমেয়েদের মধ্যে দেখা যায়। অতি অল্প বয়স বলতে যখন তারা ইন্টারমিডিয়েট অথবা হাইস্কুলে পড়ে। কখনো কখনো প্রাইমারি স্কুলের বাচ্চারাও, যারা নিজের স্নান, প্রস্রাব, পায়খানা, খাওয়া ইত্যাদি দৈনন্দিন কাজগুলোর ক্ষেত্রে পর্যন্ত স্বনির্ভর নয় পাপ্পিলাভের শিকার হয়। এটাকে শিকার হওয়াই বলতে হবে কারণ মা-বাবারা তাঁদের বাচ্চার পাপ্পিলাভের কথা জানতে পারলে খুব চিন্তিত হয়ে পড়েন। বাচ্চা লেখাপড়া করতে চায় না, তারা বোঝেই না লেখাপড়া ছাড়া কোন ভবিষ্যৎ নেই যেমন বোঝে না এমন ভালবাসারও কোন ভবিষ্যৎ নেই। ভবিষ্যৎ শব্দটাই তাদের কাছে চেনা হয়েও একবারেই অচেনা।

এমন ভালবাসাকে অনেকে ইনফ্যাচুয়েশন বলে। যারা ইনফ্যাচুয়েশন বলতে চায় না তারা বলে প্রথম ভালবাসা। আমি অবশ্য প্রথম ভালবাসার আরও কয়েকটি সমার্থক শব্দ বা শব্দাবলী খুঁজে পেয়েছি। সেগুলো হল ডন অফ লাভ, ক্রাশ, কাফ-লাভ, ইয়ং-লাভ।

'ডন অফ লাভ'এ ডন-এর বানান হল ডি এ ডবলু এন। অর্থ হল ঊষাকাল, প্রাতঃকাল, প্রথম প্রভাত, প্রত্যুষ অথবা ভোর। কিন্তু দেখা যায় 'ডন অফ লাভ'এ বিশেষত ছেলেরা মেয়েদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হলে ডি ও এন ডন হয়ে যায়। তারা ভয়ানক এমন কোন পদক্ষেপ নিয়ে ফেলে যা তাদের নিজেদের অথবা মেয়েগুলোর জন্য প্রাণঘাতী হয়।

আমি যখন প্রাইমে যেতাম বৃহস্পতি নামের একটি ছেলে আমার প্রতি 'ডন অফ লাভ'-এর কবলে পড়ে ডি ও এন ডন হতে চলেছিল বলে মা মনে করেন। প্রাইমে ক্লাসের প্রয়োজনেই আমরা মোবাইল নম্বরের আদানপ্রদান করেছিলাম। বৃহস্পতি আমাকে তার নিজের প্রয়োজনে অনবরত ফোন এবং মেসেজ করত। আমি বিরক্ত

হতাম, মানা করতাম, সে শুনত না। সে ধনোরিতে থাকত। ক্লাসে যাওয়ার সময় অটোতে বিশ্রান্তওয়ারি এসে তাকে বাস নিতে হত। বাড়ি ফেরার সময় বিশ্রান্তওয়ারি স্টপে নেমে বাস নইলে অটো নিতে হত। ক্লাসে যাওয়ার সময় আমাদের দেখা হত না। ফেরার সময় সায়লি আমার সঙ্গে থাকলে সে দূর থেকে আমাকে অনুসরণ করত। কখনো সায়লির অনুপস্থিতিতে আমাকে একা দেখে সে জোর করে আমার সঙ্গ নিত। বলত, ''তোকে আমার ভাল লাগে।'' মা'র কাছে আমি বৃহস্পতির ব্যাপারটা গোপন রেখেছিলাম, ভেবেছিলাম নিজেই সামলে নেব। কিন্তু সায়লি একদিন মাকে বলে দিল। মা পরদিনই এম জি রোডে গেলেন। ক্লাসের পরে রাস্তায় নেমে এলে বৃহস্পতিকে ধমক দিলেন। ধমক খেয়ে প্রতিক্রিয়া খারাপ হতে পারে ভেবে ধমকের মধ্যেই মা তার নিজের কাল্পনিক সাংবাদিক পরিচয়টা উল্লেখ করতে ভুললেন না।

অনেক সময় পাপ্পিলাভের ছায়াতলেই ছেলেমেয়েরা বেড়ে ওঠে, চাকরি পায়, বিয়েও হয়ে যায় তাদের। অনেক ক্ষেত্রে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে একবারে হারিয়ে যায় সেই ভালবাসা। অনেক ক্ষেত্রে হারিয়ে গিয়ে কয়েক বছর বাদে আবার উদয় হয়। পাঁচ বছর হয়ে গেছে, বৃহস্পতি আমার জীবনে আর শুক্র, শনি, রবি অথবা সোম, মঙ্গল, বুধ কোন নামেই বা কোন চেহারাতেই ফিরে আসেনি। কিন্তু পৃথিবীকে গোল প্রমাণ করে বিষ্ণু আরেকবার সায়লির সামনে এসে দাঁড়ালো। বলল, ''তোকে আমার এখনও...।''

''এখনও কি?''

''এখনও...'' হাসে বিষ্ণু।

সায়লি মানে বুঝে নেয়।

তারা দু'জনে পুনের কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে নবম এবং দশম শ্রেণিতে একসঙ্গে পড়েছে। তখন কারও কাছে মোবাইল ছিল না। চিঠি চালাচালি হয়েছিল। বিষ্ণু সায়লিকে 'আই লাইক ইউ' লিখেছিল। সায়লিও বিষ্ণুকে 'আই লাইক ইউ টু' লিখেছে। বিষ্ণু তারপরে একধাপ এগিয়ে এসে আরও ছোটবেলা থেকে জমা করা সমস্ত মূলধন দিয়ে দু'হাতে রক্ত রঙের হৃদয় ধরে থাকা একটা টেডি কিনে সায়লিকে উপহার দিল। হৃদয়ের উপর লেখা 'আই লাভ ইউ'। সেটা পেয়ে সায়লি অনেক ধাপ পিছিয়ে গেল। লিখল, ভবিষ্যতে আমরা দু'জন কত দূরে আলাদা আলাদা জায়গায় গিয়ে দাঁড়াবো তার কোন ঠিক নেই। সুতরাং এখন আমাদের কথাবার্তা বন্ধ রাখা উচিত। কথাবার্তা এবং যোগাযোগ এমনই বন্ধ রইল যে মাঝখানের বছরগুলোতে কে কোথায় থেকেছে, কে কি করেছে কেউ তার খোঁজ রাখেনি। এখন আবার নতুন করে খোঁজ রাখতে শুরু করল। বিষ্ণুও ইঞ্জিনিয়ারং করেছে। ব্যাঙ্গালোরেই একটা সফটওয়্যার কম্পানিতে কাজ করছে। সায়লি ভাবল, এতদিন হয়ত বিষ্ণু আসবে বলেই সে শিবকে মেসেজ করে উঠতে পারেনি। শিব এবং

বিষ্ণুর তুলনা করল সে।

—শিব মাল্লু, বিষ্ণুও মাল্লু। সুতরাং দু'জনেরই সমান পয়েন্ট।

—শিব ওকে পছন্দ করে, বিষ্ণুও ওকে পছন্দ করে। দু'জনেরই সমান পয়েন্ট।

—শিবকে সে মাত্র কয়েকদিন আগে ট্রেনার হিসেবে দেখেছে, বিষ্ণুর সঙ্গে অনেক আগে সে ক্লাসমেট হিসেবে মিশেছে। সুতরাং নিঃসন্দেহে বিষ্ণু এখানে বেশি পয়েন্ট পাবে।

—শিবের সঙ্গে সায়লির ব্যক্তিগতভাবে কোন কথা হয়নি, বিষ্ণুর সঙ্গে হয়েছে। সুতরাং বিষ্ণু এখানেও বেশি পয়েন্ট পাবে।

প্রেমের ব্যাপারে সায়লির ইচ্ছে এবং অলসতা দুটোই আছে। দুটোরই দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সে শিবকে মেসেজ করার কথা মন থেকে মুছে ফেলল এবং বিষ্ণুর সামনে 'হ্যাঁ'-এর দরজা প্রায় উন্মুক্ত করে দিল।

আই টি কম্পানির অর্গানাইজেশন্যাল লেভেল হায়ারার্কিটা মোটামুটি একইরকম। প্রোজেক্ট লেভেল শুরু হয় ওয়ান থেকে—ওয়ান, টু, থ্রী, ফোর এমন। সায়লিও আমার মত সাপোর্টিং ইঞ্জিনিয়ার। কাজ করছে লেভেল ওয়ানে। তার গ্রস স্যালারি বা সি টি সি বছরে তিন লাখ পঁচিশ হাজার। পি এফ কেটে এবং সাবসিডাইজড মিল বা ফুড কুপনের জন্য টাকা কেটে যে নেট অর্থাৎ টেক-হোম অ্যামাউন্ট অর্থাৎ ইন-হ্যান্ড অ্যামাউন্ট মাসে হাতে আসে তা হল তেইশ হাজার। বিষ্ণুর স্যালারি কত সে জানে না। তবে নিশ্চয় এক লাখ টাকা বেশি হবে। সে পাশ করার সঙ্গে সঙ্গে চাকরি পেয়েছে, এখন লেভেল এগারোতে আছে। বিষ্ণুর সঙ্গে সায়লির কয়েকটি সাপ্তাহিক ছুটি মন্দ কাটেনি। তারা একসঙ্গে ডিনার করতে যেত। প্রথম কয়েকবার বিষ্ণু তাকে খাইয়েছে। কিন্তু পরে ওয়ান ইজ টু ওয়ান শুরু করল। একদিন পে করে অন্যদিন বলে, ''তুই পে কর।''

সায়লি আহত হল, যেমন আমি হয়েছিলাম সঞ্জয়ের ব্যবহারে। সায়লির ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রির পেছনে এডুকেশন লোন আছে। সে যা মাইনে পায় তা থেকে আট হাজার টাকা লোনের ই এম আই ভরতে চলে যায়। দু'জনের সঙ্গে শেয়ার করে হলেও বাড়ি ভাড়া দিতে হয় পাঁচ হাজার। বাকি থাকে দশ হাজার। দশ হাজারে খাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদ, সাজগোজ-ফ্যাশন, ঘোরাফেরা এবং যাবতীয় খরচা। মাসের শেষে সে দেখে এক টাকাও জমা হয়নি।

সায়লি ভেবেছিল এত বছর বাদে বিষ্ণুর পাপ্পিলাভ পরিণত হয়েই ফিরে এসেছে। কিন্তু বাস্তব তা বলছে না। পাপ্পিলাভ করা ছেলেগুলো বোঝে না যে মেয়েরা পকেট

টেনে চলা ছেলেদের পছন্দ করে না। সায়লির শিবকে নিয়ে আবার ভাবনা শুরু হল। আমাকে জিজ্ঞেস করল, ''এতদিন পরে ওকে মেসেজ করা কি ঠিক হবে?''

''নিশ্চয় হবে।''

''যদি এর মধ্যে অন্য কোন মেয়ের প্রেমে পড়ে থাকে?''

''সেই হিসেবেই সে ঠিক করবে তোর মেসেজের উত্তর দেবে কি দেবে না এবং দিলে কি উত্তর দেবে। এটা ওর ওপরই ছেড়ে দে।''

''ঠিক বলেছিস।''

কয়েকদিন পরে জানতে চাইলাম, ''উত্তর পেলি?''

''নারে। আমি তো মেসেজই করিনি।''

রাগই হল। বললাম, ''আমাকে আর তোর মাল্লু শিবকে নিয়ে কিছু বলবি না।''

''ঠিক আছে,'' বড্ড নির্বিকার সে। ''আরে শোন না, গত রবিবারে আমি সাই-এর সঙ্গে ন্যাশনাল পার্ক-এ গিয়েছিলাম...''

''সাই! কোন সাই?''

''আরে তোকে বলেছিলাম না...আমার সঙ্গেই কোচিতে ট্রেনিং করেছিল...''

সায়লির কলেজে ফোর্থ ইয়ারের শেষে ফেয়ারওয়েল উপলক্ষে ড্রেস কেনার জন্য ওর বাবা ওকে দু'হাজার টাকা দিয়েছিলেন। আমরা এম জি রোডে ক্লোভার সেন্টারে গিয়েছিলাম। সায়লি চৌদ্দশো টাকা দিয়ে একটা স্কেটার ড্রেস পছন্দ করেছিল। করেই বলেছিল, ''দরকার নেই।'' আমার মনে হয়নি ড্রেসটা ওকে মানাবে। আমি পছন্দ করেছিলাম মেরুন রঙের এথনিক লং-স্কার্ট। অনেক ঘেরওয়ালা। মাত্র সাড়ে আটশো টাকার। উপরে পরার জন্য বেছেছিলাম একটা লেসের কাজ করা কালো রঙের সী-থ্রু ফুলহাতা টপ যার নিচে থাকবে একটা কালো রঙের স্লিপ। দুটোর জন্য লেগেছে সাড়ে ছ'শো টাকা। কালো রঙের ব্লক হিল জুতো কেনা হয়েছিল সাড়ে পাঁচশো টাকা দিয়ে। আমার স্টিলেটো কেনার ইচ্ছে ছিল। সায়লি রাজি হল না। সে ফ্ল্যাট অর্থাৎ হিল ছাড়া জুতো পরতে অভ্যস্ত। ফ্ল্যাট থেকে অন্তর্বর্তী ব্লক ছেড়ে সোজা স্টিলেটোতে চড়িয়ে দিলে দু'পা চলতেই নির্ঘাৎ পতন হবে। তাই স্লো ট্রানজিশনে যেতে হলে যাকে বলে মন্থর রূপান্তর। ওকে আমি আমার সাড়ে চারশো জোড়া জুতোর সংগ্রহ থেকে এক জোড়া ব্লক হিল জুতো দিতে পারতাম। কিন্তু ওর পা আমার থেকে তিন সাইজ বড়।

ফেয়ারওয়েলের দিন সায়লিকে আমার বাড়িতে ডেকে আমিই সাজিয়ে দিয়েছিলাম। খুব সুন্দর লাগছিল ওকে দেখতে। কলেজের অনেকের কাছ থেকে রূপের তারিফ হাসিল করে ফিরেছিল। তখন আমি নিজেকে মনে মনে বলেছিলাম, ''মিস রিলি, তুমি মোটেও উল্টো অটোর বেজোড় চাকা নও। তুমি হলে কিনা সায়লির প্রাউড মম।''

সেই ড্রেস সায়লি ব্যাঙ্গালোরে নিয়ে গিয়েছিল। অফিসের কোন অনুষ্ঠানে পরেছিল। স্কার্টটাকে দু'হাতে সামলে ধরে সিঁড়ি দিয়ে নামছিল সে। তা দেখে ট্রেনিং-এর ব্যাচের ছেলেটি, সাই যার নাম চোখ বড় করে তাকিয়ে ছিল ওর দিকে।

সাই কোচিতেই সায়লির প্রতি তার প্রণয়াকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছিল। সায়লি সেই প্রণয়াকাঙ্ক্ষাকে ভেবেছিল কৃত্রিম ভালবাসা নিয়ে কাছে আসার বাসনা যাকে বলা হয় ফ্লার্ট। কিন্তু সেদিন সে তার চোখে অন্য কিছুই দেখল।

''তোমাকে দেখতে চমৎকার লাগছে,'' বলল সাই।

''থ্যাংক ইউ,'' বলল সায়লি।

তারপর থেকে সাই-এর সঙ্গে সায়লির নিয়মিত কথা হতে থাকল। ছেলেটি জানে কি করে তার মন জয় করতে হবে। একদিন বলল, ''চলো, রবিবারে বাইকে করে ন্যাশনাল পার্ক ঘুরে আসি।''

সায়লি কোনদিন সাইকে বাইক নিয়ে অফিসে আসতে দেখেনি। তাই জিজ্ঞেস করল, ''তোমার বাইক আছে বুঝি?''

''নেই। আমি আর্লি বাইক বুক করে নেব।''

''সেটা কি?''

''একটা অ্যাপ ডাউনলোড করেছি। সেখানে বাইকের কোড নাম্বার স্ক্যান করে টাকা দিলে বাইক আনলক হয়ে যায়।''

''কোথায় থাকে সেসব বাইক?''

''রাস্তার পাশেই বিশেষ বিশেষ জায়গাতে দাঁড় করানো থাকে। তোমাকে সে নিয়ে ভাবতে হবে না।''

সায়লি সাইয়ের সঙ্গে ন্যাশনাল পার্ক-এ গেল। বেশ আনন্দে ঘুরে ফিরে কাটালো কয়েক ঘণ্টা। ফেরার সময় বাড়ির কাছাকাছি এসে বাইকের চাকা আটকে গেল। আর নড়ে না। সায়লি জিজ্ঞেস করল, ''কি হল?''

''লক হয়ে গেছে।''

''কেন?''

''আমি দু'টো থেকে সাতটা, এই পাঁচ ঘণ্টার জন্য বুক করেছিলাম। এখন জাস্ট সাতটা বাজল। আবার আমাকে এক ঘণ্টার জন্য বুক করতে হবে।''

সায়লির সাইয়ের জন্য একটু কষ্ট হয়, ''এবার আমি পে করছি।''

''না না, তুমি কেন পে করবে?''

সাই নিজের টাকায় বাইক বুক করে সায়লিকে আরও কয়েকটি জায়গায় নিয়ে গেল—লালবাগ বোটানিক্যাল গার্ডেন, ব্যাঙ্গালোর প্যালেস, ব্যাঙ্গালোর ফোর্ট, গভর্নমেন্ট মিউজিয়াম, সেন্ট প্যাট্রিক চার্চ। বাড়ির বাইরে জীবনকে এইভাবে উপভোগ করতে মন্দ লাগছিল না। জীবনকে আরও রঙীন মনে হল যখন সাই তাকে জওহরলাল নেহেরু প্ল্যানেটরিয়ামে নিয়ে গেল। পুনেতে এমন সুন্দর প্ল্যানেটরিয়াম সে দেখেনি।

তারও বাবা আর্মিতে চাকরি করতেন। বাবার শেষ পোস্টিং-এর শহর পুনে। রিটায়ারমেন্টের পরে তিনি পুনেতেই একটি বেসরকারি সংস্থায় চাকরি নেন। সায়লি তখন একদমই ছোট। সে পুনেতেই বড় হয়। ছুটিতে কেরালা যাওয়া ছাড়া এবং ট্রেনিং উপলক্ষ্যে মাত্র তিনমাসের জন্য কোচিতে যাওয়া ছাড়া অন্যান্য কোথাও যাওয়ার সুযোগ আগে তার আসেনি। তাই সে ব্যাঙ্গালোরকে বেশি করে পুনের সঙ্গে তুলনা করে।

ব্যাঙ্গালোর এবং পুনের অনুরূপ আবহাওয়া। দু'টো শহরেই প্রচুর আই টি হাব। দু'টো শহরেই প্রচুর কসমপলিটন লোকের বাস। শিল্পে পুনে ব্যাঙ্গালোরের চেয়ে অনেক এগিয়ে। কিন্তু তাতে তার কি! শিল্প দেখে মনোরঞ্জন হয় না। পুনের আগা খান প্যালেস, পার্বতী হিল, লাল মহল, খড়কওয়াসলা ড্যাম, চতুশৃঙ্গি টেম্পল, আলান্দি টেম্পল, এম্প্রেস গার্ডেন, আপ্পু ঘর দেখে দেখে একঘেয়েমি এসে গেছে। মহাত্মা ফুলে মিউজিয়াম, সারস বাগ, কাত্রাজ জৈন টেম্পল, পাটালেশ্বর কেভ যাওয়া হয়নি। সেগুলোর নাম শুনে শুনেই আগ্রহ শেষ। লোহেগাঁও ডায়মন্ড ওয়াটারপার্কে অনেকবার যাওয়া হয়েছে।

সায়লি সাইয়ের সঙ্গে ব্যাঙ্গালোরের ওয়ান্ডারলা অ্যামিউজমেন্ট পার্কে গিয়ে খুবই আনন্দ পেল। নতুন রোলার কোস্টার এবং ওয়েভ পুলে খুবই মজা করল। সাইয়ের প্রতি তার তারও ভাল লাগা তৈরি হল।

*****

সায়লির প্রেমিক নিয়ে ভিরমি খেয়ে বাড়ানোর দিনগুলোকে অন্য মেয়েদের সঙ্গে আমিও অফিস পলিটিক্সে নেমে পড়েছি। কম্পানির এমপ্লয়ীদের রেজিস্টারে নাম ওঠার অর্থ হল অফিস পলিটিক্সে নেমে পড়া। পলিটিক্সে কেউ সক্রিয় থাকে, কেউ অক্রিয় বা নিষ্ক্রিয়, কেউ আবার দু'টোর মাঝামাঝি জায়গায় অবস্থান করে। স্কুল এবং কলেজ পলিটিক্সে আমি একেবারেই অক্রিয় ছিলাম। একবারেই অজ্ঞ, যেন পলিটিক্স শব্দটার মানেই জানি না। তখন, আমি মনে করি আমি ছোট ছিলাম। স্কুলে থাকাকালীন আমার চারপাশে মা-বাবার আস্তরণ ছিল। আমার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বলে প্রায় কিছুই ছিল না। কলেজে বাবার আস্তরণটা প্রায় সরে গিয়েছিল। সেই ফাঁক দিয়ে ঢুকে পড়েছিল ফিলাডেলফিয়ার সন্দীপ। আমার প্রেমিক হয়ে। তার কাছে আমার স্বাধীন সত্তাটি বাঁধা পড়ে গিয়েছিল। কলেজ পলিটিক্স তাই স্বাধীন সত্তার নাগাল পায়নি। চাকরি না করার কয়েকটা মাস একা ঘরে স্বাদহীন স্বাধীনতা নিয়ে কাটিয়েছি। সেই সময়প্রবাহের শেষের দিকে সঙ্গী হয়েছে বিচ্ছেদ-বিরহ। এখন অফিসে এসে মনে হচ্ছে বাইরের জগতে আমি একবারে উন্মুক্ত। আমার ধারে-পাশে যারা আছে তারা কোনদিনও আমার নিজের হবে না। তাদের সঙ্গে কোন স্থায়ী সম্পর্ক হবে না।

বেদান্তি, অভিলাষা, সুনইনা এবং আমি কয়েক সপ্তাহ একই শিফটে ছিলাম। লোকার করুণায় এখন আমার সঙ্গে কখনো প্রাজক্তা-বেদান্তি আসছে, কখনো কানুপ্রিয়া-প্রাজক্তা আসছে, আবার কখনো উজ্জ্বলা-রুচিরা। এক শিফটে না হলেও ওভারল্যাপিং শিফটের কারণে শিফটের শুরুতে অথবা শেষেও দু'য়েক ঘণ্টার জন্য আমরা একসঙ্গে থাকি। এখানে যেমন সময়ের স্থায়িত্ব নেই, মেয়েদের মধ্যে কথাবার্তা এবং বোঝাপড়াতেও স্থায়িত্ব নেই। অস্থায়ী সম্পর্কের সিঁড়ি বেয়েই আমাকে পার করে দিতে হবে সময়ের ঘণ্টা—দিন, মাস, বছর। এরাও সেই পথ ধরেই হাঁটছে। একমাত্র আমি ছাড়া সবকটি মেয়ে পুনের বাইরের। কেউ ধুলে থেকে এসেছে, কেউ সাংলি থেকে, কেউ সাতারা থেকে, কেউ সোলাপুর, কেউ কোলহাপুর, কেউ জলনা, কেউ আকোলা, কেউ নন্দুরবার, কেউ ওয়াসিম, কেউ অমরাবতী। চাকরির জন্য তারা বাড়ি ছাড়া। কম্পানির কাছে বা দূরে ফ্ল্যাট ভাড়াতে নিয়ে অন্য কোন মেয়ে বা ছেলের সঙ্গে ভাগাভাগি করে থাকে। মেয়ের সঙ্গে ফ্ল্যাট ভাগাভাগি হলে হৃদয় ভাগাভাগির ঝুঁকি কম। কিন্তু ছেলের সঙ্গে হলে অনেক সময়ই হৃদয়কে দু'টুকরো হয়ে যাওয়া থেকে বাঁচানো প্রায় অসাধ্য হয়ে পড়ে। সুনইনার ক্ষেত্রে এমনটাই হয়েছে। ভাঙা হৃদয় নিয়ে ঘুরছে সুনইনা। হিঞ্জেওয়ারিতেই একটা ফ্ল্যাটে আরও দু'জনকে নিয়ে তার অস্থায়ী বাস। দু'জনের একজন মেয়ে অন্যজন ছেলে। ছেলেটির নাম প্রতীক। প্রতীকের প্রতি সুনইনা দুর্বল।

সুনইনার কাজে মন লাগে না। শিফট-এ যতক্ষণ সে আমার পাশের চেয়ারে বসে থাকে, অবলীলায় নিজের প্রেমকাহিনী শোনায়। শুরুতে শুনতে আগ্রহ নিয়েছি। জেনেছি তার প্রেমকাহিনী একতরফা। প্রতীকের একটি প্রেমিকা আছে। সে বোঝে না, বোঝার চেষ্টা করে না সুনইনার মনের কথা, মনের ব্যথা। তবু এক রাতে প্রতীকের সঙ্গে তার কিসব হয়ে যায়। সেই রাতে অঞ্চলা ছিল না। বন্ধুর বাড়ি গিয়েছিল অথবা বন্ধুর ফ্ল্যাটে অথবা বন্ধুর মেসে। অঞ্চলার অনেক বন্ধু, তাই সুনইনা জানে না সে ঠিক কোথায় গিয়েছিল। ফ্ল্যাটে শুধু সুনইনা এবং প্রতীক ছিল। ওরা ড্রিঙ্ক করেছিল। প্রলাপ বকেছিল। সুনইনা বলে প্রতীকই প্রলাপ বকেছে। কিন্তু আমার বিশ্বাস হয় না। আমার মনে হয় সুনইনাই বাড়াবাড়ি করেছিল। কিসিং-ফিসিং হয়েছিল। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, "আর কিছু হয়নি?"

"না।"

"কেন?"

"আমার মা-বাবা জানতে পারলে খুব রেগে যাবেন।"

কয়েকদিন পরে সে আবার আমার কাছে প্রতীকের কথা তোলে। বলে, "গতকালও অঞ্চলা ঘরে ছিল না। আমরা ড্রিঙ্ক করেছিলাম। সে আমাকে জড়িয়ে ধরেছিল। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, "আর কিছু হয়নি?"

"না।"

"কেন?"

"তোকে বলেছিলাম যে মা-বাবা জানতে পারলে খুব রেগে যাবেন!"

"মা-বাবার রাগের প্রতি যদি এতই শ্রদ্ধা তাহলে চুমুই বা খাস কেন জড়াজড়িই বা করিস কেন?"

"ওইটুকুই করেছি। ওটা এমন কি!"

সেদিন সকালে অফিসে একপ্রস্থ হৈচৈ হয়ে গেছে। বিরক্তির চূড়ান্ত সীমায় গিয়ে ম্যানেজার গলা ফাটিয়েছেন। "কি করে এমন হয়?" এদের মন কোথায় থাকে! কেন এল এস্কেলেশন?"

আমাদের ম্যানেজারের টিকেটিং সফটওয়্যার মার্কেটের কোন জ্ঞান নেই। প্রোডাক্টের টাইপ বোঝেন না, সুতরাং এস্কেলেশনের টাইপ বোঝাও তাঁর সাধ্য নয়। ম্যানেজার শুধু চিৎকার বোঝেন, চিৎকারে সবসময় দু'টো বাক্যই ব্যবহার করেন, 'এটা কি হল?' এবং 'কেমন করে হল?' এই দুটো বাক্য হল তাঁর প্রযুক্তিগত জ্ঞান বিশ্লেষণের পরিভাষা।

"কোথায় সাক্ষী?" চিৎকার করেছেন ম্যানেজার।

অভিলাষা তাঁকে মনে করিয়ে দিয়েছে, স্যার, সে তার বাড়িতে আছে।"

"বাড়িতে কেন?" গত রাত থেকে যে শিফট ডিউটি শুরু হয়েছে ভুলে গেছেন তিনি।

"স্যার, সে নাইট ডিউটি করে বাড়ি গেছে।"

"ওকে ফোন করে বলে দাও কোন সন্দেহ থাকলে যেন প্রোজেক্ট-লেভেল টু'কে জিজ্ঞেস না করে ভুলভাল জায়গায় টিকিট রাউট না করে।"

"টিম-লিডকে বলুন স্যার।"

আমাদের কাজটা পুরোপুরি নন টেকনিক্যাল। টেকনিক্যাল কাজ করে লেভেল এগারো। অনেক অফিসে প্রোজেক্ট-লেভেল ওয়ান-এর পরে লেভেল টু আছে। আবার কোন কোন অফিসে লেভেল ওয়ান এবং লেভেল টু-এর মাঝখানে লেভেল ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ নামে আরেকটি লেভেল আছে। সেখানে টিকিট মনিটরিং-এর এবং প্রবলেম সলভিং-এর কাজ ফিফটি ফিফটি চলে। টাইপ হিসেবে টিকিট শুধু এ, বি, সি এবং ডি-ই থাকে না। এ, বি, সি, ডি-এরও বিভাজন থাকে যেমন এ ডট ওয়ান, এ ডট টু, এ ডট থ্রী, এ ডট ফোর ইত্যাদি। কখনো এমনও সাধারণ টিকিট আসে যেগুলোকে কোনই সাবডিভিশনে ফেলা যায় না। সেগুলোকে লেভেল ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ হ্যান্ডল করে। সুতরাং লেভেল ওয়ান পয়েন্ট ফাইভের কাজটি হল সেমি-টেকনিক্যাল। প্যানাসিয়াতেও ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ আছে। যারা সেই লেভেলে কাজ করছে তারা অন্য কম্পানি থেকে তিন চার বছর লেভেল ওয়ান-এর অভিজ্ঞতা নিয়ে এসেছে।

দুপুর দু'টোয় সুনইনা সেকেন্ড শিফট-এ এসে ব্যাগ রেখে আমার পাশে বসতে বসতে বলেছিল, ''তোর সঙ্গে অনেক কথা আছে।''

বলি, ''একটু দাঁড়া। এই টিকিটটাকে কোথায় পাঠাবো বুঝতে পারছি না। রাউটিং অ্যান্ড সুইচিং-এ মেরে দিই?''

''দে,'' আমার ডান পাশে কম্পিউটারে লগিং করতে করতে কিছুই না ভেবে বলে দেয় সুনইনা। অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছেয়ে ফেলেছে তার মাথাকে। ''ছেলেটি ফর্সা নয় কিন্তু স্লিম। চোখদুটো একেবারে নীল। মেয়েটি বোধ হয় চোখ দেখেই ওর প্রেমে পড়ে গেছে।''

''কোন মেয়েটি?''

''প্রতীকের একটা গার্লফ্রেন্ড আছে বলেছিলাম না!'' সুনইনা বলে, ''ওর গার্লফ্রেন্ড না থাকলে আমি ওকে প্রপোজাল দিতাম।''

''দিলেই সে তোকে অ্যাকসেপ্ট করত?''

''করত। প্রতীক গতকাল আমাকে একটা ছোট গণেশের মূর্তি গিফট করেছে।''

''মূর্তি গিফট করার মানে যে দুর্বল হয়ে যাওয়া তা নয়।''

বাঁ পাশে অভিলাষা। আমার কথা শুনে সে হাসে। অভিলাষা আমার থেকে লম্বায় ছোট, ভারী চেহারার। শ্যামবর্ণা। গোল মুখ। দেখতে চলনসই। কাঁধ পর্যন্ত লম্বা চুল। চুলে ডার্ক ব্রাউন বেস-এ রোজ গোল্ড হাইলাইট। সে কারও সমালোচনায় থাকে না। কেউ তাকে অন্যকে নিয়ে কিছু বলতে এলে না শোনার ভান করে অব্যহত গতিতে কাজ করতে থাকে। বক্তা একটু পরে নিরাশ হয়ে চলে যায়। সে দুঃখ পেলে অভিলাষার কিছু যায় আসে না। আমি অভিলাষার মত হতে চাইছি কিন্তু পারছি না। আমি কাউকে নিয়ে সমালোচনা করি না অথচ কেউ কিছু বলতে এলে অভিলাষার মত চূড়ান্ত উদাসীনতাও দেখাতে পারি না।

অভিলাষা সুনইনাকে বলে, ''ম্যানেজার আজ খুব রেগে আছেন।''

''কি হয়েছে?''

''সাক্ষী ভুল করেছে।''

''ও।''

সাক্ষী ভুল করেছে বলে ম্যানেজারের মেজাজ খারাপ। ভুল আমারও হয়ে যেতে পারে, তার নিজেরও হতে পারে। যারই ভুল হোক না কেন তার জন্য সুনইনাই দায়ী হবে। আমার ভুল হলে আমি নিশ্চয় ওকে ছাড়ব না এ নিয়ে সুনইনার মনে কোন ভয় নেই। সে দিনরাত ছেলে রুমমেটকে কেন্দ্র করে আবর্তন করছে, অফিসে কম্পিউটারের সামনে বসেও স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছে না, ঝরঝর করে অনেক কথা বলছে। আমি নির্বিকারচিত্তে কাজ করছি। শুরুর অনেক কথা কানেই ঢোকে না। মাঝখানের চুমু, জড়িয়ে ধরার কথা শুনি। শেষেরও অনেক কথা কানে ঢোকে না।

সুনইনা আমাকে ধাক্কা দেয়, "বল না।"

"কি বলব?"

"প্রতীককে আমি কি বলব?"

"হয়েছে টা কি?"

"বললাম না প্রতীকের গার্লফ্রেন্ড ওর সঙ্গে বেড শেয়ার করতে চায় না। ও আমাকে জিজ্ঞেস করছে ওর কি করা উচিত। আমি কি পরামর্শ দিতে পারি?"

"আমি জানি না সুনইনা।"

এদের প্রেম-ভালবাসার ধরণ দেখে আশ্চর্য হই। শুধু সুনইনাই নয়, বেদান্তি, প্রাজক্তা, সাক্ষী এবং অভিলাষাও কোন না কোন ছেলের সঙ্গে প্রেমদড়িতে বাঁধা। সবকটি ছেলেই ইঞ্জিনিয়ার। সবকটিই আই টি সেক্টরে কাজ করছে অথবা করার জন্য তৈরি হচ্ছে। প্রেমদড়ির সবকটি গিঁটই আমার কাঁচা মনে হয়। কারণ মা-বাবা, কাকা-কাকী, জেঠা-জেঠী এমনটি শারীরিক দিক থেকে ভেঙে পড়া দাদু-দিদা-ঠাকুমা পর্যন্ত অদৃশ্য রিমোট দিয়ে তাদের নিয়ন্ত্রণ করেন। আমি বাড়িতে থেকে স্বাধীন, এরা বাড়ির বাইরে থেকে পরাধীন।

বেদান্তির প্রেমিক জুটেছে দু'বছর আগে। ছেলেটি তার ভাড়া নেওয়া ফ্ল্যাটের কাছেই থাকে। আমার কাছে সুবিধে করতে না পেরে সুনইনা বেদান্তিকেও তার লাভস্টোরি শোনায়। পরামর্শ চায় তার কাছে, "কি করি আমি?"

বেদান্তি বলে, "বলব কি করবি?"

"বল।"

"ঠিক বলব তো?"

"আরে বল না।"

"রাগিস না কিন্তু?"

"বলেই দেখ।"

"প্রতীককে বল তোর সঙ্গে বেড শেয়ার করতে।"

"প্রতীক আমার সঙ্গে বেড শেয়ার করবে না।" ভালবাসার পাত্রটি অন্য মেয়ের বিছানায় গেলে সুনইনার কোন দুঃখ হয় না, সে তার নিজের বিছানায় না এলেও সুনইনার কোন ক্ষোভ হয় না।

"তাহলে ওর পেছনে পড়ে আছিস কেন?" বেদান্তি আমার কানে-কানে ফিসফিস করে, "উজবুক কোথাকার! দেখলেই গা জ্বালা করে।" সে সুনইনাকে বলে, "প্রেম করতে হলে আমার মত হতে হবে। নাহলে প্রেমিককে আটকে রাখা যাবে না।"

বেদান্তিকেও আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, "তোদের মধ্যে কি ওইসব হয়েছে?"

"অফ কোর্স!"

"কতবার?"

"দুই-তিনবার।"

"ডিড ইউ কাম?"

"হোয়াট ইজ দ্যাট?"

বেদান্তির প্রশ্ন থেকে আমি আমার উত্তর পেয়ে গেছি। অর্গ্যাজম কি জানেই না বেদান্তি। জানলে সেই অনুভূতিটাই তাকে সেকেন্ডে শব্দ কটির মানে বুঝিয়ে দিত।

বেদান্তিকে আমার পরের প্রশ্ন ছিল সে তার মা-বাবাকে তার প্রেমের ব্যাপারে জানিয়েছে কিনা। সে বলেছিল, "না, ভয় করে।"

আমি বলেছিলাম জানানো প্রয়োজন। তারা দু'জনে যত মনের কাছাকাছি আসবে দূরে সরে যাওয়া তত মুশকিল হবে। মুশকিল হতে হতে প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়বে। এমন অসম্ভবকে সম্ভব করার চেষ্টাতে কখনো এমন সময়ও আসে যখন আমরা দেখি প্রেমিক বা প্রেমিকা অথবা দু'জনেই প্রাণ নিয়ে নয়, প্রাণ দিয়ে দূরে সরে যাচ্ছে।

মা আমাকে বা আমার প্রেমিককে দিয়ে এমন মারাত্মক খেলা খেলাতে চান না। মায়ের প্রতি আমার সমস্ত অনুভূতি দিয়ে তৈরি মাকড়সার জালের কেন্দ্রবিন্দুতে এক অবিশ্বাস্য, অটল বোঝাপড়াও রয়েছে। মাকে নিয়ে আমার অর্ধেক পরিবারে অথবা আমাকে নিয়ে মায়ের অর্ধেক পরিবারে আমরা দু'জনই একে অন্যের প্রেমিককে সাদরে গ্রহণ করার সামর্থ্য রাখি, তাকে পরিবারের সদস্য বানিয়ে নিয়ে সুখে দিন অতিবাহিত করার সামর্থ্য রাখি এবং সামর্থ্য রাখি বলেই আমাদের প্রেমিক জাতীয় মানুষটিকে লুকিয়ে রাখার প্রয়োজন হয় না, তার সঙ্গে গোপনে কোন সম্পর্ক করার ইচ্ছে জাগে না। আমাদের কারও জীবনে প্রেমিক জাতীয় মানুষটির আবির্ভাব একটি উল্লেখযোগ্য সংবাদ হয়ে যায় যাকে উভয়েই অবিলম্বে প্রচার করা বিশেষ প্রয়োজন মনে করি। পরে যাচাই করে উপযুক্ত মনে হলে উভয়ের কাছেই সে গ্রহণযোগ্য হবে, উপযুক্ত না মনে হলে উভয়ের কাছেই বর্জনীয় হবে।

আমার পরামর্শ মেনে বেদান্তি বুকের পাটা শক্ত করে তার মাকে বলেছে। মা এটাকে দুঃসংবাদ মেনে তৎক্ষণাৎ বাবার কাছে পৌঁছে দিয়েছে। বাবা তাকে ভয়ানক দুঃসংবাদ হিসেবে বিবেচনা করেছেন। তিনি পঁচিশ বছরের মেয়েকে শাসিয়েছেন, "নিজেকে খুব বড় ভাবছ? এসব করলে তোমার জন্য এই বাড়ির দরজা সবসময়ের জন্য বন্ধ হয়ে যাবে।" তবু বেদান্তি ভেবেছিল ছেলেটির বাড়ি থেকে সমর্থন পেলে বুকের পাটা আরও শক্ত করবে। ছেড়ে দেবে নিজের মা-বাবাকে। পরের মা-বাবাকে নিয়ে কাটিয়ে দেবে সারাজীবন। ছেলেটিকে সে বলেছিল, "তোর বাড়িতে বল।"

"কি বলব?"

"আমাদের প্রেমের কথা।"

"পরে বলব, যখন ছুটিতে বাড়ি যাব।"

"না, এখনই ফোন করে বল।"

"কালকে বলব।"

"না, আজকেই বল।"

"ঠিক আছে, রাতে বলব।"

রাতের পরে বেদান্তি প্রেমিকের আর দেখা পেল না। ছেলেটি নিশ্চয় বেদান্তির মা-বাবার প্রতিক্রিয়া দেখে নিজের মা-বাবাকে বলারই সাহস পায়নি। তল্পিতল্পা নিয়ে অন্য কোথাও পালিয়েছে। বেদান্তি জানে না সে কোথায় গেছে।

বেদান্তির মত চুটকো প্রেম প্রাজক্তারও। তার প্রেমিক আবার মুসলিম। সুদর্শন, ইঞ্জিনিয়ার ছেলে ধর্মের বাধা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্রাজক্তা নিশ্চিত তার এই সম্পর্ক টিকবে না। তবু দু'বছর ধরে সে নিয়মিত তাকে শরীর দিয়ে চলেছে।

বেদান্তির মত চুটকো প্রেম সাক্ষীরও। তাদের প্রেম অনেকটা পুরনো, এগারো ক্লাসে পড়ার সময় তার উৎপত্তি। ছেলেটি কোথরুডে থাকে। কোথরুড হিঞ্জেওয়ারি থেকে অনেকটা দূরে। যদিও ছেলেটি মাঝে মাঝে কোথরুড থেকে সাক্ষীর সঙ্গে রাত্রিযাপন করতে হিঞ্জেওয়ারিতে চলে আসে এবং হিঞ্জেওয়ারি থেকে অফিস করে, যদিও সাক্ষী মাঝে মাঝে হিঞ্জেওয়ারি থেকে ছেলেটির সঙ্গে রাত্রিযাপন করতে কোথরুডে চলে যায় এবং কোথরুড থেকে অফিস করে, বড় দুর্বল তাদের সম্পর্কের দড়ি। এটা মোটামুটি স্থিরীকৃত যে দু'জনই তাদের মা-বাবার দ্বারা নির্বাচিত ছেলে বা মেয়ের সঙ্গে গতানুতিক ধারায় বিয়ে করবে।

প্রেমের ব্যাপারে অভিলাষা পাকা। তার কোন ভাইবোন নেই। ওয়াকর-এ একটি মেয়ের সঙ্গে ফ্ল্যাট ভাড়া করে আছে। তিন বছর ধরে প্রেম করে। ছেলেটির নাম সংকেত। আমি সংকেতকে ফটোতে দেখেছি। সাধারণ মুখশ্রী। লম্বায় ছয় ফুট। পাঁচ ফুটের অভিলাষা ছেলের উচ্চতা দেখে প্রেমে পড়েছে। সেও ওয়াকর-এ থাকে। প্রত্যেকদিন দু'জনার দেখা হয়, প্রত্যেকদিন মিলন। অর্গ্যাজম কি অভিলাষা বোঝে। 'ডিড ইউ কাম?' জিজ্ঞেস করলে বেদান্তির মত 'হোয়াট ইজ দ্যাট?' বলে ভ্যাবাচ্যাকা মুখের প্রদর্শন করে না। পরিবর্তে সে বলে, "মাই থার্ড টাইম ইজ আ চার্ম।" আভিলাষার প্রেমিক অর্গ্যাজম পেলে অভিলাষাকে জিজ্ঞেস করে "ডান?"

অভিলাষা বলে, "নো।"

কিছুক্ষণ পরে আবার সে জিজ্ঞেস করে, "ডান?"

অভিলাষা বলে, "নো।"

আবার কিছুক্ষণ পরে, "ডান?"

"ইয়েস।"

অভিলাষাও মা-বাবাকে তার প্রেমের ব্যাপারে কিছু জানায়নি। এখনো জানানোর প্রয়োজন মনে করছে না। মা-বাবা তার কাছে বিশেষ সমস্যা নয়। সে সংকেতকেই নিয়ে চিন্তিত। চাকরির ব্যাপারে ছেলেটির মতিগতির নাগাল পাওয়া যায় না। বেকার সে। আগেও ছিল, এখনো। শুধু মাঝখানের কয়েকটি মাস চাকরি করেছে। অভিলাষারই দৌলতে। অভিলাষা যখন সংকেতকে জিজ্ঞেস করত, "তুমি আমার থেকে একবছর আগে পাশ করেছ তবু চাকরি কেন করছ না?" সে বলত, "পাচ্ছি

না। আমার বুদ্ধি কম।"

"আমি তোমার বুদ্ধি বাড়িয়ে দেব।"

অভিলাষা কিছুদিন সংকেতের সঙ্গে রাত জেগে পড়াশোনা করে। তার পরেও কয়েকটি ইন্টারভিউ-এ ছাঁটাই হয় সংকেত। অভিলাষা জিজ্ঞেস করেছিল, "এখন কি সমস্যা?"

"সব জায়গাতে এক্সপেরিয়েন্স আছে কিনা জানতে চাইছে? আমি আগে কোথাও কাজ করিনি।"

অভিলাষা একজন পরিচিতকে দিয়ে সংকেতকে মিথ্যে ছয় মাসের এক্সপেরিয়েন্স সার্টিফিকেট জোগাড় করে দিল। তারপরে আরও কয়েকটি ইন্টারভিউ-এ ছাঁটাই-এর দলে নাম লিখিয়ে ফেলল সংকেত। জিজ্ঞেস করল অভিলাষা, "সিলেকশন না হওয়ার জন্য আর কি কারণ বেঁচে রইল?"

"ব্যাকডোর না থাকলে ঢোকা সম্ভব নয়।"

শেষে অভিলাষা আরেকজন পরিচিতকেজোগাড় করে একটা কম্পানিতে ব্যাকডোর দিয়েই সংকেতকে ঢোকালো। মাইনে অভিলাষার থেকে বেশি। সংকেত সেখানে তিন মাস কাজ করে ফ্রন্টডোর দিয়ে বেরিয়ে এল। বলল, "বাবা আমার এই চাকরি পছন্দ করবেন না। আমাকে আরও পড়াশোনা করতে হবে। স্কিল বাড়াতে হবে।"

সংকেত এখন একটা স্কিল ডেভেলপমেন্ট ক্লাসে ভর্তি হয়েছে। ছ'মাসের কোর্স। প্রতিদিন যাচ্ছে। সেখানে একটাই ম্যাডাম এবং একটাই ছাত্র।

আমাদের কোন ইউনিফর্ম নেই। মেয়ে এবং ছেলেদের জন্য অফিস কয়েকটি ফর্মাল ড্রেসকে নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। যেমন মেয়েরা পরবে ট্রাউজার, কালো জিনস, শার্ট অথবা হাঁটু পর্যন্ত লম্বা শিফট-ড্রেস। শিফট-ড্রেস অনেকটা বডিকন ড্রেসের মত। গলা থেকে কোমর পর্যন্ত দুটোর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কোমর থেকে নিচের অংশটা বডিকনে চাপা থাকে, শিফট-ড্রেসে একটু খোলামেলা। ট্রাউজার বা কালো জিনসের উপর টপ অন্ততপক্ষে কোমর পর্যন্ত লম্বা হওয়া প্রয়োজন। টপ হাতকাটা হলে অসুবিধে নেই কিন্তু স্ট্র্যাপওয়ালা চলবে না। ক্রপ-টপ চলবে না। শর্ট-স্কার্ট ও শর্ট-প্যান্ট চলবে না। ছেলেরা পরবে ট্রাউজার এবং হাল্কা এক রঙের কলারওয়ালা শার্ট।

শুক্রবার আমাদের ইনফর্মাল ডে। সেদিন মেয়েরা কেউ নীল রঙের জিনস ও টি-শার্ট পরে আসে, কেউ ফ্রিলওয়ালা স্কার্ট অথবা ফ্রক। স্কার্ট এবং ফ্রক লম্বাতে সেই একই থাকে। হাঁটু পর্যন্ত। অনেকে রিপ জিনসও পরে।

আমাদের লেভেলে যে তিনজন ছেলে আছে—টিমলিড লোকা, প্রোজেক্ট-এক্সপার্ট শচীন এবং ম্যানেজার, তারাও শুক্রবারে ফ্যাশন করে। আমি লোকার ছাপা শার্টের ওপর খুব ঝোঁক দেখি। শচীনের ঝোঁক ফেডেড জিনস এবং 'টি শার্ট'-এর ওপর এবং ম্যানেজারের মোরগের ওপর। উনি মোরগ পরে আসেন না, মোরগের স্টিকার লাগানো গাঢ় রঙের শার্ট পরে আসেন। মোরগকে গুড-লাক হিসেবে মানেন ম্যানেজার। তাঁর টেবিলে ল্যাপটপের পাশে একটা ছোট লাল রঙের মোগর রাখা আছে। ল্যাপটপের স্ক্রিন-সেভারে আছে কালো মোরগ। ম্যানেজার আই টুয়েন্টি করে অফিসে আসেন। সর্বদা একটা সাদা মোরগকে বহন করছে গাড়ির ড্যাশবোর্ড। অফিসে আমার চার মাস হল। চার মাসে ষোলোটি শুক্রবার এসেছে। ষোলোটি শুক্রবারে ম্যানেজার ষোলো রকমের স্টিকার মোরগ শার্টে বহন করে অফিসে ঢুকেছেন।

কানুপ্রিয়া, উজ্জ্বলা, রুচিরা এবং ললিতা যে প্রেম করে তা আমি প্রথম পটলাকের দিন জানলাম। পটলাক হল লাঞ্চ টুগেদার। ঠিক হয়েছে এখন থেকে প্রতি পনেরো দিন অন্তর অন্তর একবার পটলাক হবে। এই দিন সব লেভেলের সবাই বাড়ি থেকে বেশি করে খাবার নিয়ে এসে ব্রেক-আউট এরিয়াতে ভাগ করে খাবে। একসঙ্গে সবাই কাজ ছেড়ে ব্রেক-আউটে যেতে পারবে না। পালা করে যাবে। তাই দুপুর বারোটা থেকে দুটো এই দু'ঘণ্টার জন্য সাধারণ ব্রেক দেওয়া হবে। পটলাক হবে শুক্রবারে।

ম্যানেজার এবং টিমলিড জেনারেল শিফট-এ কাজ করে। তাদের ডিউটির সময় সকাল ন'টা থেকে সন্ধে ছ'টা। কাজেই সব পটলাকেই তারা থাকবে। আমাদের ওপর লোকার করুণা বর্ষণ না হলে আমরা প্রত্যেকে তিন মাসে দু'টো করে পটলাকের মজা নিতে পারতাম। কিন্তু তার যা মানসিক স্থিতি তাতে করে অনেকেরই ভাগ্যে এক বছরে একটিও পটলাক না-ই জুটতে পারে।

সৌভাগ্যবশত প্রথম পটলাকেই আমি ছিলাম। অন্যদিন ম্যানেজার অন্যের টিফিন খেয়ে বেড়ালেও নিজেও বাড়ি থেকে টিফিন বহন করেন। প্রথম পটলাক-এ দেখলাম টিফিন হতেই তিনি সবার আগে কারও দিকে না তাকিয়ে, কে গেল কে গেল না তার হিসেব না রেখে একটা লাল-কমলা-কালো রঙের স্টিকার মোরগ বুকে নিয়ে কেবিন থেমে বেরিয়ে সোজা ব্রেক-আউট এরিয়াতে গেলেন। বউকে টিফিন বানানো থেকে মুক্তি দিয়ে শুধু অন্যের টিফিন খেয়ে পেটকে পুরো ভরিয়ে ফেললেন। ফিরলেন সবার শেষে। ম্যানেজার কেবিনে ঢুকলে একটুর জন্য পটলাক মিস করে বেদান্তি, উজ্জ্বলা এবং সুনইনা সেকেন্ড শিফটে এল।

একটু পরে মর্নিং-এর কানুপ্রিয়া, অভিলাষা, প্রাজক্তা এবং আমি আফটারনুন-এর মেয়েগুলোকে সঙ্গে নিয়ে ম্যানেজারের কাছে লোকার সমস্যা নিয়ে গেলাম। সঙ্গে শচীন। কানুপ্রিয়া বলেছিল, "ওটাকে নিয়ে কি হবে! ওটা বোবা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে!"

তবু আমরা ছাড়লাম না। প্রথম দিকে লোকার হয়েই বলতে শুরু করলেন ম্যানেজার। কানুপ্রিয়ার দিকে তীক্ষ্ণ নজর ঢেলে জিজ্ঞেস করলেন, ''তোমার অফার লেটারটা কে সাইন করেছে?''

''আমি করেছি স্যার।''

উজ্জ্বলার দিকে তাকিয়ে, ''তোমার অফার লেটার?''

''আমি।''

অভিলাষার দিকে তাকিয়ে, ''তোমার?''

''আমি স্যার।''

এক এক করে আমিসহ বাকি তিনটে মেয়েকে ম্যানেজার একই প্রশ্ন করলেন এবং একই উত্তর পেলেন। বললেন, ''টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনস না পড়ে সাইন করে দিয়েছ? সপ্তাহে যে দু'দিন ছুটি পাচ্ছ তা যথেষ্ট হচ্ছে না?''

সুনইনা তার একতরফা প্রেমের ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে এই প্রথম বুদ্ধি খাটিয়ে কথা বলল, ''এক শিফট হলে সপ্তাহে একদিন ছুটি চলবে স্যার।''

ম্যানেজার বাকিদের কাছে জানতে চাইলেন, ''তোমাদের কি অসুবিধে হচ্ছে?''

প্রাজক্তা বলল, ''ঘুম খুব কম হওয়ায় পেটের সমস্যাতে ভুগছি।''

উজ্জ্বলা বলল, ''মাথাব্যথা।''

কানুপ্রিয়া বলল, ''আমার খুব টেনশন হয় স্যার। টেনশনে সবসময় বমি বমি লাগে।''

অভিলাষা বলে, ''আমার ভীষণ ব্যাক-পেন হচ্ছে। একটি মহিলাকে ম্যাসাজ করে দেওয়ার জন্য ঠিক করেছিলাম। আমারই ডিউটির সময়ের ঠিক নেই, তার কি থাকবে! তিনদিন কোনরকমে এসে হাওয়া হয়ে গেছে।''

শচীন চুপ। ছেলে হয়ে আমাদের অভিযোগের মেরুদণ্ড শক্ত করার পরিবর্তে নরম করে দিল শচীন। একটা ছেলের বাহ্যিক রূপের সঙ্গে অতিরিক্ত মেয়েলি আচরণ মিশে গেলে তাকে আমার হিজড়া ছাড়া অন্য কিছুই মনে হয় না। ম্যানেজার শচীনকে জিজ্ঞেস করলেন, ''তোমার কি হচ্ছে?''

''কিচ্ছু হচ্ছে না স্যার।''

''মানে?''

অভিলাষা শচীনের কাঁধে একটা চিমটি দেয়। চিমটি খেয়ে শচীনের মুখ থেকে থতমত খাওয়া জবাব বেরোয়, ''মানে স্যার...আমার ঘুম হচ্ছে না, খাওয়া হচ্ছে না, স্নান হচ্ছে না, পেচ্ছাব হচ্ছে না, পায়খানা হচ্ছে না...''

''তোমরা খাও বা না খাও, পেচ্ছাব করো বা না করো, দশবার পায়খান যাও, মাথা ধরে বসে থাকো, বমি করো, যা কিছু করার অফিসেই করো। ডিউটি যেমন চলছে তেমনই চলবে।'' ম্যানেজার আমার অসুবিধের কথা জিজ্ঞেস করার ধৈর্য রাখলেন না। পেট ভারী। উনি কেবিন থেকে বেরিয়ে ওয়াশরুমের দিকে হাঁটা দিলেন।

সেদিন একটু পরেই কানুপ্রিয়া অজ্ঞান হল। হৈচৈ পড়ে গেল অফিসে। মাথায় জল ঢেলে জ্ঞান ফিরিয়ে টেনে তুলে চেয়ারে বসানো হল তাকে। ম্যানেজার ওয়াশরুমে পেট কিছুটা খালি করে এসে দেখলেন সে চেয়ারে বসে আছে কিন্তু তার শরীর নিস্তেজ, মাথা চেয়ারের ব্যাক-রেস্টে হেলিয়ে দেওয়া, চোখ বন্ধ। 'লেভেল টু'-এর ম্যানেজার ছুটে এসে ছুটি দিয়ে দিলেন কানুপ্রিয়াকে। তবু সে ছুটি পায় না। আমাদের ম্যানেজার কাউকে তার সঙ্গে ছাড়বেন না। ম্যানেজারের কাছে অফিসের কাজ ছাড়া অন্য কোন কাজ জরুরি নয়। তাহলে কানুপ্রিয়া বাড়িতে যাবে কি করে? তার ব্যাগ থেকে মোবাইল বের করারও সাধ্য নেই। অভিলাষা কানুপ্রিয়ার ব্যাগে মোবাইলের তলাশ চালাতে হাত ঢোকালো। সেখান থেকে প্রথমে বেরোল একটা টেমপটেশন মিষ্ট স্প্রে, তারপরে একটা লিপস্টিক, তারপরে একটা ময়েশচারাইজার, ব্লাশ-অন, কাজল, মিন্ট অ্যান্ড চুয়িং গাম, সান গ্লাস। আমরা সবাই মোবাইলের জন্য অপেক্ষা করছি। ম্যানেজারও আমাদের সঙ্গে আছেন। তাঁর উত্তেজনা সবথেকে বেশি। সময় নষ্ট হচ্ছে। 'তাড়াতাড়ি করো, তাড়াতাড়ি করো' বলে চিৎকার করছেন।

অভিলাষা বলে, ''তাড়াতাড়িই করছি স্যার।''

কানুপ্রিয়ার ব্যাগ থেকে তারপরে বেরোল একটা স্কার্ফ। তারপরে একটা হেয়ার-ব্রাশ, একজোড়া মোজা।

ম্যানেজার আবার চিৎকার করেন, ''উফ্ তাড়াতাড়ি!''

অভিলাষা বলে, ''একটু দাঁড়ান স্যার।''

কানুপ্রিয়ার ব্যাগ থেকে তারপরে বেরোল একটা হেডফোন, তারপরে মোবাইল চার্জার, তারপরে একটা ছোট্ট ফোল্ডিং ছাতা।

ম্যানেজারঃ মোবাইল চার্জার-এর পরে মোবাইল বেরোনোর কথা। ছাতা কেন?

অভিলাষাঃ স্যার!

প্রাজক্তা আমার কানে-কানে বলে, ''এ এখানে কেন দাঁড়িয়ে আছে? মেয়েদের ব্যাগের দিকে তাকিয়ে ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে নেই জানে না?''

তারপরে ব্যাগ থেকে একটা ইন্টিমেট-ওয়াশ বেরোল। ম্যানেজার বুঝলেন না ইন্টিমেট-ওয়াশ কি জিনিস।

তারপরে ব্যাগ থেকে বেরোল একটা বই, ক্যাপটিভ প্রিন্স।

অধৈর্য হয়ে ম্যানেজার বললেন, ''পাশের পকেটে দেখো।''

কানুপ্রিয়ার ব্যাগের পাশের পকেট থেকে বেরোল দুটো হুইস্পার প্যাড।

এতক্ষণে ম্যানেজারের উপলব্ধি হল তিনি মেয়েদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন। তাদের ব্যক্তিগত জিনিস নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করা হচ্ছে। উপলব্ধি হলেও তিনি লজ্জা পেলেন না। 'ওকে যেতে হবে না এখন বাড়িতে। এখানেই বসিয়ে রাখো' বলে কেবিনে ঢুকে পড়লেন।

কানুপ্রিয়ার মোবাইল আমরা অবশেষে তার প্যান্টের পকেট থেকে উদ্ধার করি।

রিসেন্ট কল লিস্টে গিয়ে দেখি কাকে সে সবথেকে বেশি কল করেছে। সেখানেই পাওয়া যায় তার বয়ফ্রেন্ডের নাম, জানা যায় কানুপ্রিয়া প্রেম করছে। সেখান থেকেই জানা যায় উজ্জ্বলা, রুচিরা এবং ললিতারা বয়ফ্রেন্ডের কথাও।

বয়ফ্রেন্ডকে ডেকে কানুপ্রিয়াকে বাড়িতে পাঠানো হয়।

পরদিন মর্নিং শিফটে গিয়ে শুনলাম সাক্ষীর আবার এস্কেলেশন এসেছে। সাক্ষীর নাইট শিফট ছিল। প্রাজক্তার আফটারনুন। প্রাজক্তা রাত দশটাতেই বেরিয়ে গেছে। সে তার কয়েকটা টিকিট সাক্ষীকে হ্যান্ডল করতে বলেছিল। সেখানে গড়বড় করেছে সাক্ষী। এবার এস্কেলেশন নিয়ে অফিসে কোন হাঙ্গামা দেখলাম না। আফটারনুনে সুনইনা এল। এসে আমার পাশে বসল। আবার অস্থির হয়ে আছে তার মন। এবার অস্থিরতার কারণ আলাদা। সে বলে, ''উজ্জ্বলা, কানুপ্রিয়া, রুচিরা এবং ললিতা তাদের বয়ফ্রেন্ডদের নিয়ে বার-হপিং করে।'' আগের দিন আমি বাড়ি গেলে সুনইনা আফটারনুন শিফটে বসে বসে খবর সংগ্রহ করেছে আমাকে দেবে বলে।

কোন উত্তর দিই না।

''আমারও প্রতীকের সঙ্গে বার-হপিং করার খুব ইচ্ছে।''

এবারও আমি চুপ।

আমার নিস্তব্ধতা সুনইনার মনে প্রশ্ন জাগায়, ''জানিস তো বার-হপিং কি জিনিস?''

বার-হপিং আমার কাছে কোন না জানা কথা নয়। আজকাল যুবক-যুবতীদের আমোদ-প্রমোদের সর্বাধুনিক পন্থাগুলোর মধ্যে এক অন্যতম পন্থা হল তা। বলি, ''না।''

''ওরা একসঙ্গে ছুটি পেলেই রাতে বেরিয়ে যায়। তিন চারটে বারে যায়, ডান্স ও ডিনার করে। ফেরে পরদিন সকালে।''

''ওহ্।''

''তোকে বলা হয়নি, আমার কাজেনরাও বার-হপিং করে।''

বার-হপিং-এর ধারা আমাদের আত্মীয়-স্বজনের মধ্যেও ঢুকে পড়েছে। বলি, ''আচ্ছা!''

''কাজেন মানে মামার ছেলে মেয়ে...''

আমার বাবার দিকের কেউ এখনো তাদের গত তিরিশ বছর ধরে প্রতিপালন করা সংস্কার থেকে এতটুকু বিচ্যুতি হয়নি। বিচ্যুত হয়েছে আমারও মায়ের বাড়ির সদস্য। বলি, ''ওহ্।''

''আমার মায়ের লাভ ম্যারেজ ছিল...''

আমাদের পরিবারের পুরনো সংস্কারকে সর্বপ্রথম অবমাননা করেছেন আমার মা। অবমাননা করে ভালবেসে বিয়ে করেছেন। বলি, ''তাই বুঝি?''

''মায়ের বাড়ির কেউ ভাল মনে সেই বিয়েকে মেনে নেননি..কেউ মানে পাঁচ

মামা, দিদা এবং দাদু। তাঁরা মাকে ত্যাজ্য করে দিয়েছেন...”

আমার মাও বিয়ে করে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন। আমার তিন মামা আমাদের কোন খবরাখবর নেন না। বলি, “খুবই দুঃখের ব্যাপার।”

“পরে মামারা আমাদের বাড়িতে আসতেন। আমি যখন ছোট ছিলাম আমার মা আমাকে ছোট ছোট ড্রেস পরাতেন। মামারা পছন্দ করতেন না...”

দেখছি সুনইনার সঙ্গে আমার প্রচুর মিল। সুনইনা গুছিয়ে বলতে পারছে না। কিন্তু আমি গুছিয়ে ভাবছি। আমার মা তাঁর বাপের বাড়ি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ছোটবেলায় আমাকে তাঁর খুশিতে সামান্য কাপড় দিয়ে পোশাক তৈরি করে পরিয়েছেন এবং আমি আমার পরিণত বয়সেও সেই পোশাকের ধারা অব্যহত রেখেছি। আমি যখন ছোট ছিলাম তখন দু'য়েকবার মায়ের বাড়ির গুরুজনদের সঙ্গে আমাদের দৈবযোগে সাক্ষাৎ হয়েছিল। তাঁরা আমাকে শর্টস, শর্ট-স্কার্ট, স্প্যাগেটি, ক্রপ-টপ ইত্যাদিতে দেখে হতশায় মুখ বাঁকা করেছেন। অথচ এখন তাদেরই ছেলেমেয়েরা পোশাকের সংক্ষিপ্তকরণ এবং শরীরের অনাবৃতকরণের প্রতিযোগিতায় আমাকে হারিয়ে দিয়েছে। আমার সঙ্গে তাদের যোগাযোগ নেই। ডিজিটাল মিডিয়ার মাধ্যমে আমি তাদের অতি-আধুনিকতার খবর পাই। তারা ড্রিঙ্ক করে, সিগারেট খায়, বার-হপিং করে এবং সময়ে সময়ে গার্লফ্রেন্ড বা বয়ফ্রেন্ড পাল্টে ফেলে। অবশ্য আমার বিশ্বাস তারা এসব চুপিসারে করে। মা-বাবার কাছ থেকে ব্যক্তিস্বাধীনতা পায়নি বলেই চুপিসারে।

আমার ক্ষেত্রে উপরোক্ত চারটি নেশার একটিকেও মা সাদরে গ্রহণ করতে পারবেন না, তবু আমার কোনকিছুতে কোন মানা নেই। মা আমাকে প্রকৃত গণতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণায় বড় করেছেন। সেই ধ্যান-ধারণার কেন্দ্রবিন্দুতে দাঁড়িয়ে প্রকৃত প্রয়োজন আছে কি নেই বিচার করে আমি কোন অভ্যেসের চর্চা করি অথবা অভ্যেস তৈরি হয়ে থাকলে তা বর্জন করি।

আমি জানি ব্লাডি মেরি তৈরি হয় ভোডকা, টমেটো জুস এবং বিভিন্ন স্পাইসেস ও ফ্লেভার দিয়ে যেমন লাল লঙ্কা, সেলারি ও জলপাই। মোহিতো তৈরি হয় সাদা রাম, সুগারকেন জুস, লাইম জুস, সোডা ওয়াটার এবং পুদিনা দিয়ে। ম্যানহ্যাটন তৈরি হয় হুইস্কি, বিটার এবং সুইট ভারমুথ দিয়ে। মার্গারিটা তৈরি হয় টেকিলা এবং লাইম অথবা লেমনজুস দিয়ে। ব্লাডি মেরি, মোহিতো, ম্যানহ্যাটন, মার্গারিটা হল ককটেলস। আমি দেশি বিদেশি প্রচুর সিগারেট ব্র্যান্ডের নাম জানি। উইলস, উইলস ক্লাসিক মাইল্ড, গোল্ড ফ্লেক লাইট, গোল্ড ফ্লেক কিংস হল দেশি সিগারেট। কেন্ট এবং পল মল-এর প্রস্তুতকারক 'ইউ এস এ'-এর আর জে রেনল্ডস টোবাকো কম্পানি। এক প্যাকেট সিগারেটের দাম মোটামুটিভাবে পাঁচ হাজার টাকা। পার্লামেন্ট এবং মার্লবোরোর প্রস্তুককারক 'ইউ এস এ'-এর ফিলিপ মরিস কম্পানি। কারেলিয়া তৈরি করে বা করায় গ্রীসের কারেলিয়া টোবাকো কম্পানি। সবই দামি সিগারেট।

গুগল ব্রাউজ করে জেনেছি সব। মাত্র দু'য়েকটি ককটেলের স্বাদ নিয়ে রেখেছি।

এর চেয়ে বেশি কিছু করার ইচ্ছে জাগেনি।

কানুপ্রিয়ার ব্যাগে মোবাইল খুঁজতে গিয়ে ক্যাপটিভ প্রিন্স পাওয়া গেলে ম্যানেজারের মুখ দেখে আমার মনে হয়নি তিনি বইয়ের নাম অথবা কভার পেজ দেখে অনুমান করতে পেরেছেন যে ক্যাপটিভ প্রিন্স আসলে একটা এরটিক অর্থাৎ যৌন-কামনা উদ্রেককারী উপন্যাস। সুনইনা ভেবেছিল বইটিতে কোন রাজকুমারের গল্প হবে। প্রেম-ভালবাসার ক্ষেত্রে সুনইনার মাথা কম চলে, তাই আমি বিস্মিত হইনি। বিস্মিত হই পরদিন যখন অভিলাষার মত বুদ্ধিমতি মেয়েও কানুপ্রিয়ার কাছে বইটির সারার্থ জানতে চায়।

এরটিক রোমান্স নভেল আমি অনেক পড়েছি। আসলে নভেলই আমি অনেক পড়েছি। প্রায় দেড় হাজার। বিভিন্ন জনারের যেমন হরর, থ্রিলার, মিস্টেরি, ফ্যান্টাসি, অ্যাডভেঞ্চার, ডিস্টপিয়ান, এরটিক। এমন নয় যে এরটিকের প্রতি আমার আকর্ষণ বেশি। বস্তুত ডিস্টপিয়ান বইগুলো আমাকে বেশি টানে। তবু আমি সবরকমের বই পড়ি। এরটিক সেই সবরকমের মধ্যে একরকম। বই-এর রিভিউ দেখে আমি ঠিক করি বইটি পড়ব কি পড়ব না। আমার পড়া প্রথম এরটিক বই ছিল গোয়িং ডাউন ইজি—লিখেছেন কার্লি ফিলিপস। রিভিউ-এ অনেকে লিখেছিল এটি এমনই একটি বই যা একবার পড়া শুরু করলে না শেষ করা অবধি থামা যায় না। কিন্তু আমার তেমন কিছুই মনে হয়নি। বই আমার পড়ার গতিকে অব্যহত রাখতে অক্ষম হয়েছে। পরেরগুলো হল—লুসিয়া জর্ডনের রক হার্ড, লরেন ল্যান্ডিশের দ্য ডেয়ার, ক্রিস্টিনা লরেনের বিউটিফুল স্ট্রেঞ্জার, টিফানি রাইজ-এর দ্য রোজ, ই এল জেমস-এর ফিফটি শেডস নভেল সিরিজ ইত্যাদি। বই পড়ে সব জেনেছি কিন্তু যে কোন পুরুষের জন্য উন্মাদ হইনি। আমি আমার কল্পনাতে একমাত্র একটি পুরুষেরই ছবি এঁকে রেখেছি। তাকে পেলে আর কাউকে প্রয়োজন হবে না। তাকে না পেলেও কাউকে প্রয়োজন হবে না।

সুনইনা বলে, "গতকাল আমাদের ম্যানেজার গিরিধর এবং প্রাজক্তাও বার-হপিং করেছে।"

আমি অবাক, "বলিস কি?"

"তুই জানিস না। প্রথম থেকেই ওদের মনে কিছু একটা চলছিল। সবাই জানে...মেয়েটি ভাল না। ওদিকে একটা মুসলিম ছেলেকে ফাসিয়ে বসে আছে। এদিকে ম্যানেজারকে..."

"তোকে কে বলেছে?"

"সাক্ষী আগেই বলেছিল। গতকাল আমি নিজে চোখে দেখেছি।"

ভাবি সেইজন্যই কি সাক্ষী এবং প্রাজক্তার বনিবনা হয় না! সেইজন্যই কি সাক্ষী ম্যানেজারকে একদম পছন্দ করে না! আগে ম্যানেজার সাক্ষীর পান থেকে চুন খসলে অফিসে তুলকালাম করতেন! আজ সেইজন্যই কি ম্যানেজার মুখে কুলুপ

দিয়ে রেখেছিলেন! বেশি বেশি করতে গিয়ে পাছে জানাজানি হয়ে যায় ভেবে! কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করতে পারি না। আমার অফিস পলিটিক্সে নেমে পড়ার অর্থ হল পরচর্চা শোনা, সজাগ থাকা অফিসের সবার চালচলন নিয়ে, পরচর্চা করা নয়।

*****

প্যানাসিয়াতে আমার ছ'মাস হল। ছ'মাসে অফিসের বাইরে আমার বন্ধুমহলে অনেক পরিবর্তন এল। খালি হয়ে গেল মহল—এক এক করে সঞ্জয়, সঞ্চিত, লাভ এবং অনুভব বিদায় নিল, কিন্তু জগাখিচুড়ি শিফটের চেহারা একটুও পাল্টালো না। উল্টে অত্যধিক পরিশ্রম এবং অনিয়মিত সময়সূচি আমার চেহারা পাল্টে দিল। মা মাঝে মাঝে আমাকে ভিডিও কলে দেখতে চান। দেখে তাঁর অসম্ভব মন খারাপ হয়। উত্তেজিত হয়ে পড়েন। যে চাকরিতে উনি আগে আমাকে উৎসাহিত করেছেন এখন সেই চাকরি ছাড়তে উৎসাহিত করছেন অথবা নিরুৎসাহিত করছেন অফিসে যেতে। বলছেন, "রেজিগনেশন দাও রিলি। এভাবে তুমি বাঁচবে না। অন্য চাকরি খোঁজো। নিশ্চয় কোথাও না কোথাও পেয়ে যাবে।"

মাকে বলি, "মাত্র ছয় মাসের অভিজ্ঞতাকে কেউ বিচার করবে না। আমাকে এখানে ন্যূনতম দেড় বছর কাজ করতে হবে।"

বারবার শিফট পরিবর্তন হওয়াতে এবং এক নাগাড়ে একমাস নাইট শিফট করতে করতে আমার ঘুমের বারোটা বাজল। মুখ ব্রণতে ভরে গেল এবং শারীরিক সমস্যা দেখা দিল। পিঠে ব্যথা। পিঠে ব্যথা অভিলাষারও। অফিসে বসে বসেই হয়েছে। অভিলাষা সেদিন ম্যানেজারকে বলেছে উল্টোপাল্টা শিফটের কারণে সে ফিজিওথেরাপিস্টকে বাড়িতে ডাকতে পারছে না। সুতরাং আমি ফিজিওথেরাপিস্টের কথা ভাবতেই পারলাম না। ইন্টারনেট দেখে পিঠের কয়েকটি ব্যায়াম করার চেষ্টা করলাম। দেখলাম অবস্থার আরও অবনতি ঘটল। পায়ের গোড়ালিতে এবং বাঁ হাঁটুতে ব্যথা শুরু হল। তবু আমি দিন পনেরো ব্যথাকে বিশেষ গুরুত্ব দিলাম না। কয়েকদিন বিশ্রাম নিলে এমনিতেই ঠিক হয়ে যাবে ভাবলাম। কিন্তু ঠিক হল না। বরং দিনে দিনে বেড়েই চলল। শেষে আমি দেখলাম আমি স্বাভাবিকভাবে হাঁটতেই পারছি না। একভাবে বেশি সময় দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না, বসে থাকতে পারছি না। একভাবে বেশি সময় শুয়ে পর্যন্ত থাকতে পারছি না। শুয়ে পাশ ফিরতে পারছি না। নড়াচড়া করলে শরীরের বিভিন্ন সন্ধিস্থল থেকে পট পট শব্দ কানে আসছে। কষ্ট সহ্য করতে না পেরে আমি একজন ফিজিওথেরাপিস্টের কাছে যেতে বাধ্য হলাম। বাড়ির কাছেই তাঁর ক্লিনিক। উনি আমার সারা শরীরের চেক-আপ করলেন। সমস্ত জয়েন্ট পরীক্ষা করলেন। আমার ভয় করছিল এই বুঝি বলবেন আমার জয়েন্ট আরথ্রাইটিস হয়েছে। আমাকে ট্রিটমেন্ট দেওয়ার সময় উনি জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি কলেজে পড়ো?"

বলি, "না।"

"তাহলে?"

"একটা আই টি কম্পানিতে কাজ করি।"

"ওহ্, তার মানে তুমি একজন ইঞ্জিনিয়ার।" জিজ্ঞেস করেন, "অফিসে কতক্ষণ এক জায়গায় বসে থাকো?"

"আট ঘণ্টা।"

শুনে ফিজিওথেরাপিস্ট কিছু বলেন না। জানতে চাই, "কি হয়েছে আমার?"

"সবকিছু।"

"কি বলছেন!"

"তোমার সারা শরীরে রোগ বাসা বেঁধেছে। কি খেলা খেলেছ তুমি শরীর নিয়ে?"

"কি করব তাহলে?"

"তোমাকে তোমার অভ্যেস পরিবর্তন করতে হবে।"

"যেমন?"

"তোমার লাইফ স্টাইল, তোমার কাজের পদ্ধতি, তোমার খাদ্য, তোমার ওয়ার্কআউট অর্থাৎ ব্যায়াম...সব।"

ট্রিটমেন্ট শেষ হলে আমি বলি, "আমার আসলে কি হয়েছে একটু বুঝিয়ে বলবেন প্লীজ?"

"দেখো, দীর্ঘ সময় বসে থেকে থেকে তোমার কিছু পেশীর কার্যক্ষমতা একবারে লোপ পেয়েছে। এমন অবস্থায় যেহেতু তোমার কাজের চাপ কম হয়নি, তোমার সচল পেশীগুলোকে অতিরিক্ত কাজ করতে হচ্ছে। যার ফলে তোমার শরীরে ব্যথা হচ্ছে।"

উনি আমাকে কয়েকটি ব্যায়াম দেখিয়ে দিলেন। বললেন, "দিনে দু'বার করে করতে হবে।"

যখন ফিজিওথেরাপিস্ট আমাকে বলেছিলেন, "কি খেলা খেলেছ তোমার শরীর নিয়ে?" আমার স্মৃতির বাক্স প্রায় খালি হয়ে গিয়েছিল। ভুলে গিয়েছিলাম আমার নাম-ধাম, কোথায় এসেছি, কার সঙ্গে এসেছি। আমার কোন বন্ধুবান্ধবের নাম মনে পড়ছিল না। চার বছর যার সঙ্গে প্রেম করেছি, যাকে হারিয়ে বড় কষ্টে আমার দিন কাটছে তার নামও কোথাও হারিয়ে গিয়েছিল। আমার স্মৃতির বাক্সের চার দেওয়ালে, ছাদে-মেঝেতে তখন একটি এক অক্ষরের শব্দই বারবার বাড়ি খেয়ে ঝনঝন করে কতগুলো আওয়াজ বের করছিল। সেই আওয়াজের মধ্যে আমি শুনতে পাচ্ছিলাম 'কম্পিউটারে কাজ করার সময় মাঝে মাঝে চোখের পাতা নড়াবে, প্রত্যেক আধ ঘণ্টা পর গলা এবং কাঁধের হাল্কা ব্যায়াম করবে, এক ঘণ্টা পরপর পাঁচ মিনিটের জন্য হেঁটে আসবে'। কথাগুলো মা আমাকে ফোনে অগণিতবার বলেছিলেন। তখন আমি তাঁকে 'মাম্মা!' বলে উল্টে ধমক দিয়েছি। এমন ব্যবহার করেছি যেন তিনি অকারণ বাড়াবাড়ি করছেন।

আমাদের প্রোজেক্টে অর্গানাইজেশন্যাল লেভেল এগারো, দশ এবং নয়-এর ছেলেমেয়েরাও যারা আগে অন্য কম্পানি থেকে কাজ করার অভিজ্ঞতা নিয়ে এখানে এসেছে কোন না কোন শারীরিক অসুস্থতায় ভুগছে। কারও অভিলাষারই মত পিঠে যন্ত্রণা, কারও হাঁটুতে যন্ত্রণা, কারও পায়ের গোড়ালিতে, কারও কনুইয়ে, কারও কাঁধে, কারও গলায়। আমার একার শরীরে সব রোগ।

আমার পঁচিশ বছরের জীবনে আমি প্রেম একবারই করেছিলাম। সন্দীপ যাদবের সঙ্গে। আমার প্রেম শুরু হয়েছিল কুড়ি বছর বয়সে। চলেছিল চব্বিশ বছর বয়স পর্যন্ত। চার বছর একটা উল্লেখযোগ্য লম্বা সময়। তবু না আমাদের মিলন হয়েছে, না আমি তার বুকে বিলীন হয়ে গিয়ে তার শরীরের উষ্ণতা নিতে পেরেছি, না আমার তার কাছ থেকে চুমু পাওয়ার সৌভাগ্য পর্যন্ত হয়েছে। আমাদের প্রেম ছিল অপার্থিব। তবু আমার বিশ্বাস ফুলশয্যাকে অবিস্মরণীয় এবং চিরআকাঙ্ক্ষিত করে তোলার ক্ষমতা আমার আছে। অবশ্য তার জন্য শর্ত পূরণ হওয়া প্রয়োজন। শর্ত হল আমার জীবনে এমন একটি পুরুষকে আসতে হবে যাকে আমি মন উজাড় করে দিয়ে ভালবাসতে পারব। তার অনেক বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি না থাকলেও চলবে, সে অনেক ধনী না হলেও চলবে, সে অনেক বড় পোস্টে অনেক বড় বেতনের চাকরি না করলেও চলবে, সে দৃষ্টি কাড়ার মত সুদর্শন না হলেও চলবে। তবু সে আমার মনের খুব কাছাকাছি আসবে যদি সে কেবলমাত্র আমি ছাড়া অন্য কোন মেয়ের মন এবং শরীরের সান্নিধ্যে যাওয়ার ইচ্ছে না রাখে।

সন্দীপ যাওয়ার পর আমি মোটামুটি নিশ্চিত ছিলাম আমার জীবনে অন্য কোন পুরুষের প্রবেশ ঘটবে না। সাধারণের চোখে আমার ভালবাসার দরজা অনেক শক্ত। লোহা দিয়ে তৈরি। তাকে ভাঙবে এমন সাধ্য কার আছে! তাকে ভাঙবে এমন অসাধারণ কে আছে!

সায়লিকে আমি অনেক কাছ থেকে দেখেছি। সে এসব শর্ত টর্ত বোঝে না। তার মন যা বলে সে তাই করে, কখনো মনের সঙ্গে অনেক ঘষাঘষির পরে করে আবার কখনো একেবারে অনায়াসে। আমাদের ব্যক্তিত্বের মধ্যে কোন মিল নেই। পছন্দ-অপছন্দের মধ্যে কোন মিল নেই। পাহাড়সমান অমিল আমাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। তবু আমরা একে অন্যকে স্বচ্ছ দেখতে পাই। আমি তার মন পড়ি, সে আমার। আমি আমার জীবনে যেটা করতে চাই না সেটা সে করে, করে আনন্দ পায়। তার সঙ্গে আমিও আনন্দ পাই। এটুকু আনন্দেই আমি সুখী নই। ওর থেকে

আমার অনেক আশা। আমি তার জিভ দিয়ে উঠিয়ে নিয়ে আসা পূর্ণাঙ্গ ভালবাসার স্বাদ নিজের জিভে রেখে আস্বাদন করতে চাই। পূর্ণাঙ্গ ভালবাসার সম্পর্ক তার অক্ষয়ের সঙ্গেও হতে পারে, নইলে শিব, নইলে বিষ্ণু, নইলে সাই। ব্যক্তি নির্বাচনের ক্ষেত্রে এত উদারতা দেখিয়েও, এত স্বাধীনতা দিয়েও সায়লিকে দিয়ে কিছুই করাতে পারছি না, এখনও পর্যন্ত সে কারও সঙ্গেই সম্পর্ক পাকা করতে পারল না। পরিবর্তে অভাবনীয় আচরণ দেখিয়ে বর্তমান প্রণয়প্রবাহে ভেসে যাওয়া বিষ্ণু এবং সাই-এর জন্য কোন সহানুভূতি না রেখে পুনেতে পোস্টিং নিল। উদ্দেশ্য বাড়ি ভাড়া বাঁচাবে।

*****

পুনে পৌঁছে বাড়িতে সুটকেস রেখেই সায়লি আমার বাড়িতে এল। দেখল আমি আভাস ভার্মার সঙ্গে টিন্ডারে চ্যাট করছি। ''তুমি ফটোতে যে মেয়েটিকে দেখেছ আমি যদি সেই মেয়ে না হই?''

''আমার তাতে কিছু এসে যায় না। তুমি দেশি বিদেশি ইঁদুর, বেড়াল, খরগোশ কিছুই হতে পারো। এমনকি এলিয়েন যাকে আমরা অন্য গ্রহের জীব বলি।''

''আমার নাম যদি অনামিকা না হয়ে অন্য কিছু হয়?''

''আমার এই মেয়েটিকেই পছন্দ।''

''যদি আমার স্কুলের এবং কলেজের নাম আলাদা হয়?''

''আমার এই চরিত্রটিকেই পছন্দ?''

''যদি আমাকে নিয়ে বলা সব কথা মিথ্যে হয়?''

''তাহলেও।''

''ঠিক আছে। বুঝতে পারলাম মিথ্যে কথা বলা চরিত্রকে তোমার পছন্দ।''

''হতে পারে। কিন্তু মিথ্যে কথা বলা এই মেয়েটিকেই।''

''আমার ফটো দেখতে চাও?''

''নিশ্চয়।''

সায়লিকে জিজ্ঞেস করি, ''কিরে, পাঠাবো ফটো?''

সায়লি বলে, ''ওকে তোর ইনস্টাগ্র্যামের লিঙ্ক দে।''

একটু পরেই আমাদের মোবাইল নম্বরের আদান-প্রদানও হয়ে যায়। টিন্ডার-এর একদিনের অ্যাকাউন্ট আমি ডিলিট করে দিই।

সায়লির পাল্লায় পড়ে আমি তখনই আভাসকে ফোন করি।

টিন্ডার একটা ডেটিং সাইট। যারা জানে টিন্ডার কি তারা সেখানে জীবনসঙ্গী খুঁজতে যায় না। আমিও যাইনি জীবনসঙ্গী খুঁজতে। আভাসও নয়। অথচ ওর সঙ্গে কথার বলা পরেই আমার মনে হল টিন্ডারেই আলাপ হওয়া আভাস এবং আমি সেই বিশেষ বন্ধনের দিকেই হাঁটতে চাইছি। 'ওয়ান নাইট স্ট্যান্ড', 'ফ্রেন্ডস উইথ বেনিফিট' কথাগুলোকে আমি ঘৃণা করি এবং আভাস আমাকে এই কথাগুলো বলল না। ওর ভদ্রতা দেখে আমি ওকে টিন্ডার-এ অ্যাকাউন্ট খোলার কারণ জিজ্ঞেস

করলাম। সে বলল, "আমার এক্স-এর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়েছে তাই।" টিন্ডারে আমারও অ্যাকাউন্ট খোলার একই কারণ। তাই আভাসকে আমি একবারের জন্যও অবিশ্বাস করিনি। উল্টে জানতে চাইলাম, "মেয়েটির নাম কি ছিল?"

"পূর্বা।"

আওয়াজ করা যাবে না বলে সায়লি একটা সাদা কাগজের উপর পেন দিয়ে লেখে। আমায় সাহস দেয়, "বাহ্, পূর্বা অর্থাৎ ভূতকাল। অতীত হয়ে গেছে আগের ভালবাসার কাহিনী। এই শোন, এই মেয়েটি ওর জীবনে ফিরে আসবে না। বাজি রেখে বলতে পারি।"

"লম্বায় কত ছিল?"

"এত দেরিতে উত্তর! পাঁচ ফুট সাড়ে পাঁচ ইঞ্চি।"

"তোমার হাইট কত?"

"কেন? তুমি কি ছয় ফুট লম্বা।"

"এমনি জানতে চাইছি। বলো না।"

"পাঁচ দশ।"

সায়লি লেখে, "তোর পাঁচ তিন।" প্রবোধ দেয় সে, "পাঁচ ইঞ্চির হিলগুলো তোকে ওই মেয়েটির চাইতে আড়াই ইঞ্চি বেশি হাইট দেবে।"

"দেখতে কেমন ছিল?"

"এত থেমে থেমে কথা বলছ কেন?"

"থেমে থেমে কথা বলছি! কই, না তো! দেখতে কেমন ছিল সে?"

"মোটামুটি।"

সায়লি লাফিয়ে ওঠে, "এখানে তোর ফাইভ হান্ড্রেড পার্সেন্ট জিত। মেয়েটি একদম মার খেয়ে গেছে।"

আভাস বলে, "সেও বাঙালি ছিল। আমাদের বাড়ির কাছেই ওর বাড়ি।"

মুখ বাঁকায় সায়লি, "হোক কাছে বাড়ি। তুইও বাঙালি। তুই এখন ওর কাছে কুঁড়ি থেকে ফুটে ওঠা সতেজ ফুল।"

"তোমাদের সম্পর্ক কতদিন টিকেছিল?"

"তোমার ওখানে কি নেটওয়ার্কের প্রবলেম?"

"হতে পারে। আমার কথা শুনতে পাচ্ছ না?"

"পাচ্ছি।"

"তাহলে বললে না যে তোমাদের সম্পর্ক কতদিন টিকেছিল!"

"পাঁচ বছর তিন মাস।"

এরপর সায়লি লেখে, "এতদিন পরে ছাড়াছাড়ি!"

"তার সঙ্গে একদমই যোগাযোগ নেই?"

"না। সে আমাকে ধোঁকা দিয়েছে।"

সায়লি উপসংহার টানে, "ওহ্, ওর সঙ্গে তোর সম্পর্ক পাকা হবে।"

উপসংহার টেনে সায়লির অন্তর্ধান।

সে চলে গেলে আভাসের সঙ্গে আমার আরও কথা হল। ধোঁকা খেয়েছে জেনে আমার নিজের সন্দীপের কাছ থেকে ধোঁকা খাওয়ার গল্প তাকে মন খুলে বলতে পারলাম। মন বলল, প্রতারিত হওয়া মানুষকে বিশ্বাস করা যায়, প্রতারণা করা মানুষকে নয়। আভাসেরও নিশ্চয় একই ভাবনা।

তিনদিন পরে মাকে ফোন করে বললাম, "জানো, টিন্ডার থেকে পেলে কি হবে ছেলেটি খুব ভদ্র!"

মা'র প্রশ্ন ছিল, "কি করে জানলে?"

"এটা এমন কি কঠিন ব্যাপার! গতকাল সে আমাদের বাড়ি এসেছিল..."

"গতকাল তো দীপাবলী ছিল..."

"সেইজন্যই সে এসেছিল।"

"তুমি ডেকেছিলে?"

"কাইন্ড অফ। ছেলেটি আসলে স্মুদ টকার। সে আমাকে জিজ্ঞেস করল, আজ কি করছ?" আমি বললাম, কি আর করব! একা বাড়িতে বসে আছি। সে বলল, এমন দিনে বাড়িতে একা থাকতে নেই। আমি বললাম, আমি থাকি। সে বলল, আমি আসব। আমি বললাম, দরকার নেই। সে বলল, না না অমি আসবই। আমি বললাম, তুমি তোমার মা-বাবার সঙ্গে থাকো। সে বলল, বিকেল পর্যন্ত তাঁদের সঙ্গে কাটিয়ে সন্ধ্যায় তোমার সঙ্গে দেখা করব। আমি বললাম, আরে বাবা সন্ধ্যার পরেই তো দীপাবলীর সেলিব্রেশন হয়। সে বলল, তখনই একা থাকতে নেই। আমি বললাম..."

"বড্ড বোর করছ। কি করে জানলে ভদ্র বলো।"

"সে আমাদের বাড়ি এসে আমাকে একা দেখেও একটাও খারাপ কথা বলেনি। আমি ওকে আমার পোকিমনের সংগ্রহ দেখিয়েছি, রাবারের সংগ্রহ দেখিয়েছি, ফ্রেন্ডশিপ-ব্যান্ডের সংগ্রহ দেখিয়েছি..."

"কি শুধু সংগ্রহ সংগ্রহ করে চলেছ! আসল কথা বলো।"

"আমরা আমাদের স্কুলের ইংরেজি পাঠ্যবই নিয়েও আলোচনা করেছি, আমি ওকে আমাদের পরিবারের ফটো-অ্যালবাম দেখিয়েছি..."

"সে রাতে ছিল?"

"এত তাড়িতাড়ি থাকার অনুমতি দিতে পারি নাকি! তাছাড়া গতকাল বাবা এসে গিয়েছিল।"

"ও হ্যাঁ, রাজা দিল্লি থেকে পুনেতে গেছে।"

তিন-চারদিন আগে বাবা নাইরোবি থেকে দিল্লিতে গিয়েছিলেন। পুনেতে এক সপ্তাহ থেকে উনি কলকাতায় যাবেন। কলকাতা থেকে আবার দিল্লি। দিল্লি থেকে নাইরোবি। বাবার কাছে আভাসের আসার খবর ছিল না। বাবা আভাসের সম্পর্কে

কিছু জানতেন না। ঘরে কলিং বেলের আওয়াজ শুনে আভাস আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, ''কে এসেছে?''

''আমার বাবা।''

সে ভয় পেয়ে গিয়েছিল, ''আমি কি করি? কোথায় লুকোই?''

সাহস দিয়েছিলাম, ''কোথাও লুকোতে হবে না। আমার বাবা অতি আধুনিক।''

আমাদের পরিচয়ের দশদিন পরে অর্থাৎ দীপাবলীর আটদিন পরে 'হ্যালোইন ডে'তে আভাস আবার এল। বাবা ইতিমধ্যে কলকাতায়। আভাস আমাকে জিজ্ঞেস করল, ''আর ইউ লিভিং মী অন?'' অর্থাৎ ''তুমি আমার সঙ্গে সম্পর্ক পাকা করতে চাও?''

''এখনই কিছু বলা যাবে না। আরও কিছুদিন কথাবার্তা হোক।''

''নো প্রবলেম।''

আভাস আমাকে ডিনারে বাইরে নিয়ে গেল।

আরও কয়েকদিন সে আমাদের বাড়ি এল। আসে, কয়েক ঘণ্টা থাকে। তারপর চলে যায়। প্রতিদিনই মা ফোনে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, ''কি রে, তোদের মধ্যে কিছু হয়েছে নাকি?''

সেই প্রতিদিনের প্রথমদিন আমি বলেছি, ''সে শুধু আমাকে একটা হাগ করেছে।'' দ্বিতীয়দিন বলেছি, ''আমার কপালে একটা চুমু খেয়েছে।'' তৃতীয়দিন বলেছি, ''আমার গলাতে চুমু খেয়েছে।'' বলেই বলেছি, ''মাম্মা, আমি জানতামই না যে গলাতে চুমু খেলে এত ভাল লাগে।''

''তাই?''

''তুমি আবার ডাডিকে এসব কথা বলতে যেও না।''

''পাগল! ওই লোকটির সঙ্গে এসব কথা...!''

আভাস চিঞ্চওয়াডে থাকে, চিঞ্চওয়াডেই ইনফোওয়েব সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড নামে একটি সফটওয়্যার কম্পানিতে চাকরি করে। কম্পানিটি ছোট হলেও অনেক ইন্টারন্যাশনাল প্রোজেক্ট তার হাতে আছে, অনেক কিছু জানার সুযোগ আভাস পেয়েছে। ছয় মাসেই শিফটলিড হয়েছে। আমার সঙ্গে পরিচয়ের আগের দিনই সে রেড হ্যাট-এ ইন্টারভিউ দিয়ে এসেছে। অপেক্ষা করছে রেজাল্টের। বাড়ি থেকে আভাসের অফিস ইনফোওয়েব সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেডমাত্র তিন কিলোমিটার দূরে। আমার বাড়ি থেকে আভাসের বাড়ির দূরত্ব পনেরো কিলোমিটার এবং কম্পানি ইনফোওয়েব-এর দূরত্ব তেরো কিলোমিটার। আভাসের শিফটের সঙ্গে আমার শিফট কখনো মেলে, কখনো মেলে না। শিফট না খাপ খেলে সে এক ঘণ্টার জন্য হিঞ্জেওয়াড়ি ফেজ ওয়ানে আসে। আমার সঙ্গে দেখা করে, গল্প করে যায়। শিফট এক হলে এবং আমাদের দু'জনেরই আফটারনুন শিফট থাকলে সে তার গাড়িতে

আমাকে সোজা বাড়ি পৌঁছে দেয়, কিছুক্ষণ আমার সঙ্গে কাটিয়ে যায়। আভাস এবং আমার মর্নিং শিফট থাকলে সে উল্টো রাস্তা নেয়, তার বাড়ির দিকে। গাড়িতে দু'জনে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরি, উদ্দেশ্যহীন গল্প করি। সে আমাকে তার স্কুল, কলেজ, বন্ধু বান্ধবের বাড়ি দেখায়, তার নিজেরও বাড়ি দেখায়। সব দূর থেকে। দূর থেকে সে আমাকে মাতা বৈষ্ণ দেবীর মন্দির দেখিয়েছে। আমি বলেছি, ''আমার দেব-দেবীতে বিশ্বাস নেই।'' সে তখন আমাকে সায়েন্স এগজিবিশন সেন্টারের দিকে নিয়ে গেছে। মন্দিরের চাইতে এটা বরং ভাল ভেবে আমি চুপ থেকেছি। পরদিন দেখলাম সে আমাকে দূর থেকে আরেকটি সায়েন্স সেন্টার দেখালো—পিম্পড়ি-চিঞ্চওয়াড রিজিওন্যাল সায়েন্স সেন্টার। সেদিন আমি ওকে জানালাম যে আমার সায়েন্সেও বেশি আগ্রহ নেই। তার পরদিন সে দূর থেকে একটি হকি স্টেডিয়াম দেখায়। আমার মৌনতাকে আমার পছন্দ ভেবে পরদিন আবার অন্য স্টেডিয়ামের দিকে যাত্রা শুরু করার সুযোগ আমি তাকে দিতে চাই না। তাই বলি, ''খেলাধুলাও আমার পছন্দের জিনিস নয়। সে জিজ্ঞেস করে, ''পার্কে বসতে পছন্দ করো?''

''খুব কম।''

''কাছেই সাবিত্রীবাই ফুলে উদ্যান আছে। বসবে?''

''না।''

''বার্ড ভ্যালি উদ্যানও আছে। তুমি চাইলে সেখানেও নিয়ে যেতে পারি। বিভিন্ন রকমের পাখি দেখবে।''

জীবজন্তুর প্রতি আমার আসক্তি নিয়ন্ত্রণহীন। জীবজন্তুর তালিকায় সর্বাগ্রে আছে বেড়াল, তারপরে কুকুর, তারপরে পাখি। আমি বেশ কয়েকবার স্নেক পার্কে গেছি। নাম শুনে পার্কটি শুধু সাপে ভরা মনে হলেও সেখানে অনেক অন্যান্য জীবজন্তু এবং পাখিও আছে। বলি, ''আজ সময় নেই। কোন ছুটির দিনে যাব।''

''এখানে একটা চিড়িয়াখানাও আছে,'' আভাস বুঝি আমার মনের কথা বুঝতে পেরেছে।

আমি একই উত্তর দিই, ''অন্যদিন।''

অন্যদিন আমরা না স্নেক পার্কে গেলাম, না চিড়িয়াখানাতে। এখনও আমার সাপ্তাহিক ছুটি রবি ও সোমবারে। আভাসের শনি, রবি। পনেরোই আগস্টে ডিউটি করায় আমার একটা কম্প (কম্পেন্সেটরি) অফ পাওনা ছিল। মঙ্গলবারে আমি কম্প অফ নিই। আমরা বেরিয়ে পড়ি খাড়াডি হিলস-এর দিকে। আমি পরেছিলাম সাদা পোলকা ডটসওয়ালা হলুদ রঙের অফ-শোল্ডার ক্রপ-টপ এবং কালো রঙের অ্যাঙ্কল-লেন্থ স্কার্ট। পাহাড়ে চড়তে হবে বলে পায়ে আজ ছয় ইঞ্চি হিলের জায়গায় স্থান পেয়েছে দুই ইঞ্চির ন্যুড রঙের হিলস। আভাসের গায়ে ছিল নীল জিনস ও কমলা রঙের সোয়েটশার্ট। আমরা লোহেগাঁও এবং ওয়াঘলির সংযোগকারী রাস্তা নিয়েছি। রাস্তাটি আমার চেনা হলেও এখন একটু অচেনা লাগছে। বছর তিন-চার

এই পাশটাতে একদমই আসা হয়নি এবং আমার না আসার অবসরে অনেকদূর পর্যন্ত রাস্তা দু'পাশে দশ ফুট করে মোট কুড়ি ফুট বাড়ানো হয়েছে। রাস্তার প্রস্থ হয়েছে ষাট ফুট। দু'পাশে প্রচুর নতুন নতুন কন্সট্রাকশন। নতুন কন্সট্রাকশনের মধ্যে আছে মাল্টিস্টোরেড রেসিডেনশিয়াল এরিয়া, হোটেল, গেস্ট হাউজ এবং অফিস। কোথাও কোথাও খোলা রিজর্টও দেখা যাচ্ছে।

আজ আমি অনেক সেজেছি। মুখে অনেক মেক-আপ করেছি। ফাউন্ডেশন, ফেসপ্যাক, ব্লাশার লাগিয়েছি। চোখে পরেছি কাজল, চোখের পাতায় আইশ্যাডো, মাসকারা এবং অবশ্যই ঠোঁটে লিপস্টিক। আমার হাতের আঙ্গুলের মাথায় আছে আর্টিফিশিয়াল নখ। মেক-আপ-এর সময় আভাস তার রুমাল আমাকে ব্যবহার করতে দিয়েছিল। আমি তাতে সুন্দর গন্ধ পেয়েছিলাম। আভাসকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কীসের গন্ধ। সে বলছে, মোতি সাবানের।

"অসম্ভব। মোতি সাবানের সবকটি নমুনাই আমি ব্যবহার করেছি।"

"একটা শেভিং ক্রিমের সঙ্গে একটা নতুন স্যাম্পল ফ্রীতে পেয়েছিলাম।"

আভাস গাড়ি চালাতে চালাতে দু'পাশের প্রাকৃতিক এবং মানুষের দ্বারা সৃষ্ট দৃশ্য উপভোগ করছে এবং বলছে, "বাহ্ রাস্তাটা বেশ সুন্দর।" আমি এখন রাস্তা নিয়ে কোন কথা বলতে চাইছি না। লাভ, অনুভব অথবা সঞ্চয়ের সঙ্গে এলে রাস্তা নিয়ে কথা হতে পারত, আভাসের সঙ্গে আমার সম্পর্ক অনেকটা পুরনো হয়ে গেলেও কোন আপত্তি থাকত না। কিন্তু এই সামান্য ক'দিনের মেলামেশা, যে মেলামেশা আমার শরীরে মনে শিহরণ জাগাচ্ছে তাতে রাস্তা মাঝখানে আসতে পারে না। আমি আভাসের রুমালের গন্ধ শুঁকছি। বারবার আভাসের মুখের দিকে তাকানোর, ওর গালে বারবার হাত দেওয়ার লোভ সামলাতে পারছি না। তাতে তার গাড়ি চালানোতে মনোযোগ নষ্ট হচ্ছে। কৃত্রিম রাগ দেখিয়ে সে বলছে, "দাঁড়াও, বাড়ি গিয়ে মজা দেখাচ্ছি।"

কমলা রঙের শার্টের বিপরীতে আভাসের চোখের সবুজ রঙ আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সাদা কপালে বাদামি রেশমি চুলের গুচ্ছ গড়াগড়ি খাচ্ছে। বড্ড মায়াবি লাগছে ওকে দেখতে। ভারতের মধ্যবিত্তের গণ্ডির মধ্যেই আমাদের বসবাস। মধ্যবিত্ত গণ্ডির মধ্যে কিছু মধ্যবিত্ত নিজের চেষ্টায় সংস্কৃত করে নিয়েছে তাদের আচার, ব্যবহার, চলাফেরা, জীবনযাপন। আমিও বা আমরাও করেছি। ওই পর্যন্তই। তাই বলে আমাদের চেহারা থেকে মধ্যবিত্তের ছাপ একেবারে মুছে যায়নি। এছাড়া আমাদের এই সংস্কৃত মধ্যবিত্ত গণ্ডি পেরোলেই লাখ লাখ গরীবের কান্না বিদীর্ণ করবে আমার কান। তাদের অসংস্কৃত কথাবার্তা, হাঁক-ডাক চাবুক মারবে আমার আভিজাত্যকে। তবু আমার মনে হচ্ছে না আমি ভারতে আছি।

বাঁ দিকে ডায়মন্ড ওয়াটার পার্কের রাস্তা ফেলে আমরা এগিয়ে চলেছি ওয়াঘলির দিকে। আরও তিন কিলোমিটার যেতে হবে। তারপরে নগর রোড পাবো। নগর

রোডে উঠে ডান দিকে ঘুরে আরও পাঁচ কিলোমিটার গেলে আসবে খাড়াডি। সেখান থেকে আবার বাঁ দিক নিলে শহরের শেষ সীমানায় পৌঁছে যাব। সেখানে প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়।

সেই রাতে আভাস আমাকে আমার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে মুখে, গলায়, বুকে চুমু খেয়ে যায়। আমি চাইছিলাম না সে যাক। কিন্তু ওর নাইট শিফট। নাইট শিফটে সে অফিসে জেগে থাকে। আমি বাড়িতে তার রুমালের গন্ধ আরেকবার শুঁকে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। ভোরবেলায় স্বপ্ন দেখি। স্বপ্নে দেখি পাহাড়ের উপর থেকে আভাস এবং আমি দিনের ধূসর আলোয় পুরো শহরটাকে দেখছি। সূর্যাস্ত দেখছি। সূর্যাস্তের আগেই শহরে লাইট জ্বলতে শুরু করেছিল। অন্ধকার হতে না হতেই কৃত্রিম আলোতে ছেয়ে গেল শহর। মনে হল আকাশ থেকে লাখ লাখ তারা মাটিতে খসে পড়েছে। খসে পড়ে আমাদের সামনে তুলে ধরেছে শহরের মানচিত্র, স্পষ্ট করে দিয়েছে তারা তার সীমারেখা।

পুনে, যাকে বলা হয় মহারাষ্ট্রের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, যা দ্য অক্সফোর্ড অফ দ্য ইস্ট নামেও খ্যাত ডেকান প্লাটোর পশ্চিম প্রান্তঘেঁষা একটি শহর। সমুদ্রতল থেকে শহরের উচ্চতা পাঁচশো ষাট মিটার অর্থাৎ এক হাজার আটশো সাঁইত্রিশ ফুট। উচ্চতার জন্য এখানকার আবহওয়াও মনোরম। চূড়ান্ত গ্রীষ্মের মাসগুলিতে দৈনিক গড় সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে ৩৭ এবং ২৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। চূড়ান্ত শীতের মাসে সেই তাপামাত্রা নেমে হয় ৩০ এবং ১২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। শহরের বাইরে একশো কিলোমিটার পরিধির মধ্যে আছে লোনাভালা, খান্ডালা, পাঁচগনি, লাভাসা, তামিনি ঘাট, দারশেট হিল স্টেশন। শহরের মধ্যে আছে পার্বতী পাহাড়, তালজাই, বানের, বেতাল এবং আরও কয়েকটি পাহাড়। সবই আমার ঘোরা। সবই আমার ভাল লাগার জায়গা। পুনে শহরটাকেই আমি ভালবাসি। শহরের বাইরের প্রকৃতি তো বটেই, মনুষ্যতৈরি শহরের অগণিত অট্টালিকা, বাড়ি-ঘর এবং লোকজনের মাঝখানে লুকিয়ে থাকা প্রকৃতিও আমাকে অনবরত হাতছানি দিয়ে ডাকে। কৃত্রিম অকৃত্রিম দুইরকম পরিবেশই আমাকে আকর্ষণ করে। কখনো পেছনে হেঁটে গিয়ে আদিমতার স্বাদ নিতে ছুটি, কখনো সামনে ছুটি আধুনিকতার স্বাদ নিতে।

আমার ভালবাসাও হবে আদিমতা এবং আধুনিকতার সংমিশ্রণ। সমসত্ত্ব মিশ্রণ। আদিমতা হবে শরীরকেন্দ্রিক। আধুনিকতা মনকেন্দ্রিক। শরীরের ভালবাসা বিনা মনের ভালবাসা সম্পূর্ণ হয় না। আবার মনের ভালবাসা বিনা শরীরের ভালবাসারও কোন অর্থ না থাকে, স্থায়িত্ব লাভ করে না সম্পর্ক। পৃথিবী-পৃষ্ঠে আকাশের তারার মত লাখ লাখ কৃত্রিম আলোর মাঝখানে দাঁড়িয়ে ভাবে বিভোর হয়ে আভাস আমাকে তার ডানহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে। আমি ওর কমলা রঙের সোয়েটশার্ট দিয়ে ঢাকা চওড়া বুকে মাথা রাখি। শার্টের আস্তরণ ভেদ করে, ত্বক-পেশি-বক্ষপিঞ্জরের বাধা

ভেদ করে তার হৃৎপিণ্ডের ধুক-পুক আওয়াজ শোনার চেষ্টা করি। আভাস হয়ত তা বোঝে। বলে, ''আজ আমরা ডিনার করে ফিরব।''

''আমার একটা ভীষণ প্রিয় জায়গা আছে। একটা কোরিয়ান রেস্টরেন্ট, ক্যাফে মারু।''

''কোথায়?''

''আউদ্ধে।''

''চলো। সেখানেই যাব।''

*****

সকালে আমার বাড়িতে সায়লির আগমণ। হাতে রেডমি কে টুয়েন্টি নতুন মোবাইল। দাদা কিনে দিয়েছে। সায়লির দাদা আড়াই বছর হল চাকরি করছে। সেও ইঞ্জিনিয়ার। এম আই টি থেকে পাশ করেছে। দ্বিতীয় মাসের স্যালারি পেয়ে সে সায়লিকে চৌদ্দ হাজার টাকা দিয়ে আরেকটা মোবাইল কিনে দিয়েছিল। তখন সায়লি কলেজে পড়ত। এবার লাফিয়ে দু'গুণ হল মোবাইলের দাম। আটাশ হাজার টাকা। প্রথমবার দাদা খুশি হয়েছিল নিজে চাকরি পেয়ে। এবার খুশি সায়লি পুনেতে পোস্টিং নিয়েছে বলে। দাদা যতবার খুশি হয় ততবার সায়লির একটা দামি জিনিসের প্রাপ্তিযোগ ঘটে। আমি ওকে আভাসের রুমালের গন্ধ শোঁকাই। সে বলে, ''আমিও কিনব মোতি সাবান। মোতি সাবানে রুমাল কেচে সেই গন্ধ বিষ্ণুকে শোঁকাব। গন্ধ শুঁকে ওর মনে গভীর ভালবাসা জাগবে। আর তু তেরা ম্যায় মেরা করবে না।''

সে আমাকে দু'টো খবর দেয়। প্রথমটি হল, বিষ্ণু পুনেতে পোস্টিং নেবে। দ্বিতীয়টি, সাই পুনেতে ঘুরতে আসবে। খুশির শেষ নেই তার।

বিষ্ণু পুনের ছেলে। শুধু পুনের ছেলে বললে কম বলা হয়। বিষ্ণুর বাড়ি সায়লির বাড়ির কাছেই। পুনেতে পোস্টিং সে নিতেই পারে। সায়লি আসার পর এত তাড়াতাড়ি পুনেতে চলে আসার ইচ্ছে যে তার সায়লির জন্যই হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। সাইও যে পুনেতে আসবে একমাত্র তারই জন্য তাতেও কোন সন্দেহ নেই। দু'টো খবরই আমার কাছে অতি গুরুত্বপূর্ণ কারণ তারা আমার চোখের দৃষ্টি ঝাপসা করে দিয়েছে। সায়লি আমার এত কাছে দাঁড়িয়ে আছে তবু আমি তাকে ভালমত চিনতেই পারছি না। সায়লিকে চেনার জন্য আমি আমার চোখে দূরবীনের লেন্স বসিয়েছি। বসিয়ে দেখছি কোন লাভ হল না। সে আরও দূরে চলে গেছে, চেনা আরও মুশকিল হচ্ছে। সেই লেন্স দিয়ে বরং বিষ্ণু এবং সাই-এর চেহারা আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আমি তাদের মনও পড়তে পারছি। বিষ্ণু এবং সাই সায়লির মনের খবর না রেখে তার সঙ্গে সম্পর্ক পাকা করার ইচ্ছে নিয়ে ধেয়ে আসছে।

সায়লিকে আমার ভোরের স্বপ্নের কথা বলি। সে কথা আসলে সত্যি কথা, স্বপ্ন হয়ে আমার চোখে এসেছে, ক্যাফে মারুতে আভাস এবং আমি মুখোমুখি বসে। ক্যাফে মারু রেস্টরেন্ট-এর প্রথম অভিজ্ঞতা লাভই আমায় দিয়েছে। সেখানে আমায়

চিকেন গিমবাপ খাইয়েছে। চিকেন গিমবাপ জাপানি সুশি রোলের মত। লাভের দেওয়া অভিজ্ঞতার স্বাদ পরে আমি সঞ্জয়, অনুরাগ, মাকে এবং সায়লিকেও দিয়েছি। এখন আভাস পাবে সেই চিকেন গিমবাপ খাওয়ার অভিজ্ঞতা। দেখি আভাস চিকেন বিবিমবাপও অর্ডার করল। বিবিমবাপ ভাত, অমলেট, সী উইড এবং অন্যান্য সবজি একত্রে মিশিয়ে বানানো। সঙ্গে একটা সস। কীসের জানি না। আভাস তার নাম দিয়েছে বিবিমবাপ স্পেশাল সস। এছাড়াও আছে কিমচি নামে মুলো এবং বাঁধাকপি ফারমান্ট করে বানানো আচার। সেটা আমরা গিমবাপের সঙ্গে মিশিয়ে খেয়েছি। খেতে খেতে ভেবেছি আমরা দু'জন আমাদের পুরনো প্রেমিক-প্রেমিকার দুঃখ ভুলে কি সুন্দর এক হয়ে যেতে পারছি।

বিষ্ণু পুনেতে এসেছে। সায়লি আশা রাখে বিষ্ণুও নিশ্চয়ই তাকে ক্যাফে মারুতে নিয়ে যাবে। সে অনেক খুঁজে বাজার থেকে একটা নতুন মোতি সাবান কিনে নিয়ে এল। কিন্তু তা দিয়ে রুমাল কেচে যে গন্ধ পেল তা ওই মোতি সাবানের গন্ধ থেকে একদমই আলাদা নয়। সেই গন্ধের সঙ্গে আভাসের রুমালের গন্ধ মোটেও মিলল না। আভাসকে ফোন করলাম, ''ঠিক করে বলো ওটা কীসের গন্ধ।'' সে টেনে টেনে হাসল, ''ওটা আসলে একটা আতরের গন্ধ।''

''মিথ্যে বললে কেন?''

''ইচ্ছে হয়েছিল।''

''ওই সাবানটা খুঁজে পেতে সায়লির কত হয়রানি হল জানো?''

''কি হয়রানি হয়েছে?''

''থাক আর শুনে লাভ নেই। আতরের নাম কি ছিল?''

''মনে নেই। মনে নেই বলে আমার নিজেরই হয়রানি হচ্ছে। ওটা শেষ হয়ে গেছে। নতুন একটা কিনতে পারছি না।''

এদিকে বিষ্ণুর মধ্যেও সায়লি কোন পরিবর্তন দেখল না। একদিন কাছেরই একটা ফুচকার দোকানে দশ দশ কুড়ি টাকার ফুচকা খেয়ে মুখ মুছতে মুছতে সায়লি বিষ্ণুকে বলল, ''টাকাটা দিয়ে দে।'' বিষ্ণু বলল, ''তুই দে। আজকে আমার পকেট খালি।''

সায়লি বলল, ''একটু আগেই আমি তোর পকেটে একটা পাঁচশো টাকার নোট দেখেছি।''

''ওই একটা নোটই আছে। সেটা এখন ভাঙ্গাতে চাইছি না।''

''খোলাখুলি বল না দেওয়ার দেওয়ার ইচ্ছে নেই!''

সায়লি ভাবে যখন উপার্জন ছিল না তখন এই ছেলেটি ওকে টেডি কিনে দিয়েছে। এখন উপার্জন আছে অথচ তাকে ভালবাসি বলেও তার জন্য সামান্য খরচ করতে চাইছে না। দুর্বোধ্য মানসিকতা। এর কাছে কি আর নিরাপত্তা সে পাবে! এক খাটে দু'জনে শোবে বলে সেটা কেনার জন্যও টাকা ভাগাভাগি করবে!

অশান্তির শেষ নেই তার। সে মাঝে মাঝেই আমার কাছে আসে। বিষ্ণুর কথা বলে। বলে, সাই-ই মনে হয় ঠিক ছিল। আমি পুনেতে চলে এসে আরেকটা ভুল করেছি। এখানে এসেও টাকা বাঁচাতে পারছি না। মা প্রায়ই আমাকে নিয়ে বড় বাজারে যাচ্ছেন। একগাদা বাজার করে বলছেন, টাকা দে।

আমার মনে সায়লির মত অসুখ নেই। আমার মাথায় কোন এডুকেশন লোনের বোঝা নেই। আমি আগেও নিজের অর্থাৎ মা-এর বাড়িতে ছিলাম এবং এখনও আছি। একটা ঘরকে আত্মতৃপ্তি সহকারে সাজিয়ে একেবারে নিজের করে নিয়েছি। সেই ঘরে কখনই অনুমতি বিনা ঢোকার অধিকার আমি বাড়ির মালিককেও দিই না। আমাকে কোনওদিনও বাড়ি ভাড়া বইতে হয়নি। উল্টে যখন-তখন মায়ের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য নিয়েছি। ''মোবাইল কিনব টাকা দাও, ক্যামের কিনব টাকা দাও, পরে শোধ দিয়ে দেব।'' মা টাকা দিয়ে বলেছেন, ''শোধ দিতে হবে না।'' আমি মায়ের স্কুটি এবং গাড়ি ব্যবহার করি। সায়লি হেঁটে হেঁটে অথবা অটোতে অথবা বাসে করে তার কাজ সারে। বাবার কাছ থেকে প্রতি মাসে দু'শো ডলার আমার পাওনা থাকে। এত সাহায্য পেয়েও আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি না।

নিজের দুঃখের কাহিনী শুনিয়ে সায়লি আমার প্রেমের সর্বশেষ খবর চায়, ''কি করলি গত সপ্তাহে?''

''আমাদের দু'জনের মর্নিং শিফট ছিল। এক ঘণ্টার ব্রেক-এ আমরা একসঙ্গে ব্রেকফাস্ট করেছি।''

''কোথায়?''

''কিউবিকলের সাধারণ ক্যান্টিনে।''

''কি খেলি?''

''পোহা, ব্রেড-প্যাটিস, উপমা, বড়া, ইডলি, দোসা, রুটি-সবজি, আলু-পরোটা, পনির-পরোটা যা যা পাওয়া যায় সব।''

''টাকা কে দেয়?''

''আভাস।''

''বিষ্ণুটা কেন যে এমন কৃপণ হল! তাও মনে একটু হলেও শান্তি পাচ্ছি এই ভেবে যে তুই ভাল বয়ফ্রেন্ড পেয়েছিস।''

আমার এবং আভাসের মধ্যে সেই চূড়ান্ত জিনিসটা এখনও হয়নি। যা যা হয়েছে তার ভিত্তিতে আভাসকে শুধুই বন্ধু বলে ব্যাখ্যা করলে 'বন্ধু' শব্দের অবমাননা হয়। আভাসকে বয়ফ্রেন্ডই বলতে হবে। সন্দীপের সঙ্গে সেপারেশন অ্যানিভার্সরির দিনে শরীরে ব্যথা এবং নাইট ডিউটির জোরে মুখে গজিয়ে ওঠা তিন চারটে ব্রণ নিয়ে সায়লিকে টপকে হঠাৎ করে আমি তাকে পেয়েছি এবং সায়লির জিভ দিয়ে যেখানে আমার ভালবাসার স্বাদ পাওয়ার কথা সেখানে সায়লি আমার জিভ দিয়ে ভালবাসার স্বাদ পাওয়ার চেষ্টা করছে। সঙ্গে এটাও বলছে, ''সাইকে ফোন করে দেখি কবে সে

পুনেতে আসছে।"

কয়েকদিন পরে সায়লি আবার জিজ্ঞেস করে, "তোর খবর কি?"

"এখন আমার আফটারনুন শিফট চলছে। লোকা এখন প্রতি সপ্তাহে আমার শিফট বদলে ফেলছে।"

"আরে আমি শুধু তোর খবর জানতে চাইনি। তোর এবং আভাসের খবর বল।"

"সেটাই বলছি। আমার তাতে সুবিধেই হয়েছে। আভাসেরও আফটারনুন শিফট। আমরা প্রতিদিন একসঙ্গে লাঞ্চ করছি।"

"কি খাচ্ছিস?"

"কখনো পাঞ্জাবি ডিশ, কখনো সাউথ-ইন্ডিয়ান, কখনো কন্টিনেন্টাল, কখনো বাঙালি।"

"বাহ্, ক্যান্টিনে বাঙালি খাবারও পাওয়া যায়?"

"ইদানীং রাখছে দেখছি।"

"বিল কি আভাসই পে করছে?"

"হ্যাঁ।"

"ইশ্... !"

"ইশ্ কেন?"

"বিফটা যদি...।"

আমি জানি সায়লির না বলা কথায় কি কথা আছে।

বলি, "আভাস তু তেরা ম্যায় মেরা করে চলে না। ডিউটির পরে সে আমাকে গাড়ি করে বাড়িতে পৌঁছে দেয়।"

"গাড়ির পেট্রোল নিশ্চয় সে-ই কেনে?"

"হ্যাঁ। আমাকে বাড়িতে পৌঁছতেই মাসে তার ছয় হাজার টাকা খরচা হয়।"

মাত্র একমাস দশদিন হল আমাদের মেলামেশা। কিন্তু আমি সায়লিকে সাধারণ বর্তমান কাল অর্থাৎ প্রেজেন্ট ইন্ডেফিনিট টেন্স-এ এমনভাবে বলি যেন মনে হয় প্রতি মাসেই।

আমাদের আফটারনুন ডিউটির পরে ডিনার করে আমাকে বাড়িতে পৌঁছতে এসে আভাস আমার সঙ্গে একরাত কাটালো। মাকে অনেক অপছন্দ করলেও বুঝি একমাত্র সায়লি ছাড়া পৃথিবীতে ওই একটিমাত্র মানুষের কাছেই আমি সব কথা অনেকটা অকপটে বলতে পারি। তার জন্য অবশ্যই শর্ত থাকে। শর্ত হল মাকে আমার সঙ্গে সব ব্যাপারে সহমত হয়ে চলতে হবে, আমাকে এতটাই খুশি রাখতে হবে যে আমি যেন নিজে থেকেই তাঁর সঙ্গে এসব গল্প করার আগ্রহ অনুভব করি। সেই শর্ত মাকে খুলে বলা হয়নি। ব্যবহারে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। আভাসের আমাদের বাড়িতে প্রথম রাত্রিযাপনের পরদিন সকালে মা আবার জিজ্ঞেস করেন,

"কি রে, কিছু হল নাকি?"

"না, আমরা শুধু জড়িয়ে ধরে শুয়েছিলাম।"

মা জানেন আমি তাঁকে এসব ব্যাপারে মিথ্যে বলি না। তবু তাঁর গলায় অবিশ্বাসের স্বর, "সত্যি? আর কিছু হয়নি?"

আমি রেগে যাই, "এটাই কি ভাল না সে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পেরেছে?"

"নিশ্চয় ভাল।"

আফটারনুন শিফটের প্রায় প্রতি রাতেই আভাস আমার সঙ্গে থাকতে লাগল। রাতে আসে, সকালে চলে যায়। রাতে থাকতে থাকতে এক রাতে সেই ভদ্র ছেলে অভদ্র হল। আমি তাকে আমার কাছে অভদ্র হতে দিলাম। সেই কথাও আমি মাকে জানালাম। মা নিশ্চিন্ত হলেন ভেবে আমি তাহলে একজন মনের মানুষ পেয়েছি।

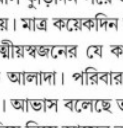

আভাসের সঙ্গে পরিচয়ের একমাস কুড়িদিন পরে আমি জেনেছি আভাসের বাড়ির আর্থিক অবস্থা বিশেষ সচ্ছল নয়। মাত্র কয়েকদিন আগেই খাড়াডি পাহাড়ে যেতে যেতে তাদের বাড়ির এবং আত্মীয়স্বজনের যে কাল্পনিক চিত্র আমি দেখেছিলাম বাস্তব চিত্র তার থেকে অনেক আলাদা। পরিবার সংস্কৃত কিন্তু নিম্ন মধ্যবিত্তের সীমানা থেকে বেশি উপরে নয়। আভাস বলেছে তার বাবা ডাক্তার। তিনি যত না রোগীকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে নিয়ে আসেন তার চেয়ে বেশিবার নিজে বেঁচে আসেন। ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু, টাইফয়েড, সোয়াইন ফ্লু, কালাজ্বর, দুনিয়ায় যতরকমের জ্বর আছে তাঁকে আক্রমণ করেছে। জন্ডিস হয়েছে। কানের পর্দায় ইনফেকশন হয়েছে। কোলনে ইনফেকশন হয়েছে। দু'বার অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। পায়ে রড বসানো আছে। হাতে ব্যথা, পায়ে ব্যথা, পেটে ব্যথা, মাথায় ব্যথা লেগেই আছে। তিনি কোন হসপিটালে চাকরি করেন না। ভোসরিতে তাঁর নিজের ক্লিনিক। কিন্তু ক্লিনিকে তাঁর উপস্থিতি অতি অনিয়মিত। উপার্জনও অনিয়মিত। উপার্জনের তুলনায় খরচা অধিক। বাড়িতে চারজন স্থায়ী সদস্য—মা, বাবা এবং দুই ভাইবোন। কিন্তু বছরের অধিকাংশ সময় দিদা বা ঠাকুমা জাতীয় কেউ সঙ্গে থাকেন। এছাড়াও মামা-মামী, পিসি-পিসা, কাকা-কাকী, মাসি-মেসোর অনবরত অবাধ যাতায়াত। তাঁর অনেক আত্মীয়। জমির টাইটেল ক্লিয়ার না থাকায় আভাসের বাবার ফ্ল্যাট নিয়েও ঝামেলা হয়েছে। সেখানেও অনেক টাকা ঢালতে হয়েছে। এত কিছু করেও বছর তিনেক আগে একটা নতুন ওয়াগনর কিনেছেন বাবা। সংসারের খরচ আভাসের ওপর।

তার বাড়ির অবস্থা জেনে খারাপ লাগে। এক সন্ধেয় সে আমাকে ছাড়তে এলে আমি কিছুক্ষণের জন্য তাকে আটকে রাখি। তার সঙ্গে হিসেবে বসি। বদ্ধপরিকর

হই খরচা কমাতে।

আমরা ১০০০ টাকা দিয়ে জোমাটোর অ্যানুয়াল মেম্বারশিপ নিই। দু'জনের জন্য একটা মেম্বারশিপই যথেষ্ট। অ্যানুয়াল মেম্বারশিপ আসলে ১৮০০ টাকার ছিল। দীপাবলীর জন্য ১৮ শতাংশ ডিসকাউন্ট অফার থাকায় সস্তায় পেয়েছি। জোমাটো যেসব রেস্টরেন্ট-এর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে কাজ করছে তার লিস্ট আমাদের দেয়। আমরা সেইসব রেস্টরেন্ট-এ এক হাজার টাকার উপর যেন বিল না ওঠে সেকথা মাথায় রেখে যা খুশি অর্ডার করি এবং তাতে সর্বাধিক দামের দ্বিতীয় ডিশ ফ্রীতে পাই। অনেক সময় খাওয়ার খরচা আমি বহন করি। প্রতিদিনের টিফিন আভাস বাড়ি থেকেই নিয়ে আসে।

আভাসকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ''তোমার মা-বাবা জানতে চাইছেন না তুমি প্রায়ই রাতে কোথায় ডুব মারছ?''

সে বলেছে, ''মা জানতে চেয়েছেন।''

''কি বলেছ?''

''নাইট ডিউটি আছে।''

''একদিনই জিজ্ঞেস করছেন?''

''না, প্রতিদিন।''

''প্রতিদিন একই কথা বলেছ?''

''হ্যাঁ।''

''শুনে উনি কিছু বলেননি?''

''বলেছেন।''

এই এক ছেলে। কম কথা বলারও সীমা আছে! ''বলো না কি বলেছেন।''

মা বলেছেন, ''তোমার রাতে বাইরে থাকাটা ঠিক লাগছে না।''

''তুমি কি উত্তর দিলে?''

''আমার ঠিকই লাগছে।''

আমি হাসি। ''যতই বলো ঠিক লাগছে, তোমার এক বাহানা বেশিদিন চলবে না।''

আভাস তার পরের সাতদিন মাকে ওভারটাইম করতে যাচ্ছি বলল এবং মায়ের মনে বাসাবাঁধা সন্দেহ বয়ে নিয়ে এসে আমাকে জিজ্ঞেস করল, ''এবার কি বাহানা দিই?''

''বলো অফিসে একটা সাতদিনের সেমিনার আছে।''

''কীসের সেমিনার?''

''ইঞ্জিনিয়ারিং ফিল্ডের এক্সপার্টরা লেকচার দিতে আসবেন। তাদের মূল্যবান অভিজ্ঞতা এবং ভাবনার কথা আমাদের বলবেন।''

''রাতের বেলায় সেমিনার!''

"বলো, অনেক বড় সেমিনার। ওয়ার্কশপেরও ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তাই রাত জেগে অফিসের ভেতরের সেট-আপ পাল্টাতে হবে।"

আভাসের মায়ের তবু সন্দেহ যায় না। উনি কাল্পনিক সেমিনারের সপ্তাহকে নির্বিঘ্নে পেরিয়ে যেতে দিয়ে বললেন, "মেয়েটিকে নিয়ে এস।"

*****

সায়লির ব্যাপারটা অন্যদিকে এগিয়েছে। সে আমাকে বলে, "তোর ভাগ্য কত ভাল। যেমন তোর বাড়ির লোক, তেমনই আভাসেরও বাড়ির লোক। সবাই উদার মনের। আমাকে দেখ, সাইকে নিয়ে অয়ও রুম বুক করতে হল।" আমি অবাক। সে বাড়ি থেকে বাইরে রাত কাটানোর অনুমতি পেল কি করে! সে বলল, "আরে, আমি বলেছি তোর বাড়িতে থাকতে আসছি।"

ভুলে গিয়েছিলাম সায়লি মাঝে মাঝে আমার বাড়িতে রাত কাটাতে অভ্যস্ত। এমন অভ্যেস আমি তৈরি করতে পারিনি। মা আমাকে যে স্বাধীনতা দিয়েছেন সেই স্বাধীনতা সায়লি তার মা-বাবার কাছে পায়নি। আবার বান্ধবীর বাড়িতে রাত কাটানোর যে স্বাধীনতা সায়লি তার মা-বাবার কাছ থেকে পেয়েছে মা আমাকে ছেড়ে রাতে একা থাকতে পারতেন না বলে সেই স্বাধীনতা আমার ছিল না। এমন পাওয়া না পাওয়ার মধ্যে দিয়ে আমরা প্রায় একই রাস্তায় চলি তবু সময়বিশেষে মায়ের প্রতি আমার অভিযোগের পাহাড় তৈরি হয়ে যায়। অভিযোগের পাহাড়ে পিষ্ট হয়ে নিজেকে দুনিয়ার সবথেকে বড় অভাগী ভাবতে আমার একটুকু দ্বিধা হয় না। চোখের জল ফেলতেও কার্পণ্য বোধ করি না।

মায়ের বছরের অনেকটা সময় কলকাতায় থাকার সময়ও মা আমাকে রাতে সায়লির বাড়িতে থাকার অনুমতি দিতেন না। বলতেন ভয় করে। ভয়ের কারণ খুলে বলতেন না। অথচ তখনও সায়লির মা সায়লিকে রাতে নিশ্চিন্তে আমাদের বাড়িতে থাকতে দিতেন। আমাদের সোসাইটির কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থার উপর তাঁর ভরসা ছিল। মোট তিনটে বিল্ডিং সোসাইটিতে—এ, বি এবং সি। মেন গেট থেকে পেছনের প্রাচীর পর্যন্ত একটার পর একটা। আমাদের 'সি' বিল্ডিং সর্বশেষ। প্রত্যেকটা বিল্ডিং-এর আলাদা কমিটি। মেন গেট-এর চেকিং কাউন্টারে চব্বিশ ঘণ্টায় চারজন পাহারাদার। এছাড়াও এ এবং বি বিল্ডিং-এ দিন এবং রাতে একজন করে মোট চারজন এবং আমাদের সি বিল্ডিং-এর দুটো উইং-এ একজন করে দিনে দু'জন এবং রাতে দু'জন পাহারাদার। দিনের বেলা সকাল সাতটা থেকে সন্ধে সাতটা পর্যন্ত এবং রাতের বেলা সন্ধে সাতটা থেকে সকাল সাতটা পর্যন্ত। ভিজিটরস' রেজিস্টার-এ নাম, মোবাইল নম্বর, কোথায় থেকে এসেছে, কখন এসেছে, কার সঙ্গে দেখা করতে চায় এবং কি উদ্দেশ্য না লিখে কেউ সোজা সিঁড়ি বেয়ে বা লিফটে চড়ে উপরে আসতে পারে না। কখনো আমি মায়ের স্কুটার নিয়ে সায়লির বাড়িতে যাই, সেখানে খেয়ে দেয়ে, আড্ডা দিয়ে ওকে নিয়ে চলে আসি। কখনো ওর দাদা ওকে আমাদের

সোসাইটিতে পৌঁছে দিয়ে যায়। সকালে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজটাও মোটামুটিভাবে দাদাই করে।

আমার এবং আভাসের সম্পর্ক শান্ত সায়লিকে বড় অশান্ত করে দিয়েছিল। তাই সে বেপরোয়া হয়ে পড়েছে। কিন্তু কথা হচ্ছে সায়লি যার বাড়িতে থাকবে বলে হোটেলে রইল সে-ই জানল না। বলি, ''স্পর্ধার বলিহারি তোর! যদি রাতে মা ফোনে তোকে না পেয়ে আমায় ফোন করতেন তাহলে কি হত?''

''আরে, আমার তো সেকথা মাথাতেই আসেনি!''

তার পরেও আমার আরও প্রশ্ন থেকে যায়।

বেশ চলছিল আমার বাড়িতে আমার বিছানায় সায়লির স্লিপওভার। এক রাতে অবিরাম ঘড়ঘড় আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল। দেখলাম সায়লি নাক ডাকছে। ওকে তৎক্ষণাৎ জাগিয়ে দিলাম। সে ধড়ফড় করে উঠল, ''তাই নাকি!'' বলে আবার ঘুমিয়েও পড়ল। আমিও ঘুমোলাম। কিছুক্ষণ পরে আবার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হল। সে বলল, ''আর হবে না।'' কিন্তু প্রতিশ্রুতি রাখতে পারল না। এক রাতেই মেয়ে হয়ে সায়লি নাক ডাকার বদভ্যাস তৈরি করে ফেলল। সে ঘুমোচ্ছে—ঘড়ঘড় ঘড়ঘড়। আমি পড়ে আছি পাশে। জেগে। ঘরের তাপমাত্রা আরামদায়ক—না বেশি ঠাণ্ডা, না বেশি গরম। সামনের বহুতল বিল্ডিং-এর ল্যাম্পপোস্ট থেকে খেজুর গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে পালিয়ে আসা আলো আমার বিছানায় এসে পড়েছে। আমার শরীরের উপর পড়েছে। আলতোভাবে স্পর্শ করে আমায় ঘুম পাড়ানোর চেষ্টা করছে। চেষ্টা করে ব্যর্থ হচ্ছে।

সায়লি পরের রাতেও এসেছিল। আগের রাতের তার নাক ডাকার ব্যাপারটাকে শুধুমাত্র এক দুঃস্বপ্ন ভেবে আমি উড়িয়ে দিতে চেয়েছিলাম। ভেবেছিলাম আজ ভাল স্বপ্ন দেখব। গভীর ঘুমের ঘোরে থাকব। সকাল দশটায় সুশীল আসবে। ফটোশুট আছে। আমাকে আটটা থেকে মেক-আপ শুরু করতে হবে। তার আগে এক ঘণ্টার ওয়ার্কআউট। সুতরাং আমাকে বিছানা ছাড়তে হবে সাতটায়। মোবাইলে অ্যালার্ম লাগিয়ে রেখেছিলাম।

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। স্বপ্নের রাজ্যে বিচরণও শুরু হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ শুনি ঘড়ঘড় ঘড়ঘড়। সায়লির ঘাড়ে টোকা মারতেই তার নাকের শব্দদূষণ ক্ষমতা লোপ পেল। সে পাশ ফিরল। দু'মিনিট অতিক্রান্ত হল কি হল না আবার শক্তিশালী হয়ে পড়ল নাক। একই কম্পাঙ্ক নিয়ে ফিরে এল সেই শব্দ। যতবারই তাকে নড়িয়ে দিই না কেন নিঃস্তব্ধতা দুই মিনিটের বেশি লম্বা হয় না এবং এত স্বল্পস্থায়ী অবসরে আমার চোখে ঘুম আসে না।

সময় দেখলাম। রাত দুটো। ফটোশুটের কথা ভেবে মরিয়া হয়ে উঠলাম। পাঠিয়ে দিলাম ওকে ড্রয়িংরুমের সোফায়। সায়লির অবশ্য তাতে সুবিধেই হয়েছে। কোনরকম

অন্তরায় ছাড়া নাক ডেকে ঘুমতে পেরেছে। সকাল সাতটার অ্যালার্মে আমার ঘুম ভাঙল। চোখের পাতা ভারী, ব্যথা সারা অঙ্গে, মেজাজ গেছে তুঙ্গে। কিছুই ফটোশুটের অনুকূল নয়। সায়লি গেল। আমি সিদ্ধান্ত নিলাম এবার রাতে আমার বাড়িতে এলে ঘুমনোর জন্য ওকে আমার ঘরে প্রবেশাধিকার দেওয়া হবে না।

সায়লিকে জিজ্ঞেস করলাম, "বয়ফ্রেন্ড-এর সঙ্গে ঘুমোলি কি করে?"

সাইকে এখন সায়লির বয়ফ্রেন্ড বলতেই হবে, যেহেতু তার সঙ্গে সে রাত কাটিয়েছে।

"কেন?"

"তুই নাক ডাকাতে ছেলেদেরও হার মানায়ে দিয়েছিস। ভালবাসা অন্ধ হতে পারে কিন্তু কালা হতে পারে না।"

সায়লি হাসে, "আরে, ঘুমনোর সময় পেলাম কোথায়!" সে বলে, সারারাত তাদের চেষ্টা করতেই কেটে গেছে। তাই 'ডিড ইউ কাম?' প্রশ্নটা তার ক্ষেত্রে আপাতত প্রযোজ্য হল না। একমাস পরে নাকি সাই আবার আসবে। তখনকার জন্য তুলে রাখি প্রশ্ন। কিন্তু আফসোস আমার অন্য। "আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলি না!"

আমাকে তৈরি হতে হবে। আজ সোমবার, আমার সাপ্তাহিক ছুটির দিন। প্রথমবার আভাসের বাড়ি যাব। দুপুর দুটো। তিনটেই আভাস গাড়ি নিয়ে আমাকে নিতে আসবে। যেতে লাগবে এক ঘণ্টা। অর্থাৎ আভাসের বাড়িতে আমি চারটেতে পৌঁছব। সায়লিকে জিজ্ঞেস করি, "কি পরব?"

"তোর একটা হাঁটু পর্যন্ত লম্বা ওয়ান-পিস ছিল যে!"

"কোথায় রেখেছি মনে পড়ছে না।"

"দাঁড়া, আমি খুঁজে দিচ্ছি।"

ঘরের অবস্থা করুণ। অনেকদিন ধরেই গোছানোর সময় পাচ্ছি না। সায়লি দেখল সাদা এম ডি এইচ ক্লসেট-এ সেটা নেই। ক্লসেটের খোলা অংশে যেখানে উপরের রড থেকে লম্বা লম্বা টপ, ফ্রক, জ্যাকেট এবং ব্লেজার ঝুলছে সেখানেও নেই। নিচের রড থেকে ঝুলতে থাকা ছোট ছোট টপ এবং স্কার্টগুলো এলোমেলো করল সে। ভাবল দু'ভাঁজ হয়ে তার মধ্যে ঢুকে যেতেই পারে ওয়ান-পিস। কিন্তু সেখানেও পাওয়া গেল না। ভেতরের শেলফ থেকে প্যাকেটবন্ধ জামাকাপড়গুলো বের করে নিচে ফেলল। নাহ্, কোথায় সেটা! দুটো ক্লসেটের নিচের দিকে দুই ড্রয়ারে খোঁজা হল এই ভেবে ওয়ান-পিসটা ভাঁজ করলে আয়তনে খুব ছোট হয়ে যায়, সুতরাং কি জানি অন্তর্বাস-এর মধ্যেও লুকিয়ে থাকতে পারে। সেই চেষ্টাও ব্যর্থ হল। আলনাতে খুঁজেও কোন লাভ হল না। আশাহত হয়ে সায়লি শেষপর্যন্ত জুতোর ক্লসেট খুলল।

"রিলি! একি!"

"ওহো, আমিও এটাই পরব বলে ঠিক করেছিলাম। সেদিন এর সঙ্গে জুতো ম্যাচ

করতে গিয়ে এখানেই ছাড়া পড়ে গেছে।"

ওয়ান-পিসের গলাতে একটা বো ছিল। হাত লম্বা ছিল। হাতের শেষে রাফেল শাড়ির কুঁচির মত কুঁচি ছিল। কোমরে ইলাস্টিক ছিল। আমার মাথায় ছিল স্ট্রেট চুলের উইগ, হাতে স্লিং-ব্যাগ, পায়ে স্টিলেটো। সম্পূর্ণ মেক-আপ-এ দেওয়ালের ছয় বাই ছয় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখছিলাম। সায়লি বলল, "দুর্দান্ত।"

"আভাসের হাইটের সঙ্গে ওর আগের প্রেমিকার হাইট মানিয়ে গিয়েছিল।"

"তোর হাইট এখন পাঁচ আট। তুই ওর কান পর্যন্ত পৌঁছে যাবি।"

সায়লি চলে গেল। আভাস এল। রোজকার মত ওয়াগনর-এ ওর পাশের সীটে বসলাম। আমার ভেতরে চাঞ্চল্য। মনে হচ্ছে কোন পরীক্ষা দিতে চলেছি। পরীক্ষা দিতে চলেছি নাকি চ্যালেঞ্জ নিতে! যেটাই হোক জোর করে করছি। আভাসের এত তাড়াতাড়ি বাড়ির লোকের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ করানোর ইচ্ছে ছিল না। ঠিক অনিচ্ছা ছিল বলেও মনে হয়নি। কি ছিল আমি নিজেও জানি না। 'তোমাদের বাড়িতে নিয়ে চলো' বললে বলত ঠাকুমা আছেন অথবা দিদিমা আছেন। বলত এক সপ্তাহ তো থাকবেনই। ঠাকুমা-দিদিমার এক সপ্তাহের কুটুম্বিতা শেষ হলে শুনতাম 'আজ পিসি আছেন, আজ মাসি আছেন, মামা আছেন, নইলে মেসো আছেন।'

বললাম, "অবশেষে এল সেই দিন..."

সে সামনের রাস্তা থেকে চোখ না সরিয়েই হাসল।

"...আজ তোমাদের বাড়িতে কোন লাল পতাকা নেই।"

সে আবার হাসল।

"বাবা আমাকে নিয়ে কিছু বলেননি?"

"বলেছেন।"

"কি বলেছেন?"

"কোন মেয়ের হৃদয় যেন না ভাঙ্গে সেই খেয়াল রেখো।"

"মাও তাই বলেছেন?"

"না।"

আভাস নামের সুদর্শন ছেলেকে জন্ম দেওয়ার অহংকার তার মায়ের থাকতেই পারে, যার জন্য তিনি আগেভাগেই বিয়ের ব্যাপারে মুখ খুলতে চান না। আমাদের সম্পর্কের শেষ ঠিকানার প্রকৃতি ঠিক কেমন হবে তা নিয়ে গভীর আলোচনা আমাদের মধ্যেও এখনও পর্যন্ত হয়নি। গভীরভাবে ভাবিনি আমরা স্বামী-স্ত্রী হব নাকি স্বামী-স্ত্রী না হয়েও স্বামী-স্ত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে তৈরি করা পরিবারের মত একটা পরিবার তৈরি করব। যা-ই হোক, তাতে সারাজীবন একসঙ্গে থাকারই প্রতিশ্রুতি রয়েছে। ভাবছি আভাসের মা যদি তাতে প্রতিবন্ধী সাজেন! প্রতিবন্ধী সেজে বাবাকে নিজের বশে করে নেন! তাহলে কি হবে? কি করবে আভাস তাহলে?

ফ্ল্যাটের দরজা একজন মহিলা খুলে দিলেন। আভাস বলল, "এই হচ্ছে রিলি।"

ত্রিভুজের তিনটে কোণায় তিনজন মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। মহিলা দেখতে অতি সাধারণ। আভাসের মুখের সঙ্গে তাঁর মুখের কোনই মিল নেই। চেহারাতেও। উচ্চতায় উনি পাঁচ ফুট এক কি দুই ইঞ্চি। ত্বকে উজ্জ্বলতা কম। গোলাকার মুখশ্রী। চশমাহীন চোখ। কোমর পর্যন্ত লম্বা ঘনত্ব কমে আসা চুল। মাথার সিঁথিতে ছড়িয়ে যাওয়া সিঁদুর। আভাস বলেছে, তাঁর মা এককালে অনেক সুন্দরী ছিলেন। যদিও তাঁর আজকের চেহারা আমাকে তেমন কোন ইঙ্গিত দিচ্ছে না, আমি আভাসের কথা অবিশ্বাসও করতে পারছি না। আমি তাঁর বর্তমান চেহারার মধ্যে তাঁরই কুড়ি বছর অতীতের চেহারা খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করছি। উনি আমার মায়ের মত বাড়িতে লেগিন্স, র‍্যাপ-অ্যারাউন্ড, টপ পরেন না। শাড়ি পরেন।

আমাদের পরিচয়ের পরপরই আভাস আমায় জিজ্ঞেস করেছিল, তোমার মা কি করেন?

আমি বলেছিলাম, আমার মা একজন স্কুল টিচার।

সে বলেছিল, আমার স্কুল টিচারদের খুব ভাল লাগে।

আমি বলেছিলাম, আমার মা একজন সমাজসেবিকা।

সে বলেছিল, আমার সমাজসেবিকাদেরও খুব ভাল লাগে।

আমি বলেছিলাম, আমার মা একজন সামান্য গৃহবধূ।

সে সামান্য শব্দটিকে উড়িয়ে দিয়েছিল, "আমার গৃহবধূদের খুব ভাল লাগে।" সামান্য শব্দটির উল্লেখ করেছিল পরে। বলেছিল, "গৃহবধূরা সামান্য নন, অসামান্য।" সেদিন আমার মনে হয়েছিল আমার দুষ্টুমির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সে তার পরিণত মনকে ছুটিয়ে নিয়ে গেছে। ধরে ফেলেছে দুষ্টুমিকে। অতঃপর তাকে টেনে বসিয়ে বুঝিয়েছে মা মা-ই হন। 'মা' শব্দটির মধ্যেই অনেক বড় ডিগ্রি লুকিয়ে আছে, সেই ডিগ্রির পাঠ্যক্রমে আছে অপরিমেয় স্নেহ, মায়া, মমতা, ত্যাগ, ভালবাসা এবং পরিশ্রম।

আভাস আমার চোখের সামনে এক মধ্যবিত্ত পরিবারের চিত্র তুলে ধরেছিল। চিত্রে আমি দেখেছি স্বামী-স্ত্রী এবং দুটো বাচ্চা। বড়টির বয়স তিন বছর, ছোটটির আট মাস। হামাগুড়ি দেয় সে। বাবা পা ভেঙে বাড়িতে বসা, বন্ধ হয়ে গিয়েছে উপার্জন, ব্যাংকে টাকা নেই, দাদু-পিসি সবার কাছ থেকে টাকা ধার চেয়ে প্রত্যাখ্যাত তিনি। একদিন ছোট বাচ্চাটির খুব জ্বর। অনেকক্ষণ খেতে না পেয়ে বড়টি কাঁদছে। কাছেই এক পিসি থাকেন। মা তাঁকে দোকান থেকে এক প্যাকেট দুধ এনে দিতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু পিসি দিলেন না, পরিশেষে অসুস্থ ছোট বাচ্চাটিকে ক্ষুধার্ত বড় বাচ্চাটির কাছে ফেলে রেখে মাকেই যেতে হল।

কৌতূহল দমন করতে না পেরে জানতে চেয়েছিলাম, "বড় বাচ্চাটি কে?"

"আমি।"

"ছোটটি?"

"আমার বোন।"

আমি আভাসকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "তাঁরা অসময়ে পাশে দাঁড়াননি, তাহলে এখন তোমাদের বাড়িতে তাঁদের এত যাতায়াত কেন?"

"সেইসব দিন আমরা ভুলে গেছি।"

প্রত্যেকটা জিনিস নিয়ে ছেলেটির গভীর অনুভব আমাকে অভিভূত করেছিল। রঙ ফিকে হয়ে গেছে, চরিত্রের চেহারার পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু ভাবনা তাদের একই আছে, বন্ধন একই আছে। আমি ভদ্রমহিলাকে দেখতেই কিংবা আভাসের ভদ্রমহিলা আমাকে দেখতেই আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আমাকে বলেছে আমি পাশ হয়ে গেছি। ওপরে কিছু বলছি না কিন্তু মনে মনে অহংকারে ফেটে পড়ছি। আমার নিজেকে নিয়ে অহংকার। মাকে নিয়ে অহংকার। আভাস বলেছে, ছেলেমেয়েরা মাকে ব্যক্তি হিসেবে দেখে তাঁর প্রতি দুর্বলতা অনুভব করে না, তাঁকে সম্মান দেয় না। দুর্বলতা অনুভব করে তাঁকে মা হিসেবে পেয়ে, তাঁকে সম্মান দেয় তিনি মা বলে। তবু আজ আমি আমার মাকে একজন ব্যক্তি হিসেবে দেখছি। দেখছি আমার সামনে দাঁড়ানো মহিলা থেকে পৃথক করে। অন্য ভাবে ভাবছি। এভাবে দেখা বা ভাবা উচিত নয় জেনেও মনকে বাধা দিতে পারছি না। আমি আমার মায়ের সমস্ত গুণাবলীকে আমার অদৃশ্য চোখ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করছি। তিনি আধুনিক, তিনি শিক্ষিত, তিনিও তাঁর সময়ে সুন্দরী। তিনি বুদ্ধিমতী, উদ্যমী, বিচক্ষণ, সংগ্রামী। আমার অনেক সমস্যার সমাধান তাঁর হাতে।

ভদ্রমহিলা বললেন, "বসো।"

একটি একক বিল্ডিং-এ দুই বেডরুমের ফ্ল্যাট আভাসদের। বিল্ডিং-এর চেহারা বলে বিল্ডিং-এর বয়স কম করেও কুড়ি বছর। ড্রয়িংরুমের আয়তন খুব বেশি নয়, বড়জোর একশো কুড়ি স্কয়ার-ফুট। ড্রয়িংরুমের সোফা-সেটও খুব নতুন নয়। কাঠের তৈরি সোফা এবং তার কুশন অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে বিবর্ণ। আমি বসি। উনি জিজ্ঞেস করেন, "কি খাবে?"

ফিজিওথেরাপি করে আমার পায়ের ব্যথা কম হলেও পিঠের ব্যথা এখনও প্রবল। ট্রেডমিলে হাঁটতে পারছি না। অন্য কোন ব্যায়ামও হচ্ছে না। পেটে মেদ বাড়ছে। অথচ খাওয়া কমছে না। আভাসের সিক্স প্যাক এবং বাইসেপসওয়ালা চেহারা। সে নিয়মিত জিম-এ যায়। প্রচুর খায়। আমার সামনে বসে, আমাকে সাক্ষী রেখে। আমার লোভ সংবরণ হয় না। আমি প্রায়শই তার ভোজনের অংশীদার হয়ে যাই। ভাবছি তাঁকে কি বলি। কিছু খাব না? নাকি ফ্রেঞ্চ টোস্ট? নাকি শুধু জল? নাকি নুডলস? না না, আভাস বলেছে তার মা নুডলস বানাতে পারেন না। নাকি ডিমের চপ? উনি কি ডিমের চপ তৈরি করেন? জানিও তো না উনি কি বানাতে পারেন। শুনেছি উনি আমিষ খান না। কিন্তু আমিষ রান্নায় পারদর্শী। নিরামিষ যেমন-তেমন। নাকি বলি,

আন্টি শুধু গ্রীন টী নেব, আর কিছু নয়?

আমার হয়ে আভাসই উত্তর দিল, "যা ইচ্ছে।"

উনি চিঁড়ের পোলাও বানিয়ে নিয়ে এলেন।

আবার তুলনা। মায়ের হাতের রান্নার কথা মনে পড়ে গেল। মা মাঝে মাঝে আমাকে জিজ্ঞেস করেন, "আমি মরে গেলে আমাকে তোমার মনে পড়বে না রিলি?" এমন স্পর্শকাতর মুহূর্তেও তাঁকে বাজিয়ে দেখার ইচ্ছে আমার মধ্যে প্রবল থাকে।

"নট রিয়ালি।"

তাঁর মুখমণ্ডলে ম্লান হাসির আভা। সেই হাসি লুকোতে চেয়ে উনি মুখ পাশে ফিরিয়ে নিয়ে আড়াল করেন, অথবা কোন কাজের বাহানায় উল্টো ঘুরে আমার সামনে থেকে পুরো শরীরটাকে সরিয়ে ফেলেন। এক সেকেন্ড হয়ে যায় সব, কিন্তু সেই এক সেকেন্ডই আমি তাঁর হাসিকে প্রত্যক্ষ করে নিই। বেদনার ছাপ তাতে। তবু তাঁর প্রতি সদয় হই না। কখনো তাঁর ঘুষির ব্যথাটা আমার পেটে দগদগ করে, কখনো বিজ্ঞান বই ছুঁড়ে ফেলার কথাটা আমার মনে দগদগ করে, কখনো গল্পের বইয়ের পাতা ছেঁড়ার কথাটা বাড়ি মারে মনে। গল্পের বইয়ের পাতাগুলো মা-ই পরে আঠা দিয়ে সেঁটে দিয়েছিলেন এবং ক্ষমা চেয়ে বলেছিলেন আর কোনদিন করবেন না। করেনওনি। কথা রেখেছেন। তবুও আমি শক্ত। একদিন আমার মনে তাঁর জন্য করুণা জেগেছিল। কি করি কি করি ভাবতে ভাবতে তাঁর পেছন পেছন ড্রয়িংরুমে এসেছিলাম। উনি দিনের শেষ আলোয় সম্মুখে দৃশ্যমান ঘোলাটে অট্টালিকাকে দৃষ্টিগোচরে রেখে বাতায়ন সংলগ্ন সোফার হাতলে বসে ছিলেন। আমাদের সোসাইটির নিচে ওয়াকওয়েতে, কয়েক জোড়া পায়রা। কেউ খাবার খুঁটে বেড়াচ্ছে। কেউ তার সঙ্গীর সঙ্গে খুনসুটি করছে। তাদের দিন শেষ হয়নি এখনো। কয়েক জোড়া পায়রার মধ্যে হয়ত সেই জোড়াও বর্তমান যেটা আমার ঘুমের পরম শত্রু। কানা খোঁড়া না হলে অথবা চেহারায়, ব্যবহারে অতীব দৃশ্যমান বৈশিষ্ট্য না থাকলে এদের চেনা যায় না। নাকি সেই জোড়া বাকিদের পাঠিয়েছে আমাকে কোন পাঠ দেবে বলে! জোড়-বিজোড়ের পাঠ।

অট্টালিকার কয়েকটি বারান্দায় চায়ের সায়ংকালীন আসর। মায়ের একাকীত্ব আমাকে নাড়া দেয়। তবুও যেহেতু বেশি নরম হওয়া আমার স্বভাববিরুদ্ধ বলি, "আমি তোমার রান্না মিস করব।" শুনে বেদনার ধূসর আস্তরণের উপরেই আনন্দের হাল্কা আভা তাঁর চোখে। "আমার রান্না তোমার পছন্দ রিলি?"

আবার আমি আমার স্বভাবচক্রে প্রত্যাবৃত্ত হই। আবার ঘৃণা প্রকট। আমার বয়স তখন সতেরো, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হয়েছে। একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণিতে কলেজে চরম ফাঁকি দিয়েছি। পরীক্ষারও প্রস্তুতি নেই, পেপারের আগের দিন পর্যন্ত বই খুলে বসি না। বইয়ের পরিবর্তে মোবাইল খুলে কখনো বসে কখনো শুয়ে।

ফেসবুকে ইন্ডিয়া আনিমে নামে একটা ক্লাব ছিল। সেখানে ধ্রুব নামে ম্যাঙ্গালোরের একটা ছেলে ছিল। ধ্রুবর সঙ্গে আমার ঠিক প্রেম নয়, প্রেম প্রেম ভাব। প্রেম প্রেম ভাব আমাকে এতটাই সংবিষ্ট করে রেখেছে যে আগামীকাল অঙ্ক পরীক্ষা অথচ আমি বই-খাতা-কলমের খবরই রাখিনি। ধ্রুব আগেই মেসেজ করে জানিয়েছিল, "আই লাইক ইউ।" আমি লিখেছিলাম, "আই লাইক ইউ টু।"

আজ ধ্রুব লিখেছে, "আই ওয়ান্ট টু হাগ ইউ।"

আমি জবাব দিয়েছি, "আই ওয়ান্ট টু হাগ ইউ টু।"

অঙ্ক পরীক্ষা নিয়ে আমার নিরুদ্বিগ্নতা মাকে উদ্‌বিগ্ন করে। উনি সহসা আমার ঘরের দরজা খুলে ভেতরে ঢোকেন, "কি হচ্ছে?"

"কিছু না," চোরের মত চুপসে যায় আমার মুখ।

"আমাকে মোবাইল দাও।"

"না।" আমি হলাম সাহসী চোর।

মা সাজোরে আমার হাত থেকে মোবাইল কেড়ে নেন। মেসেজ পড়ে আমাদের উদ্ভট প্রেমলীলা সম্পর্কে অবহিত হন। তাঁর রাগ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। চিৎকার করেন, "বেরিয়ে যাও বাড়ি থেকে।"

আমার স্কুলের এক সহপাঠী কাছেই থাকে। সেও অঙ্ক পরীক্ষা দেবে। মা তাঁকে ফোন করে অনুরোধ করেন,"তোমার বাড়িতে একে নিয়ে গিয়ে একসঙ্গে প্রস্তুতি করো।"

আমার কানে প্রতিধ্বনিত হয় মায়ের চিৎকার, "বেরিয়ে যাও এই বাড়ি থেকে, বেরিয়ে যাও...।" বলি, "তোমার দু'য়েকটা রান্না প্রশংসনীয়।" তাঁর মুখমণ্ডল বেদনার মেঘে আবার ছেয়ে যায়! পৃথিবীতে যে কোন ক্ষেত্রেই নিত্য নতুন আবিষ্কারের শেষ নেই। জানার শেষ নেই। বিভিন্ন হোটেলে, মলে, রেস্টরেন্টে আমি একশো সুস্বাদু পদ খেয়েছি। সেসব হোটেল স্পেশাল। অনেকের মা নিশ্চয় হোটেল স্পেশাল পদ বাড়িতেও তৈরি করেন। আমার মাও করেছেন, কিন্তু মাত্র কয়েকটি। তাঁর সময় এবং আগ্রহ দুটোরই অভাব। তবু নিরামিষ, আমিষ দুটোতেই তাঁর অসম্ভব পারদর্শিতা। গুণে শেষ করা সম্ভব নয়। কার্পণ্য দেখিয়ে মাত্র কয়েকটি পদের নামোল্লেখ করি। "তোমার চিকেন হক্কা নুডলস, চিকেন বিরিয়ানি, মাগুর মাছের ঝোল, পনির, লাউ-চিংড়ি, ঝিঙ্গে-পোস্ত মিস করব।"

আভাসের বাবা একটু পরে বাড়িতে ঢুকলেন। উনি আমার দিকে এক পলক ফেলে তাঁর বেডরুমের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। নিশ্চয় অনুমান করে নিয়েছেন আমি কে। এই মুহূর্তে অতিরিক্ত কিছু জানার প্রয়োজন নেই। ছেলে আগে একবার

পাঁচ বছর তিন মাসের লম্বা প্রেম করে বিচ্ছেদ ঘটিয়েছে। এটা তো সবে শুরু। এই প্রেমকে অন্ততপক্ষে ছয় বছর টিকতে হবে। তাহলে ভাবা যাবে হয়ত স্থায়ীত্বের দিকে এগোচ্ছে সম্পর্ক।

আভাস বাবাকে বলে, ''আলাপ করে যাও।''

বাবা থেমে গিয়ে ফিরে তাকালেন। আমিও তাঁকে নিখুঁতভাবে পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ পেলাম। বাবার চেহারার সঙ্গে আভাসের মিল নেই এক উচ্চতার মিল ছাড়া। বাবা লম্বায় প্রায় ছয় ফুট। তাঁর চোখ বাদামি রঙের। ভাবলাম সেগুলো থেকেই আভাস কোনওভাবে নিজের চোখকে সবুজ বানিয়ে ফেলেছে।

''রিলি...''

মৃদু হাসেন বাবা। হেসে বোঝান তিনি জানেন আমি কে। চলে যান ঘরে। কোনই ধামাকা তৈরি হল না। কেউই আমার রূপের তারিফ করল না। জিজ্ঞেস করল না কোথায় বাড়ি, মা-বাবা কি করেন, আমার কোন ভাইবোন আছে কিনা, আমি চাকরি করি কিনা, করলে কোথায় করি। অথচ আমার মা! ফোনে শুনেই তাঁর কত উৎসাহ। আভাসের আদ্যপান্ত জেনে রেখে দিয়েছেন। আমার জন্য। আমি খুশি হব তাই।

আভাসের বোনকেও দেখলাম না। সে একবার শোবার ঘরে গেল। পাঁচ মিনিট বাদে বেরিয়ে এসে মোবাইলে একটা ফটো দেখিয়ে বলল, ''আমার বোন। খুব লাজুক, দেখা করতে চাইছে না।''

সেই রাতে মা আবার ফোন করলেন। আভাসের বোনকে সাক্ষাৎ দেখার সৌভাগ্য না হোক, তাঁকে বলি, আভাস ভার্মা আমার বাস্তবিক বয়ফ্রেন্ড। কারণ আমি তাকে শুধু স্থির অথবা চলমান চিত্রে দেখিনি, চোখের সামনে বাস্তবে দেখেছি, ছুঁয়ে অনুভব করতে পেরেছি তার উপস্থিতি। আভাস ভার্মা আমার আসল বয়ফ্রেন্ড। তার চেহারা আসল। ফিলাডেলফিয়ার সন্দীপ যাদবের মত কোন মডেলের পেছনে তা লুকিয়ে নেই। আভাস ভার্মা আমার খাঁটি বয়ফ্রেন্ড। তার নাম খাঁটি, পরিচয় খাঁটি, ঠিকানা খাঁটি। সেখানে কোন ধোঁকাবাজি নেই। আভাস ভার্মার মা, বাবা, বোন কেউই ধার করা নয়। আমি তার বাড়ি গিয়ে সব যাচাই করে নিয়েছি। মায়ের মনে একটাই প্রশ্ন—আমাদের এই সম্পর্কটা টিকবে তো?

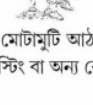

কম্পানিতে এক একটা প্রোজেক্ট মোটামুটি আঠারো মাস চলে। প্রোজেক্ট শেষ না হলে কম্পানিতে ইন্টারন্যাল পোস্টিং বা অন্য কোন ডিভিশনে বা প্রোজেক্টে নতুন

চাকরি সম্ভব নয়। এস এ পি নেটওয়ার্কিংও একটা নতুন প্রোজেক্ট, এটা আঠারো মাস চলবে, আমরা এখানে কাজ করব এবং এখন থেকে বারো মাসের আগে আমরা প্যানাসিয়াতে অধিকতর ভাল কোন পোস্টের জন্য আবেদন করতে পারব না বা আমাদের কোন ইন্টারন্যাল পোস্টিং হবে না। ইন্টারন্যাল পোস্টিং বা নতুন চাকরি না হওয়ার অর্থ হল মাইনের বিশেষ উন্নতি না হওয়া। অবশ্য কেউ চাইলে যে কোন সময় চাকরি ছাড়তে পারে। কিন্তু একই প্রশ্ন ঘুরে ফিরে আসছে। ছয় মাসের অভিজ্ঞতা আমাদের অন্য কোন কম্পানিতে চাকরি পেতে বিশেষ সাহায্য করবে না।

সুনইনার মুখে ম্যানেজার গিরিধর এবং প্রাজক্তার বার-হপিং-এর কথা শুনে বেদান্তির বেশি কৌতুহল হয়েছিল সুনইনাকে নিয়েই, "তুইও কি সেই বার-এ গিয়েছিলি?"

"হ্যাঁ।"

"কার সঙ্গে?"

"প্রতীকের সঙ্গে।"

"ওরাও নিশ্চয় তাহলে তোদের দেখেছে?"

"না। আমরা কোণার দিকটাতে ছিলাম। ওরা কোনদিকে না তাকিয়ে ভেতরের রুমে গেল। আমি আর প্রতীক আগেই বেরিয়ে এসেছিলাম।"

"প্রতীকের সঙ্গে তুই বারে গেছিস জানলে তোর মা-বাবা রেগে যাবেন না?"

"বারেই তো শুধু গেছি!"

"তোর শুধু ওই এক কথা—চুমুই তো শুধু খেয়েছি, জড়াজড়িই তো শুধু করেছি, বারেই তো শুধু গেছি। তুই প্রতীকের সঙ্গে আসলে কি করছিস সে তুই-ই জানিস।"

"আমি যা করি শুধু প্রতীকের সঙ্গেই। তাহলে শোন, সাক্ষীও আজকাল ম্যানেজারের সঙ্গে মাঝে মাঝে ডিনারে যাচ্ছে।"

"আরে বাহ্, কি চলছে অফিসে!"

"আমিও সেটাই ভাবছি, কি চলছে।"

"তুই কি ওদের দু'জনকেও বারে দেখেছিস?"

"না, সাক্ষী একদিন মুখ ফসকে আমায় বলে ফেলেছিল।" সুনইনা বলে, "সাক্ষী এবং প্রাজক্তার মধ্যে কে বেশি ম্যানেজারের সঙ্গে হ্যাং-আউট করতে পারবে তার প্রতিযোগিতা চলছে।"

আমার সাক্ষীর 'হ্যাং-আউট'এর কথাটা প্রথমে বিশ্বাস হয়নি। একজন ম্যানেজার অফিসেরই দু'জন মেয়ের সঙ্গে কিভাবে এমন করতে পারে! তাও আবার সেই দু'জন যারা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী! কিন্তু সুনইনার মতে যেসব লোক মেয়ে বোঝে তারা শুধু মেয়েই বোঝে। মেয়েটি প্রতীক পাগল হলেও, মাঝে মাঝে মূল্যবান কথা

বলে ফেলে। আমি হিঞ্জেওয়াড়িতে থাকি না, তাই সত্যি-মিথ্যে জানি না। তবে ব্যাপারটা এমন হতেই পারে সাক্ষী সুনইনার কাছে ভুল করে নিজের বার-হপিং-এর কথা বলে ফেলায় পরে প্রাজক্তার গোপন ফাঁস করে দিয়েছে। যদি সুনইনার দেওয়া খবর সত্যি হয়, সাক্ষীও যদি ম্যানেজারের সঙ্গে...ভুল ভেবেছিলাম...ম্যানেজার সেইজন্যই সেদিন সাক্ষীর এস্কেলেশন মুখ বন্ধ করে হজম করেছিলেন।

আমি দেখছিলাম যে ম্যানেজারের প্যাঁচার মত মুখ এবং হর্স-গু গোঁফ সাক্ষীর দু'চোখের বিষ অফিসে সেই ম্যানেজারেরই কেবিনে সাক্ষী মাঝে মাঝে ঢুকে পড়ছে। ঢুকে গিয়ে নিজের বড় বড় ভুলগুলোকে তাঁর সঙ্গে বোঝাপড়া করে একদম চেপে দিচ্ছে এবং অন্য মেয়েদের ছোট ছোট ভুলগুলোকে তাঁর কানে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে ক্ষমার অযোগ্য করে তুলছে। সুনইনার মুখ থেকে সাক্ষীর বিরুদ্ধে গোপন অভিযোগ বেরিয়ে আসে ভোগান্তির কষ্ট থেকে। সে একটা টিকিট লেভেল 'টু'তে পাঠিয়ে দিয়েছিল। সেই টিকিট-এর কাজ তখন হওয়ার কথা নয়। ইন্টারন্যাল এস্কেলেশন বলে কাস্টমারের জানার কথা নয়। জানলে বুঝত তার কাজ অগ্রীম হতে চলেছে এবং খুশিই হত। তবু সাক্ষী সুনইনার টিকিটের কথা ম্যানেজারকে বলে দিয়েছে এবং ম্যানেজার গলা ফাটিয়ে সুনইনাকে বকেছেন। অভিলাষার সঙ্গেও পলিটিক্স করেছে সাক্ষী। বেদান্তি, উজ্জ্বলা, রুচিরা, ললিতা, কানুপ্রিয়াও বাদ যায়নি। গত দেড় মাসে সাক্ষীর কলকাঠিতে তাদেরও ডিউটিতে অশুভযোগ হয়েছে। ললিতাকে চাকরি ছাড়তে হয়েছে। সাক্ষীর কোপ থেকে বেঁচে আছি শুধু আমি। মোটামুটি সবার কাছেই সে হয়ে উঠেছে এক আতঙ্ক। যে কোন সময় যে কেউ ছাঁটাই হয়ে যেতে পারে। কম্পানি কোন কর্মচারীকে ডেকে বলে না 'তোমাকে ছাঁটাই করা হল।' বলে, 'রেজিগনেশন লেটার দাও।' যেমন ললিতাকে বলেছে। এমনই আরেকটি ঘটনা লেভেল 'টু'তে ঘটেছে। পলিটিক্স চলছে সেখানেও। ছাঁটাই করার নির্ভরযোগ্য খবরগুলো প্রথমে সাক্ষীর কাছেই পাওয়া যায়।

সুনইনার কথা ঠিক হলে সাক্ষীর এখন শুধু লোকার সঙ্গে আদায়-কাঁচকলায় সম্পর্ক। অফিসে শিফটের ঝঞ্ঝাট লেগেই ছিল। তবু এস্কেলেশন থেকে মুক্ত থাকায় একটু সাহস ছিল মনে। সাহস এবং টাকার দুঃখ উদ্দীপকের কাজ করেছিল। একদিন সকালে ম্যানেজারের হাতে ফিজিওথেরাপিস্টের প্রেসক্রিপশন এবং কয়েকটি উবারের বিল ধরিয়ে দিয়ে বলি, ''প্রোজেক্ট থেকে এই টাকাগুলো আমাকে পাইয়ে দিন এবং লোকাকে ঠিক করে রোস্টার বানাতে বলুন, নইলে আমি ডেলিভারি লিডের কাছে লোকাকে নিয়ে কমপ্লেন করব।'' বিলের ব্যাপারে কোন আশ্বাস দিলেন না ম্যানেজার। শিফটের ব্যাপারে বললেন, ''দেখছি।''

''কিছু একটা আপনাকে করতেই হবে স্যার।''

গলার জোর দেখে ম্যানেজার দাঁড়িয়ে পড়লেন। আমার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন। আমিও দাঁড়িয়ে। মুখোমুখি। এক বিরক্তিকর পরিস্থিতি। ম্যানেজারের তাকানোতে কি আছে আমি বুঝতে পারছি না। কিন্তু ওই তাকানো আমাকে অতি অল্প সময়ে অনেক কিছু ভাবাচ্ছে। আমি ভাবছি তাঁর শরীরের মধ্য প্রদেশ থেকে প্রক্ষিপ্ত ভুঁড়ির কথা। আজ আমার পায়ে ফ্ল্যাট জুতো। মাঝখানে টেবিল না থাকলে নিশ্চয় আজ গিরিধরের প্রক্ষিপ্ত ভুঁড়ির সঙ্গে আমার বুক ঠেকে যেত। আমার সেই অদৃশ্য শক্তির কথা আবার মনে পড়ে গেল যেই অদৃশ্য শক্তি আভাসের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়েছে। অলৌকিক শক্তি। একেই বলে অলৌকিক শক্তির অলৌকিক করুণা।

"টাকা চাইছ?"

"নিশ্চয়! মাইনের এক-তৃতীয়াংশ আমার গাড়ির ভাড়া দিতেই চলে যাচ্ছে।"

"ইট'স আ পার্ট অফ লাইফ। পরে ভাল চাকরি পাবে। বেশি মাইনে হবে।"

"পরের কথা পরে। পরের কথা ভেবে আমি এখন এইভাবে আমার টাকাকে নষ্ট হতে দিতে পারি না।"

"ডিপ্লোম্যাসি জানো?"

আবার সেই তাকানো। এবার আমার ভাবনা দূরের পরিধি নিয়েছে। আমি ভাবছি প্রাজক্তার সঙ্গে তাঁর বার-হপিং-এর যে গোপন গুজব ছড়িয়েছে তার কথা। সত্যিই কি উনি...! যদি সত্যি হয় তাহলে আমি অফিসে জয়েন করার আগে প্রাজক্তাও কি কোন সময় তার ব্যক্তিগত এজেন্ডা নিয়ে এভাবে গিরিধরের সামনে হাজির হয়েছিল এবং গিরিধর এমন করেই... । আমি ভাবছি সাক্ষীর সঙ্গে তাঁর ডিনারের যে গুজব ছড়িয়েছে তার কথা। যদি সত্যি হয়...সাক্ষীর ব্যাপারটা ঘটেছে আমি অফিসে জয়েন করার পরে...যখন সে ঘনঘন তাঁর কেবিনে আসত...গিরিধর কি এই ভাবেই তাকে...

গিরিধর বললেন, "তুমি পারবে। আমি ভাবছিলাম কাকে বলি।"

কাকে বলি, না কাকে জিজ্ঞেস করি! "কি করতে হবে?

"আগামীকাল তোমার জেনারেল শিফট। ট্রাউজার এবং শার্ট পরে আসবে।"

"কেন?"

"কম্পানিতে স্টোরেজ নামে একটা নতুন প্রোজেক্ট ঢুকতে চাইছে। জার্মানির ক্লায়েন্টস। স্কাইপে প্রেজেন্টেশনটা তুমি দেবে।" যেদিন আমি তাঁকে আমার ক্যাবের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করছিলাম সেদিন তিনি এই প্রোজেক্টের প্রপোজাল লেটারটাই খুব সম্ভব খুঁজছিলেন।

"কি বলতে হবে আমাকে?"

"তোমরা এখন কোন প্রোজেক্টে কি ধরণের কাজ করছ এসব...।"

রাতে যথেষ্ট ঘুমের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু হল না। বারোটায় পি এম ও টিম ফোন

করে আমার ঘুম ভাঙালো। পি এম ও হল একটা নেটওয়ার্ক টিম যার ফুল ফর্ম প্রোজেক্ট ম্যানেজমেন্ট অফিস। 'পি এম ও'কে সব সিস্টেম-এর হেড আছে কিনা, সি পি ইউ আছে কিনা, ইন্টারনেট কানেকশন আছে কিনা, সফটওয়্যার-এ কোন সমস্যা আছে কিনা ইত্যাদির খেয়াল রাখতে হয়। টিম আমার সিস্টেম-এর ম্যাট অ্যাড্রেস জানতে চায়। আমরা কম্পিউটার অন করে কম্যান্ড প্রম্পট সফটওয়্যার খুলে তাতে কমান্ড টাইপ করি, ম্যাট অ্যাড্রেস পাই। অভিলাষাকে বললাম ম্যানেজারকে সিসিতে রেখে ওটা পি এম ও টিমকে মেল করে দিতে। রাত দু'টোয় ম্যানেজারের ফোন, ''ম্যাট অ্যাড্রেস কোথায়?''

''অভিলাষা মেল করেনি?''

''ম্যাট অ্যাড্রেস দিতে বলেছ?''

''হ্যাঁ।''

''দেখছি।''

এক মিনিট বাদে আবার ফোন, ''নাহ্, আমি সাবজেক্ট-এ ফিজিক্যাল অ্যাড্রেস দেখছি।''

'আই টি'তে কাজ করতে এসে এবং ম্যানেজারের পোস্ট-এ বসে গিরিধর ফিজিক্যাল এবং ম্যাট অ্যাড্রেস আলাদা করে দেখছেন। হতাশায় পড়ে আসা গলায় বলি, ''ফিজিক্যাল অ্যাড্রেস এবং ম্যাট অ্যাড্রেস একই জিনিস স্যার।''

''দাঁড়াও, দাঁড়াও...''

দাঁড়াও মানে অপেক্ষা করো। আমি মোবাইল কানে নিয়ে অপেক্ষা করছি। ম্যানেজার মেল চেক করে বলবেন 'ওকে ঠিক আছে।' তা না, এক মিনিট পরে উনি লাইন কেটে দিলেন। নিস্তব্ধ থেকে নিস্তব্ধতর হয়ে গেল ফোনের ওই পাশটা। অজ্ঞতার লজ্জা চাপতে বৃথা খেলা খেললেন ম্যানেজার।

পরদিন ম্যানেজার মাথার সামনে মোরগের আকৃতির এক গুচ্ছ লাল চুল নিয়ে অফিসে এলেন। মোরগকে তিনি তাঁর সফলতার চাবি বলে মনে করেন। মগজের ঘিলুর ওপর ভরসা যত কম মোরগের ওপর তত বেশি। আমি স্কাইপে স্টোরেজ-এর তিনজন উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সামনে প্রেজেন্টেশন দিলাম। আমাদের দিকে ম্যানেজার গিরিধর ছাড়া ছিল টিমলিড লোকনাথ, প্রোজেক্ট-এক্সপার্ট শচীন এবং মর্নিং ও আফটারনুন শিফটের লেভেল ওয়ান এবং লেভেল টু-এর সবাই। সবাই খুশি। ম্যানেজার আমাকে তাঁর কেবিনে ডাকলেন, ''গুড্।''

''থ্যাঙ্ক ইউ।''

''একবছর বাদে তোমার অ্যানুয়েল প্যাকেজ বাড়বে।''

''থ্যাঙ্ক ইউ।''

''একটা ট্রিট হয়ে যাক?''

''অবশ্যই। সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে চাইলাম, ''আপনি আমার উবারের টাকাগুলো পাইয়ে দিন, তারপর। এখন আমার হাত একদম খালি।

''তোমাকে টাকা দিতে হবে না। টাকা আমি দেব।''

''আপনি আমার হয়ে এতজনকে কেন খাওয়াতে যাবেন?''

''অনেক জনকে খাওয়াব না। শুধু তোমাকে...''

গতকাল গিরিধর যখন আমাকে ডিপ্লোম্যাসি জানি কিনা জিজ্ঞেস করেছিলেন, আমি অনেকদূর পর্যন্ত ভেবেছিলাম। কিন্তু সেই ভাবনার পরিধি অস্পষ্ট ছিল। আজ স্পষ্ট হল। কালকে পরিধি অস্পষ্ট থাকায় একটু ভয় করছিল। আজ স্পষ্ট হওয়ায় ভয় কমে গেল। গিরিধরকে রাগানো যাবে না, তাই সুনইনার চালে উত্তর দিলাম, ''মা খুব রেগে যাবেন।''

''মাকে কেন বলবে?''

''অফিসের সবাই-ই বা কি ভাববে!''

উনি আবার আমাকে সেই একই প্রশ্ন করলেন, ''ডিপ্লোম্যাসি জানো?''

আমি এতদিন জানতাম অফিস শুধু একটা পলিটিক্সের জায়গা। আজ জানলাম অফিসে ডিপ্লোম্যাসিও প্র্যাক্টিস করতে হয়। ভাবি গিরিধর ডিপ্লোম্যাসির অর্থ জানেন না। ইংরেজিতে দুর্বল গিরিধর। আমি জানি ডিপ্লোম্যাসির অর্থ। বললাম, ''মায়ের এবং অফিসের সবার কথা এমনি বলছিলাম। সেগুলো কোন কারণ নয়। ট্রিটটা আসলে আমিই দিতে চাই। আমার উবারের টাকাটা পাইয়ে দিন।''

''যদি উবারের টাকা না পাও?''

''তাহলে ছয়মাস পরে। আমার স্যালারি বাড়ুক। ট্রিট আমিই দেব। যতদিন বলবেন ততদিন।''

*****

আমার টাকার কেসটাকে ঝুলিয়ে রেখে ম্যানেজার জার্মানিতে ক্লায়েন্ট ভিজিট করতে গেলেন। ম্যানেজারের অনুপস্থিতিতে বেদান্তি, প্রাজক্তা, অভিলাষা, সুনইনা, সাক্ষী এবং আমি একটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ তৈরি করেছি। মাঝে মাঝে ভয়েস কনফারেন্স-এ কথা হয়। একদিন আমরা বাড়ি থেকে ভিডিও কনফারেন্সেও এলাম।

বেদান্তি বলল, ''আমি চাকরি ছেড়ে দিয়ে ইন্ডিয়া থেকেই হাওয়া হয়ে যাব।''

সুনইনা জিজ্ঞেস করল, ''তোর প্রেমিকের খোঁজ পেলি বুঝি?''

''না রে, সে জাহান্নামে গেছে।''

''তবে?''

''আমার মা-বাবা আমার বিয়ের জন্য পাত্র দেখেছেন। আমেরিকাতে থাকে।''

প্রাজক্তা বলল, ''আমি ব্যাঙ্গালোরে যাব।''

সুনইনা জিজ্ঞেস করল, ''তোর মুসলিম প্রেমিকের সঙ্গে?''

"না না, আমার বাড়ি থেকেও আমার জন্য পাত্র দেখা হয়েছে। সে ব্যাঙ্গালোরে থাকে।"

"তোর প্রেমিক জানে?"

"ওর মা-বাবা পাত্রী ঠিক করে ফেলেছে।" কথাবার্তা অন্যদিকে ঘুরে গেল। প্রাজক্তা বলল, "মামার মেয়েকে বিয়ে করছে মোটা।"

ফটোতেই দেখেছিলাম প্রাজক্তার মুসলিম প্রেমিকের চেহারা ভারী। প্রাজক্তাও মোটা। কিন্তু ওর পোশাকের ধারণা মন্দ নয়। মেক-আপ বেশ করে। গাঢ় রঙের লিপস্টিক পরে। চ্যাটে প্রাজক্তাকে সেক্সি টপ পরতে দেখে বেদান্তির চোখ কপালে, "এই শোন, আমরা সবাই জানি তোর বুবস-এর সাইজ আটত্রিশ। ক্লিভেজ দেখিয়ে সেডিউস করিস না।"

প্রাজক্তা হাসে, "অভ্যেস করছি সেডিউস করার। খুব বেশি হলে আর ছয়মাস। তারপর..."

প্রেমিককে ছেড়ে দিতে তার মনে এতটুকু পিছুটান নেই। বেদান্তি বলে, "খুব আনন্দ তাই না?"

"নিশ্চয়। ওর সঙ্গে বিয়ে হলে লেহেঙ্গা পরতে পারতাম না।"

এরা সবাই লেহেঙ্গার জন্য পাগল। সেইজন্যই রীতি প্রথা মেনে বিয়ের জন্য উদগ্রীব। জিজ্ঞেস করা হয়নি লেহেঙ্গা এরা আগে কখনো পরেছে কিনা। আমি পরেছি। পরি মাঝে মাঝে। আমার সুসজ্জিত ঘরে বিপুল সংখ্যক পশ্চিমি পোশাকের মাঝখানে তিন চারটে পরম্পরাগত দামি লেহেঙ্গাও স্থান পেয়েছে। লেহেঙ্গা নিয়ে আমার কোন পাগলামি নেই। প্রথাগত বিয়েও আমি চাই না। এমনকি পাঁচশো লোক ডেকে খাওয়ানোর আয়োজন করতেও আমার আপত্তি।

অভিলাষা বলে, "আমি রেজিস্ট্রি ম্যারেজ করব। তবে এখন নয়, অনেক পরে। এখন আমাদের সম্পর্ক যেমন চলছে চলুক। একবছর, দু'বছর, পাঁচবছর...এই সম্পর্ক আরও লম্বা হলেই বা কি ক্ষতি!"

চিন্তায় পড়ে যায় সুনইনা, "বুড়ো হয়ে যাবি।"

অভিলাষা নিশ্চিন্তে জবাব দেয়, "জানিস না, ইংল্যান্ডে অনেক পুরুষ-মহিলা এমনভাবেই থাকে? তারা ছেলেমেয়ের মা-বাবা হয়, তাদের বড় করে, তারপর মধ্যবয়সে গিয়ে পরিণয়। অনেক সময় ছেলেমেয়েরাই মা-বাবার বিয়ে দেয়।"

বেদান্তি জিজ্ঞেস করে, "সংকেতের ট্রেনিং কতদূর?"

"ট্রেনিং আছে ট্রেনে। সংকেত নিজেই কোর্সের সময় আরও ছয়মাস বাড়িয়ে দিয়েছে।"

প্রাজক্তার মনে সন্দেহ, "তোর সংকেত ম্যাডামের প্রেমে পড়ে যায়নি তো?"

"আরে না না।"

সুনইনাকে ট্রেনিং দেওয়ার জন্য সে আমার সঙ্গে যেমন তুলনামূলকভাবে কম দূরত্ব অনুভব করে, অভিলাষা এবং আমি একই দিনে জয়েন করায় আমিও তেমন অভিলাষার সঙ্গে কম দূরত্ব অনুভব করি। সুনইনা যেমন ওর ব্যক্তিগত কথাগুলো আমার সামনে অকপটে তুলে ধরে আমিও আমার ব্যক্তিগত কথা অকপটে না হলেও রেখে ঢেকে অভিলাষার সামনে তুলে ধরি। আভাসের কথা এখনও পর্যন্ত অফিসের একমাত্র অভিলাষাকেই বলেছি এবং আমার স্থির বিশ্বাস সে এটাকে সার্বজনীন করে ফেলেনি। যদিও করলেও আমার কোন ক্ষতি হয়ে যেত না। আভাসের সঙ্গে সম্পর্ক আরও পাকা না হওয়া পর্যন্ত আমি গোপনীয়তা রক্ষা করতে চেয়েছিলাম এই যা। অভিলাষাও ওর কিছু ব্যক্তিগত কথা আমাকে বলেছে। সে বার-হপিং করে না। ক্লাব-হপিং করে। সংকেত ঘরকুনো, পার্টিতে যেতেও লজ্জা পায়। তাই সে অভিলাষাকে যে কারও সঙ্গে ক্লাবে যাওয়ার স্বাধীনতা দিয়েছে। অভিলাষা সেই স্বাধীনতার ব্যবহার করছে। ক্লাব-হপিং এবং পার্টির সঙ্গী বানিয়েছে তার স্কুলের এক সহপাঠীকে। সেও লম্বায় ছয় ফুট। তার সঙ্গে পার্টিতে যেতে যেতে, ড্রিঙ্কস করতে করতে, ডান্স করতে করতে, গাড়িতে ফিরতে ফিরতে অভিলাষা তার প্রতিও দুর্বল হয়। একদিন তার সঙ্গে অভিলাষার শারীরিক সম্পর্ক হয়ে যায়।

অভিলাষা তার জন্য আমার কাছে আফসোস করেছে। অনুরোধ করেছে আমি যেন সেইসব কথা কাউকে না বলি।

ভাবছিলাম ভিডিও আলোচনার মাঝখানে আমার নতুন প্রেমের ঘোষণা করব কিনা।

সাক্ষী প্রাজক্তাকে বলল, "তোর এমন ড্রেস পরা উচিত হয়নি।"

"কেন?"

"অফিসে অ্যালাউড না।"

"আমরা এখন অফিসে নেই।"

"তা হোক, গ্রুপটা তো অফিসের মেয়েদেরই, তাই না?"

বেদান্তি গ্রুপের অ্যাডমিনিস্ট্রেটর। সুনইনার বক্তব্য ছিল যারা বার-হপিং করে তাদের বাদ দেওয়া হোক। কারণ তাদের অফিস থেকে পাওয়া মানসিক চাপ কম করার অন্য উপায় আছে, তাছাড়া হতেই পারে তাদের আলোচনার বিষয়বস্তু এবং বাকিদের আলোচনার বিষয়বস্তু একই ধারায় বইবে না। অভিলাষার ক্লাব-হপিং-এর কথা মেয়েদের জানা নেই এবং প্রাজক্তা ও সাক্ষীর বার-হপিং-এর কথা সরাসরি সর্বসমক্ষে তুলে ধরার সাহস তাদের নেই। সাক্ষী ও প্রাজক্তার সঙ্গে ম্যানেজার গিরিধরের নাম যুক্ত।

তবু সুনইনা বেদান্তিকে বলেছিল, "সাক্ষীটাকে গ্রুপে নেওয়া একদমই ঠিক হয়নি।"

বেদান্তি বলেছিল, ''ওকে বাদ দিলে ও আরও বেশি করে আমাদের সর্বনাশ করবে।''

গ্রহণযোগ্য যুক্তি। প্রাজক্তা শুধু ম্যানেজারের আনুকূল্য পেয়ে অফিস পলিটিক্সকে পেছনে ফেলে অফিসে নিজের উজ্জ্বল ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। সাক্ষী চায় অন্যের চাকরি মেরে নিজের চাকরি বাঁচাতে। সাক্ষীকে নিয়ে আমাদের উভয়সঙ্কট।

ঠিক হয়েছিল আমাদের গ্রুপের কথাটা গোপন রাখা হবে। কিন্তু সাক্ষী পেট পাতলা মেয়ে। কথা কানাঘুষা করা তার স্বভাব। পরদিন অফিসে এসে কাজে মনই লাগছে না। বড় অস্থির। এক ঘণ্টা কোনওরকমে কম্পিউটারের সামনে বসে উঠে পড়ল। নিজেকে প্রচারচক্রে নিয়োজিত করে এর ওর কাছে নানা বাহানায় ঘুরে বেড়ালো দশ মিনিট। গলার আওয়াজ অতি অস্পষ্ট। দশ মিনিট পরে সাক্ষী কাজে মন দেওয়ার চেষ্টা করল। চল্লিশ মিনিট পরে আবার উঠল। রুচিরার মর্নিং শেষ হয়েছে। কিন্তু তার কাজ শেষ হয়নি। সে বাড়ি যাবে। রুচিরা উঠে দাঁড়ালো, ''এই টিকিট নম্বরটা রাখ...''

সাক্ষী বিড়বিড় করল।

''আগে আমার কথা শোন।''

''বল।''

''রিকুয়েস্টার পিং করলে আপডেটটা দিয়ে দিস।''

''ঠিক আছে।'' ঠিক আছে বলেই সাক্ষী আবার বিড়বিড় করে।

প্রাজক্তা বেরিয়ে গেছে। চোখের এক পলক ফেলে আমি দেখলাম, রুচিরা বিরক্তি নিয়েই সাক্ষীর মুখের কাছে কান লাগিয়ে দিল। অতি নিম্নস্বরে কথা। শুধু 'টপ' শব্দটা কানে এল।

সাক্ষী কথা বলতে বলতে এবং রুচিরা কথা শুনতে শুনতে বেরিয়ে গেল বে থেকে। বেরিয়ে যেতেই বেদান্তি বলল, ''দেখলি কুটনীটা কেমন কুট কুট করে বলে দিল?''

সাক্ষীর দ্বারা গ্রুপের প্রচার হওয়ার পরে সেখানে বাকি মেয়েরাও ঢুকে পড়ল। সুনইনার অভিযোগ, প্রাজক্তার টপের কথা সাক্ষী শচীনকেও বলেছে। তবে ক্লিভেজ শব্দটা ব্যবহার কিনা জানে না। না ব্যবহার করে থাকলে অন্যভাবে বুঝিয়ে থাকবে। যেভাবেই বোঝাক, সুনইনা মনে করে শচীনকেও তাহলে আমাদের গ্রুপে নেওয়া উচিত। বেদান্তির গলায় বিদ্রূপের স্বর, ''এই একটা পাগল। শচীন তোর কে?''

''কেউ না। শচীন সাক্ষীর বন্ধু।''

'তুই কি সাক্ষীকে শচীনের সঙ্গেও বারে দেখেছিস?''

''ওটা বার ছিল না, শুধু রেস্টরেন্ট ছিল।''

"প্রতীককে মুঠোর মধ্যে নিয়ে যেখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছিস বল? আর কি কি করেছিল ওর সঙ্গে?"

"মুঠোয় নিয়ে আসতে পারিনি। প্রতীক আমার সঙ্গে একদিন বেড শেয়ার করেছে।"

"জানলে তোর মা-বাবা রেগে যাবেন না?"

"একবারই তো শুধু করেছি।"

ম্যানেজারের টেবিলে লোকার বিরুদ্ধে আমাদের অ্যাপ্লিকেশন অনাদরে পড়ে ছিল। লোকা জানত আমাদের অভিযোগের কথা। বুঝত এব্যাপারে ম্যানেজারের উদাসীনতার কথাও। ম্যানেজার না থাকায় অফিসে মেয়েদের ওপর লোকার অত্যাচার বেড়েই চলেছিল।

আমাদের মেয়েদের ভিডিও কনফারেন্স-এর দিন তিনেক পরে, মর্নিং-এ অফিসে পৌঁছতেই সাক্ষী বলে, "তুই জানিস কি?..."

সাক্ষীর কথা শুরু করার ধরণ ওইরকমই। 'তুই জানিস কি?' বলতে তাকে হবেই। বলে কোন না কোন দুঃসংবাদ দিতে তাকে হবেই। দুঃসংবাদে ভরা থাকে তার অঙ্গ-তন্ত্র। বিশেষত পাচনতন্ত্র। পাচনতন্ত্রে আধিক্য হেতু হজম হয় না দুঃসংবাদ। তাই কখনও মুখ দিয়ে বমির মত বেরিয়ে আসে। সাক্ষী কারও কাছে এসে 'তুই জানিস কি?' বললেই তার মনে প্রশ্ন জাগে 'আজ সে আবার কার চাকরি খেতে চাইছে?'

আমার মনেও একই প্রশ্ন।

সাক্ষী বলে, "লোকা নাইট শিফটে রুচিরাকে 'জাহান্নামে যাও' বলে গালি দিয়েছে।"

"কেন?"

"কেন আবার! এস্কেলেশন।"

"লোকার কাছ থেকে বিশেষ কি আশা করা যেতে পারে! ম্যানেজারের অনুপস্থিতিতে সে যে কোন মেয়েকে অফিস থেকে তাড়িয়ে দেয়নি এটাই অনেক।"

"রুচিরা খুব রেগে গেছে। এবার দেখবি সে-ই লোকাকে অফিস থেকে তাড়াবে।"

হতেই পারে। রুচিরার প্রতি লোকার এই কটূক্তি লোকার ক্ষেত্রে একটা বড় সমস্যা সৃষ্টি করতেই পারে বিশেষত সেখানে যদি সাক্ষী মাথা ঘামিয়ে ফেলে। লোকার সঙ্গে সাক্ষী কোনদিনও সে বোঝাপড়া করতে চায়নি। চাইলে লোকাকে অগ্রাহ্য করে সে গিরিধরের কেবিনে অবাধ প্রবেশের রাস্তায় হাঁটত না।

জিজ্ঞেস করলাম, "কিভাবে?"

"তুই জানিস কি?..." আরেকবার সাক্ষীর একই প্রসঙ্গের মাঝখানে, 'তুই জানিস কি'। সে খুব উত্তেজিত। আমার আশংকাকে ছাড়িয়ে নিশ্চয় আরও কোন গুরুতর খবর তৈরি হয়েছে। "...রুচিরা সঙ্গে সঙ্গে 'এইচ আর'কে লোকার বিরুদ্ধে কমপ্লেন

মেল করেছে। ম্যানেজার সি সি তে।"

যা সম্ভব হবে বলে কখনো ভাবিনি তাই হল। আরও এক সপ্তাহ পরে ম্যানেজার জার্মানি থেকে ফিরলেন। ম্যানেজার আসার পর দু'দিন অতিক্রান্ত হল না, লোকা অফিস থেকে অদৃশ্য হল। কেউ বলল লোকা ব্যাঙ্গালোরে চাকরি পেয়েছে বলে রিজাইন করেছে। কেউ বলল তাকে রিজাইন করতে বলা হয়েছে। কেউ বলল লোকা ব্যাঙ্গালোরে যায়নি, পুনেতেই অন্য একটা কম্পানিতে জয়েন করেছে। যদি তাই হয় তাহলে বুঝতে হবে তাকে ছাড়িয়েই দেওয়া হয়েছে এবং চক্ষুলজ্জা বাঁচাতে সে ব্যাঙ্গালোরে চাকরি পাওয়ার মিথ্যে খবর রটিয়েছে। রুচিরাকে জাহান্নামে যাও বলে লোকা নিজেই জাহান্নামে গেছে।

*****

আভাস আফটারনুন করে আমার বাড়িতে চলে এসেছে। রাতে একাই থেকেছে। আমার ঘরে কোন খাট নেই। ছিল একটা। ঘর সাজানোর মোহে ঘরকে খাটবিহীন করে দিয়েছি। ও এল এক্সের মাধ্যমে ওটাকে বিক্রি করে ছয় হাজার টাকা পেয়েছিলাম। সেই টাকাকেও ঘর সাজানোর কাজে লাগিয়েছি। আভাস মায়ের ঘরেই ঘুমিয়েছে, মায়ের খাটে।

আমি নাইট করে সকাল সাড়ে ন'টায় ফিরেছি। ন'টাতেই জমাটো থেকে দোসা, ইডলি, বড়া, পোহা ইত্যাদি বাড়িতে পৌঁছে গেছে। হোম ডেলিভারি। আভাস আগে থেকেই অর্ডার দিয়ে রেখেছিল। হোম ডেলিভারিতে অ্যানুয়াল মেম্বারশিপ-এর কোন সুবিধে নেই। আধ ঘন্টার মধ্যে স্নান খাওয়া সেরে আমি আভাসের বাহুতে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছি। আভাস আমাকে ঘুম পাড়িয়েছে। অচেতন মনে প্রশান্তি। অচেতন মনে আনন্দও। এই মন গত দুই বছর আগে পর্যন্ত ফিলাডেলফিয়ার সন্দীপের জন্য কত পাগল ছিল। পাগল হয়েছিল পাঁচ বছর আগে। আমি ঠিক করে ফেলেছিলাম সন্দীপের কাছে যাবই। অনলাইনে অনেক জামাকাপড়ের, জুতোর অর্ডার করে ফিলাডেলফিয়াতে সন্দীপের ঠিকানায় ডেলিভেরি নিয়েছিলাম। মা শুনে পাগল। আমি প্রেমে পাগল, মা ভয়ে। মা বলতেন, "এমন করে না রিলি। তুমি কোন ইউনিভার্সিটিতে পড়তে যাও, কোন কম্পানিতে চাকরি নিয়ে যাও। গিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করো, বিয়ে করো। তখন কোন বিপদে পড়লে ইউনিভার্সিটিতেঅথবা কম্পানির ঠিকানা ধরে তোমাকে খুঁজে পেতে আমার অসুবিধে হবে না। ছেলেটি তোমাকে তার আসল ঠিকানা নাও দিয়ে থাকতে পারে।" মায়ের কথা আমার মনে কাঁটার মত বিঁধেছে। তখন আমার হাতে, মনে লাল গোলাপ। গোলাপের কাঁটা আমাকে ফোটে না। মায়ের কথা ফোটে। সন্দীপ আমার থেকে এক বছরের ছোট ছিল, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ত। কলেজে নাকি প্রথম হত। যদি আমি তার এই কথাগুলো বিশ্বাস

করি তাহলে তাই বলতে হবে। নিজের, বোনের, দাদার, বউদির, দাদার মেয়ের চেহারা নিয়ে ছলনাকে ধরে ফেলার পর আমি ওকে ইন্ডিয়াতে আসার জন্য একবছর সময় দিয়েছিলাম। ওর কেবলমাত্র শেষ সেমিস্টার বাকি ছিল। আমি মোটামুটি নিঃসংশয় ছিলাম সে আসবে না। ভারতে ডলার পাঠাতে বললে সে অনতিবিলম্বে 'হ্যাঁ' বলে দেয়, কোন জিনিস পাঠাতে বললে অনতিবিলম্বে 'হ্যাঁ' বলে দেয়। তার ফিলাডেলফিয়ার মনটাকে ভারতে আমার মনের কাছে পাঠাতে বললে সে 'হ্যাঁ' বলার আগেই পাঠিয়ে দেয়। আলোর চাইতে দ্রুত গতিতে চলে মন, যদি একবার মনের সেই গন্তব্যস্থলের দরজা খুলে দেওয়া হয়। তার মানে সন্দীপের মনের দরজাও আগে থেকেই খোলা থাকে। কিন্তু সন্দীপকে ভারতে আসতে বললে সে 'হ্যাঁ' বলার জন্য সময় নেয়। আমি ওকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "তুমি আসবে?" ও বলেছিল, "ভেবে দেখছি।" ভাবার জন্য এক ঘণ্টা সময় দিয়েছিলাম।

"তুমি আসবে?"

"বললাম যে ভেবে জানাচ্ছি!"

আরও এক ঘণ্টা সময় দিই।

"আসবে?"

"হ্যাঁ।"

সন্দীপের সেই 'হ্যাঁ' বস্তুত 'হ্যাঁ' হয়নি। তার জায়গায় 'হ্যাঁ'-এর প্রতিশ্রুতি নিয়ে আভাস এসেছে।

"ও আভাস..." হঠাৎ অন্য পাশ ফিরতেই একটা পা একটা ভেজা কাপড়ের উপর পড়ল। দেখি টাওয়েল। আমার মাথার নিচে বালিশ। বিছানায় শূণ্যতা। আমি একা। আভাস আফটারনুন শিফটে গেছে। স্নান করে ভেজা টাওয়েলটা বিছানায় রেখেছে।

আবার অচৈতন্য। *বয়ঃসন্ধিকালের আমি। বারোবছর বয়স। ক্লাস সেভেনে পড়ি। এখনকার এই মেট্রোপলিস সোসাইটিতে আমি থাকি না। আমি থাকি অপরাজিতা নামের একাকী দাঁড়িয়ে থাকা ছোট বিল্ডিং-এ। বিল্ডিং-এর চারপাশে একটা দেওয়াল আছে, দু'পাশের রাস্তার দিকে দুটো গেট আছে। পাহারাদার-এর অভাবে গেট দুটো কখনো খোলা, কখনো বন্ধ। গেট বন্ধ থাকলেই যে লোকজন দৃশ্যমান হবে না তা নয়। খোলা-মেলা ডিজাইনের গ্রিল-গেট। স্কুলের বাস থেকে নেমে ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে আমি দেখি অভিষেক নামের ছেলেটি কলোনির রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বড় রাস্তার দিকে যাচ্ছে। সে সম্ভবত আমাকে দেখল না। তাই আমিও পেছন ফিরে তার দিকে তাকিয়ে বোঝাবো না আমি তার প্রতি দুর্বল। দুর্বলতার পাকা অর্থ আমি জানি না। কি চাই আমি তার কাছে? মনোযোগ? 'আমি তোমাকে ভালবাসি' লেখা চিরকুট? ভাল লাগালাগির পত্র বিনিময়? আমি ভাবি আমি কি চাই তা নিয়ে ভাবনা*

পরে, এখন আমাকে তাড়াতাড়ি আড়াল হয়ে যেতে হবে। ভারী স্কুলব্যাগটা পিঠে টেনে প্রায় দৌড়েই সিঁড়ির কাছে এসে দাঁড়ালাম। ব্যাগ সিঁড়ির প্রথম ধাপে রেখে নিজেকে হাল্কা করলাম। নিজেও উঠে গেলাম একই ধাপে। সিঁড়ির দেওয়ালে নিজেকে পুরোপুরি ঢেকে দিয়ে গলাটাকে সামান্য প্রলম্বিত করে অভিষেককে দেখার চেষ্টা করলাম। অভিষেক কলোনির রাস্তা থেকে বড় রাস্তায় বাঁ দিকে ঘুরে গেলে এভাবে লজ্জা পেতে হত না। অভিষেক ঘুরল ডান দিকে। ডান দিকে হাঁটতে হাঁটতে সে তার মাথাকে ঈষৎ ডান দিকে হেলিয়ে দিয়ে দেখল আমি লুকিয়ে আছি।

আভাসের সঙ্গে আমার দেখা পরদিন সকালে। সেদিন আগের দিনের সবকিছুর পুনরাবৃত্তি হল—ইডলি, বড়া, পোহা, হোম ডেলিভেরি, আধ ঘণ্টার মধ্যে স্নান-খাওয়া সেরে আভাসের বাহুতে মাথা রেখে আমার ঘুমিয়ে পড়া এবং বিছানায় আভাসের ভেজা টাওয়েলের স্পর্শ। জেগে গিয়ে ওকে ফোন করলাম, "কি করছ?"

"কি করছি হানি?"

"ভেজা টাওয়েলটা রোজ বিছানায় ছেড়ে যাচ্ছ কেন?"

"সরি হানি, ডিউটির তাড়ায় ভুলে গেছি।"

"ওকে।" আবার ঘুমিয়ে পড়ি।

কি ছিল অভিষেকের মধ্যে? তার কি রিলিকে এত আকর্ষণ করত? 'টম হিডেলস্টন'এর মত ফর্সা লম্বা মেদহীন চেহারা? মাথাভর্তি ঘন ফ্যাশন-দোরস্ত চুল? 'থিয়ো জেমস'এর মত যৌবনের কচি লম্বাটে মুখ? কীসের আহ্বান ছিল সেই মুখে? রিলি বৃহস্পতির পাপিলাভ হতে পারে কিন্তু বারো বছরের রিলির পাপিলাভ অভিষেক। রিলির বিকেলের খেলার গ্রুপের মেহা রিলির চেয়ে তিন বছরের বড়। মেহা ক্লাস টেনে পড়ত। তার টিউশনের ক্লাসে অভিষেক আসত। কাছাকাছি কোথাও থাকত। ঠিক কোথায় তা মেহা হয়ত জানত। রিলি মেহাকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিতে পারেনি, লজ্জা পেয়েছে যদিও সে রিলিকে বলেছে, "অভিষেক তোর নাম জিজ্ঞেস করেছিল।"

অভিষেক নামের পাপিলাভের চেহারা, সন্দীপের সেই ধোঁকা দেওয়া মডেলটির চেহারা এবং আভাসের চেহারার কাঠামো অভিন্ন।

আমার নাইট এবং আভাসের আফটারনুন শিফটের পরের দিনও একইভাবে কেটে গেল। আমরা একই ব্রেকফাস্ট করলাম, আমি একইভাবে ঘুমোলাম, আভাস একইভাবে আমায় ঘুম পাড়ালো, আমার ঘুম ভাঙালোও সেই একইভাবে। আমি ওকে ফোন করে বললাম, "এমন করে না হানি। নাইট ডিউটি চলছে। দিনের ঘুম

এভাবে নষ্ট হলে মরে যাব।"

"সরি হানি। আর হবে না, প্রমিস।"

আভাস প্রমিস করলেও মনে অস্বস্তি। ঘুম আসতে সময় নিল।

চতুর্থ দিন আভাস তার প্রমিস ভুলে অফিসে গেল। আমি ওকে আর ফোন করিনি। চোখ বন্ধ করে বিছানায় ঘণ্টাখানেক পড়ে রইলাম। ঘুম না আসার ষাট মিনিটে ষাটটা চিন্তা মাথায় এল। মায়ের কথা মনে পড়ল। মা আমার ছোটবেলায় কখনও 'এই রিলি ওঠো' বলে চিৎকার করে ঘুম ভাঙাননি। উনি আমার মাথায় আলতো করে হাত রাখতেন। স্নেহ মিশিয়ে বলতেন, "উঠবে না? স্কুলের দেরি হয়ে যায়...।" স্নেহ মিশিয়ে? নিশ্চয়! নইলে উনি ঘুম থেকে ডেকে তোলার উপরোক্ত দুটো ধরণের প্রথমটিকে অনুকরণ করতেন। অনেক জ্ঞান আমরা বই পড়ে প্রাপ্ত করি, অনেক জ্ঞান ডিজিটাল মিডিয়া থেকে, অনেক জ্ঞান প্রকৃতি থেকে, অনেক জ্ঞান লোকমুখে শুনে আবার অনেক জ্ঞান নিজেদের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে। আজ আমার জীবনের অভিজ্ঞতা বলছে মায়ের সেই ডাকে নিশ্চয় স্নেহের অগণিত কম্পন ছিল। উনি জানেন এখন আমার নাইট ডিউটি চলছে, তাই কখনও বিকেল পাঁচটার আগে নিজে থেকে ফোন করেন না। আমাকে নিয়ে মন যতই তোলপাড় হোক ওখানকার ঘরে নিশ্চুপ বসে থেকে এখানকার ঘরে নিঃস্তব্ধতা প্রদান করতে চান। তাঁর এই মৌন প্রয়াসের মধ্যেও আমি স্নেহের অগণিত কম্পন অনুভব করি।

অসম্ভব ক্লান্ত, শরীর ভাল লাগছে না। মনও। এই মুহূর্তে সায়লিকে ফোন করে বেশি কথা বলা যাবে না। সে অফিসে। দ্বিধাগ্রস্থ আঙ্গুল দিয়ে মায়ের নম্বার ডায়াল করলাম।

"কি হয়েছে রিলি?" অকারণ অনিষ্ট আশংকায় ভীতসন্ত্রস্ত তাঁর গলা।

"ঠিক আছি মাম্মা..."

"এখন ফোন করলে যে!"

"এমনি। ঘুম আসছে না..."

"আভাস কোথায়?"

"ডিউটিতে।"

"রাত বারোটা থেকে ভোর চারটে পর্যন্ত ঘুমটা শরীরের জন্য খবুই উপযোগী। এই চার ঘণ্টার এক একটি ঘণ্টা জাগার জন্য দিনে দু'গুণ পরিমাণ ঘুমের দরকার।"

"হুঁ।" মাকে বলতে পারি না আমি ঘুমিয়েছিলাম, আমার ঘুম ভাঙিয়েছে আভাস, আমার ভালবাসা, যাকে আমি অসংখ্য মানুষের মাঝখান থেকে নিজপছন্দে তুলে নিয়েছি। আমার ভালবাসা আমার অন্যান্য ব্যাপারে যথেষ্ট খেয়াল রাখলেও উল্লেখযোগ্য 'অপরের নিদ্রাভঙ্গকারী অভ্যেস'-এর কাছে হেরে গিয়ে আমাকে জাগিয়ে দিয়েছে। অন্য সময় হলে বদভ্যাসটিকে আমি উপেক্ষা করতাম কিন্তু নাইট ডিউটি

করে এসে...নাহ্, আর সহ্য হচ্ছে না।

মা বলেন, ''আমি এখন তোমার সঙ্গে কথা বলব না। তুমি বিশ্রাম করো।''

বিশ্রামই হল। ঘুম এল না। শুধু ঘুমের আবেশে পড়ে রইলাম।

পঞ্চম রাতে ডিউটি সেরে সকালে গম্ভীর মুখে বাড়ি ফিরেছি। দেখি টেবিলে জোমাটোর প্যাকেট নেই। গাম্ভীর্যের সঙ্গে বিরক্তি মিশিয়ে ওকে জিজ্ঞেস করলাম, ''কি ব্যাপার! আজ অর্ডার করোনি?''

''তুমি স্নান করে ওয়াশরুম থেকে বেরোনোর আগেই খাবার তোমার মুখের সামনে হাজির হয়ে যাবে।''

মাথায় শাম্পু করেছি। আমার চুল সম্পূর্ণ ভেজা, বলা বাহুল্য ফেস-ওয়াশের করুণায় মুখমণ্ডল থেকে ধুয়ে গেছে সব প্রসাধন। লিপস্টিক, কাজল, নোজ কন্টোর, চিক-বোন কন্টোর, ব্লাশার কিছুই নেই। উন্মুক্ত হয়ে গেছে ঠোঁট, নাক, চোখ, গালের আসল আকার, আসল আকৃতি। উন্মুক্ত হয়ে গেছে আমার মৌলিক চেহারা। গায়ে আছে ঘিয়ে রঙের বাথরোব। শরীরে শুধু আছে সাবান এবং শ্যাম্পুর মিশ্রিত স্নিগ্ধ সুগন্ধ। আভাস বলল, ''অপূর্ব।''

''কি? সাবান, শ্যাম্পুর গন্ধ?'' এসব গন্ধ যে স্নান করে সে পায় না। অন্যরা পায়। যেমন রান্নার ক্ষেত্রে হয়—রাঁধুনি তার সুস্বাদু রান্নার গন্ধ পায় না। যেন রাঁধুনির নিজের রান্নার সঙ্গে অলফ্যাকটরি সেনসরি নিউরোনের শত্রুতা রয়েছে।

একদিন আমি মায়ের সঙ্গে হাতে হাতে মেথি-চিকেন রান্না শিখেছিলাম। সেদিন আমারও ঘ্রাণশক্তি লোপ পেয়েছিল, আমিও রান্নার গন্ধ থেকে বঞ্চিত হয়েছিলাম অথচ সেই একই মেথি-চিকেন মা বানালে আমার ঘরে বসে গন্ধ পাই। আমি পাশের বাড়ির মহিলার অখাদ্য রান্নারও গন্ধ পাই। বিল্ডিং-এর সিঁড়ি বেয়ে নামা-ওঠার পথে একটি মুসলিম পরিবারের ফ্ল্যাটের খোলা দরজা দিয়ে ছড়িয়ে পড়া নানা পদের সুরভি আমার মনকে অশান্ত করে। মনে হয় যেচে ঢুকে পড়ি, চেয়ে খেয়ে অতৃপ্ত আত্মাকে তৃপ্ত করে আসি। মা বলেন, ''ওরা দরজা খোলা রাখে বলে গন্ধ বাইরে ছড়ায়।'' আমাদের রান্নাঘর এবং বসার ঘরের মাঝে পাল্লাহীন দরজা। মায়ের কথা শুনে তাঁর চিলি-চিকেন, মেথি-চিকেন, চিকেন বিরিয়ানি, মাটন বিরিয়ানি, কষা মাংস, দই ইলিশ, পটলের দোলমা, লাউয়ের কোফতা, নলেন গুড়ের পায়েস, গোকুল পিঠে বানানোর দিনগুলোতে আমাদের ফ্ল্যাটের দরজা হা করে খুলে রেখেছি। ভেবেছি গন্ধ রান্নাঘর থেকে বসার ঘর এবং বসার ঘর থেকে বাইরে সিঁড়ির দিকটাতে ছড়িয়ে পড়বে। রান্নাঘরের জানালা বড় করে খুলে দিয়েছি, ভেবেছি সেখান থেকে সামনের ফ্ল্যাটের রান্নাঘরে ঢুকে পড়বে গন্ধ। বসার ঘরের জানালাও পুরো খুলেছি—ভেবেছি রান্নাঘর থেকে গন্ধ বসার ঘরের জানালা হয়ে নিচের ফ্ল্যাটের বারান্দায় পৌঁছবে, সেখান থেকে তাদের বসার ঘরে ঢুকবে। তবু কেউ-ই এসে বলল না 'বাহ্, তোমাদের

ফ্ল্যাট থেকে কি সুন্দর গন্ধ বেরোচ্ছে!'

হাসেন মা, ''ওইভাবে কেউ কাউকে বলে নাকি! তুমি বলেছ?''

''এছাড়া ভাল গন্ধ ছাড়লেই রান্না সুস্বাদু হবে তার কোন মানে নেই।''

''ঠিক কথা।'' আমি রাস্তায় অনেক জায়গায় বিরিয়ানির সুন্দর গন্ধ পাই। আশি বা একশো চল্লিশ টাকায় কিনে দেখি ঝরঝরে খসখসে স্বাদহীন ভাত, মাঝখানে একটি বড় চিকেন অথবা একটি ছোট মাটন এবং একটি বড় আলুর টুকরো। ওই চিকেন বা মাটনের টুকরোটাই আমার একমাত্র আকর্ষণ। মা বলেন, তার চেয়ে বাড়িতে চিকেন বা মাংসের ঝোল ভাত ভাল।

আভাস বলল, ''তোমার চোখদুটো অপূর্ব।''

''কিন্তু এগুলো কি? তুমি গোলারুটি অর্ডার করেছ?'' আমার বিরক্তির মাত্রা বেড়ে গেছে।

''গোলারুটি নয়। ক্রেপে।''

''ক্রেপে!''

''প্যানকেককে ফরাসিতে ক্রেপে বলে। আইকনিক ফ্রেঞ্চ ফুড। রেসিপিটা আমি সকালেই ইউটিউবে পেয়েছি...চার কাপ দুধে চারটে কাঁচা ডিম, দুই কাপ আটা...এক চামচ বাটার...ফ্রায়িং প্যানে ব্যাটারটা এক হাতা করে ঢেলে দিয়ে গোলারুটির মতই ভেজে বানানো...গোলারুটিই আর কি! কানাডা, বেলজিয়াম এবং ইউরোপের আরও অন্যান্য দেশের লোকদের মধ্যে ক্রেপে খাওয়ার চল আছে। আমার জানাই ছিল না।''

রাগ একটুখানি নিচের দিকে, ''হোক না দেরিতে, জানলে তো!''

''একটা সুখবর আছে।''

''কি?''

''রেড হ্যাট-এ আমার সুইচ হয়েছে।''

''গুড্! তোমার ভেজা টাওয়েলের ব্যাপারটাকে আজ মাফ করে দিলাম, কিন্তু...''

আভাস তাড়াতাড়ি মায়ের বেডরুমের দিকে ছুটে গেল। বোধ হয় সে টাওয়েলটা বিছানা থেকে উঠিয়ে বারান্দায় মেলল।

''এবার থেকে খেয়াল রেখো কেমন?''

''ওকে হানি।''

''কবে জয়েনিং?''

''মার্চে।''

আভাসকে ইনফোওয়েব সার্ভিসস প্রাইভেট লিমিটেড-এ একমাসের নোটিশ দিতে হবে। ইনফোওয়েব সার্ভিসস প্রাইভেট লিমিটেড-এ তার অ্যানুয়েল প্যাকেজ

তিন লাখ কুড়ি হাজার। রেড হ্যাট-এ সেটা বেড়ে চার লাখ নব্বই হাজার হবে।

জিজ্ঞেস করি, ''মা-বাবাকে জানিয়েছ।''

''বিকেলে বাড়ি যাব।''

''তোমার ডিউটি?''

''ছুটি নেব আজ।''

যথারীতি আভাসের বাহুবন্ধনে আমি অচেতন পড়ে। আভাসের হাতে অনেক সময়, সে অফিসে যাবে না। হঠাৎ করে 'আমি আসতে পারছি না' বলতে তার ভয় নেই। অফিস তাকে ছাড়িয়ে দিলে দেবে। আভাসকে নতুন চাকরি ডাকছে। আজ বিছানায় আভাসের ভেজা টাওয়েল নেই। আমি অনেকক্ষণ ঘুমবো। এক সপ্তাহের ঘুমের কোটা নিশ্চিন্তে পূরণ করব।

প্রোজেক্টে টিমলিড নেই। টিমলিডের অভাবে মেয়েরা যে যেভাবে পারছিল তাদের সেরা কার্যক্ষমতা প্রদর্শন করছিল। কিন্তু তাতে সাক্ষীর মনের জ্বালা আরও বেড়ে গিয়েছিল। সে আমাদের সঙ্গেই 'বে'তে টিফিন করতে যায়, নিচে লাঞ্চ করতে যায়, সবার সঙ্গে হায় হেলো করে, যেচে কথা বলে। লাঞ্চ শেষ করে উপরে যেই আসে কারো ভুল টিকিট দেখলেই ম্যানেজারের সামনে চিৎকার করে বলে, তুই ভুল রাউট করেছিস। মেয়েরা বলাবলি করে, কিরকম মেয়ে রে বাবা!

কোন মেয়ে টিকিট ভুল রাউট করলেই তা ভুল ল্যান্ডস্কেপ-এ পড়ে থাকবে এমন নাও হতে পারে। লেভেল টু'তে যারা প্রবলেম সলভিং করছে তারা ইতিমধ্যেই লেভেল ওয়ান থেকে অভিজ্ঞতা নিয়ে এসেছে। সঠিক ল্যান্ডস্কেপে তারা টিকিটটা রাউট করে দিতেই পারে।

সাক্ষীর আচরণটাই মেয়েদের পছন্দ নয়। তাই তারা পেছনে ওর সমালোচনা করে। যা মনে আসে তাই-ই বলে ওকে ডাকে। বেদান্তি সাক্ষীকে কুটনী বলে, উজ্জ্বলা হামারজাদি বলে, ললিতা বলে মন্থরা।

বেদান্তি বলেছিল, ''কোনদিন দেখব ম্যানেজার সাক্ষীকেই টিমলিড বানিয়ে দিয়েছেন।''

প্রাজক্তা মনে ভয় রেখেও বেদান্তির আশংকাকে জোর করে উড়িয়ে দিতে চেয়েছে, ''তাই কখনো হয় নাকি!''

''টিমলিডের স্যালারি না দিলেও ম্যানেজার টিমলিডের কাজটা সাক্ষীকে দিতেই পারেন।''

প্রাজক্তা হিড়হিড় করে বেদান্তি এবং আমাকে দু'হাতে টেনে নিয়ে ম্যানেজারের কাছে গিয়েছিল। লোকার রোস্টার নিয়ে অভিযোগপত্র তখনও তাঁর টেবিলে পড়ে। সেই পত্র এখন অর্থহীন। লোকাই নেই অফিসে। এবার আমাদের অন্য

অনুরোধ—একজন টিমলিড দরকার। ম্যানেজার ঝানু লোক। উনি নিজেও বুঝেছেন এত বড় কম্পানিতে এত বড় প্রোজেক্ট টিমলিড ছাড়া চলছে এটা প্রচার হয়ে গেলে কম্পানির জন্য রীতিমত লজ্জাকর ব্যাপার হবে, উপরন্তু পরবর্তীতে কম্পানির নতুন প্রোজেক্ট পেতেও অসুবিধে হবে। তবু তিনি নতুন কাউকে অ্যাপয়েন্ট করার বিবেচনা মাথায় নিয়ে এলেন না। শচীনকে শিফটলিড বানালেন। কম্পানিতে তিনটি শিফট। সুতরাং আমাদের তিনটে শিফটলিড থাকা উচিত। কিন্তু না, ম্যানেজার আর দুটো শিফটের কথাও ভাবতেই পারলেন না। মনে করলেন একজন শিফটলিডই যথেষ্ট। টিমলিডহীন তিন শিফটের প্রোজেক্টে একজন মাত্র শিফটলিডকে বহাল করতে পারার গর্ব নিয়ে তিনি পরদিনই হাতে একটা বড় প্লাস্টিক মোরগ নিয়ে অফিসে ঢুকলেন। স্থান দিলেন তার কেবিনের টেবিলে।

শচীন শিফটে এসে টিমলিডের কাজ সারে। যখন যে শিফট-এ থাকে সেই শিফটকে বেশি এবং অন্য শিফট দুটোকে কম লিড করে। মাসের বেশিরভাগ সময়টাতেই তার শিফটের সঙ্গে বেশিরভাগ মেয়ের শিফট ম্যাচ হয় না, তবু সে শিফটলিড। উড়ো উড়ো শিফটলিড।

ঘণ্টার কাঁটা ঘুরতে না ঘুরতেই আভাস আমাকে জাগিয়ে দিল, ''উফ্, দেখো তো মেয়েটা বারবার কেন ফোন করছে?'' আমার মোবাইল ভাইব্রেশন মোড-এ রাখা।

সুনইনা বলল, ''শচীন চৌদ্দটা টিকিট আলাদা করেছে। তার মধ্যে দুটোতে তোর নাম।''

''কেন?''

''ভুল রিজিয়ন অ্যান্যালিসিস হয়েছে।''

''বাকি বারোটাতে কার নাম?''

''সাক্ষীর।''

''সেই দুটো টিকিটও সাক্ষীর ছিল। ভুল অ্যান্যালিসিস সে-ই করেছিল। সেখান থেকে ফোন পেয়ে আমি সঠিক জায়গায় পাঠিয়েছিলাম।''

''আবার ভুল রাউট হয়েছে এবং তুই পরে পাঠিয়েছিস বলে শচীন তোকেই দায়ী করেছে।''

সুনইনাকে জিজ্ঞেস করলাম, ''বাকি বারোটা নিয়ে শচীন কি বলছে?''

''সাক্ষী শচীনের সঙ্গে কথা বলে ওর ভুল চেপে দিয়েছে।''

'লেভেল টু' নেট ওয়ার্কিং ডিভাইস-এর মধ্যে কমান্ড ঢেলে লগ ইন করে। তারপর আবার কমান্ড ঢেলে ঢেলে প্রবলেম সলভিং। ভুল কমান্ড বা অর্ধেক কমান্ড টাইপ করলে ডিভাইস বন্ধ হয়ে যেতে পারে। একটা ডিভাইসের সঙ্গে অনেক ডিভাইস যুক্ত থাকায় আবার সবাইকে লগ ইন করতে হয়। লেভেল টু অর্থাৎ প্রবলেম সলভিং

লেভেলে একজনের এস্কেলেশন সবার কাজে ব্যাঘাত ঘটায়। তাই যে ভুল করেছে তাকে বের করে দেওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু লেভেল ওয়ান বা ইনফরমেশন গ্যাদারিং অ্যান্ড অ্যানালাইজিং লেভেলের এস্কেলেশনগুলো অনেক ক্ষেত্রেই পারস্পরিক বোঝাপড়া দিয়ে সামলে নেওয়া যায়।

সুনইনা আমাকে সাবধান করে, "তোকে শচীনের সঙ্গে কথা বলতে হবে। নাহলে..."

"নাহলে কি?"

"ভুলে গেছিস। তোর আগেও একবার এস্কেলেশন এসেছে।"

"মাত্র একবার। সেটা নিয়ে অফিসে কোন শোরগোল হয়নি। তোর ক'বার এসেছে?"

"চার বার।"

"প্রাজক্তার?"

"তিন বার।"

"বেদান্তির?"

"মনে হয় তিন বার।"

"কানুপ্রিয়ার?"

"মনে নেই।"

"উজ্জ্বলার?"

"মনে নেই।"

"আমি মনে করিয়ে দিচ্ছি। বেদান্তির চার বার, কানুপ্রিয়ার তিন বার, উজ্জ্বলার তিন বার, অভিলাষার তিন বার এবং সাক্ষীর ছয় বার। আমি আমার মোবাইলের 'কালার নোট'এ নোট করে রেখেছি।"

"বাব্বা, বেদান্তির চার বার এস্কেলেশন! তবু সে তোকে নিয়ে এরকম কথা বলল!"

"কি বলেছে?"

"তুই অফিসে আয়, বলব।"

ভাবলাম, সুনইনাকে চাপ দেব বেদান্তি আমাকে নিয়ে কি বলেছে জানার জন্য কিন্তু তার আগেই সে আমাকে অন্য আরেকটি খবর শোনালো, "তুই জানিস না, প্যানাসিয়া স্টোরেজ প্রোজেক্টটা পেয়ে গেছে। এস এ পি নেট ওয়ার্কিংকে স্টোরেজ নেট ওয়ার্কিং-এর সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে প্যানাসিয়া তার নাম স্টোরেজ নেট ওয়ার্কিং-ই রেখেছে।"

"এটা তাহলে একটা নতুন প্রোজেক্ট। কম্পানি চালাকি করেছে। আমাদের ইন্টারন্যাল পোস্টিং এবং কম্পানিতে নতুন কোন পোস্ট-এর আবেদন করার ব্যাপারটা

আরও ছ'মাস পিছিয়ে গেল।"

"স্টোরেজ নেট ওয়ার্কিং-এ স্টোরেজ সাবডিভিশন খোলা হয়েছে। ম্যানেজার তার জন্য সাক্ষী এবং বেদান্তিকে তিনদিনের ট্রেনিং দিয়েছেন।"

একইসঙ্গে অবাক এবং আহত হলাম। এতক্ষণ আভাসের হাতের উপরই আমার মাথা ছিল। আমি শুয়ে ছিলাম। স্টোরেজ ট্রেনিং আমাকে ধড়াম করে বিছানার উপর বসিয়ে দিল। আভাসও উঠে বসল। আভাসকে বললাম, "স্টোরেজ-এর জন্য প্রেজেন্টশন আমি দিয়েছিলাম। ম্যানেজার প্রোজেক্ট হাতে পেতে আমাকে কাজে লাগালেন আর প্রোজেক্ট হাতে এলে বেদান্তিকে ট্রেনিং দিলেন! ম্যানেজারের সঙ্গে সাক্ষী এবং প্রাজক্তা দু'জনেরই অফিসের বাইরে মেলামেশা আছে কিন্তু প্রাজক্তা কিভাবে ট্রেনিং থেকে বেরিয়ে গেল? বেদান্তিটাই বা কিভাবে ঢুকে পড়ল?"

"বেদান্তি তোমার জায়গায় ঢুকেছে," আভাস আমার কানে ফিসফিস করে।

"প্রাজক্তা বেরোল কিভাবে?"

"কিছু ঘোটালা হয়ে থাকবে।"

সুনইনা বলল, "স্টোরেজ সাবডিভিশনে আটান্নটা নতুন পোস্ট তৈরি করা হয়েছে। তাদেরকেই অ্যাপয়েন্ট করা হবে যাদের 'এস এস পি'রও অভিজ্ঞতা আছে। কাজেই কম্পানি যে কোন মুহূর্তে আমাদের যে কাউকে তাড়াতেই পারে।"

"তাতে লেভেল ওয়ানে কতজন থাকবে?"

"জানি না।"

অভিলাষাও নাইট ডিউটি করে বাড়ি গেছে। ওকে ফোন করলাম। সে বলল সে জানে না। প্রাজক্তা আফটারনুন শিফট-এ যাবে। প্রাজক্তাকে ফোন করল অভিলাষা। প্রাজক্তা বলল সেও জানে না। প্রাজক্তা উজ্জ্বলা এবং কানুপ্রিয়াকে ফোন করল। উজ্জ্বলা, কানুপ্রিয়া কারো কাছে স্টোরেজ সাবডিভিশন ও তার আটান্নটা নতুন পোস্ট-এর কোন খবর নেই। আমরা ভয়েস কনফারেন্সে এলাম।

কানুপ্রিয়া জিজ্ঞেস করল, "সুনইনা কিভাবে খবর পেল?"

প্রাজক্তার সন্দেহ সবকিছুতেই সাক্ষীর ওপর। বলল, "হয়ত সাক্ষীর কাছে।"

উজ্জ্বলা জিজ্ঞেস করল, "সাক্ষী কিভাবে জানল?"

অভিলাষা বলল, "সে শচীনের কাছে জেনেছে।"

"কখন?"

"ওর এস্কেলেশন নিয়ে শচীনের সঙ্গে যখন কথা বলেছে তখন।"

রাতে সাক্ষী আমার সঙ্গেই কাজ করেছে। মানে আমার শিফটে আমারই অলক্ষ্যে সে তার বারোটি এস্কেলেশন শচীনকে দিয়ে 'লেভেল টু'তে কথা বলে সামলে নিয়েছে এবং দুটো এস্কেলেশন আমার কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে একটা বড় ইস্যু বানিয়ে দিয়েছে! সাক্ষী শুধু নিজের জন্য করে। অন্যের সময় চিৎকার করে মরে।

"কি হবে আভাস?"

"কিছুই হবে না।"

"ভয় তো একটু করছেই। আমি ফায়ারড হয়ে যাব।"

"চিন্তা করো না। এসব হতেই থাকে। বড় ব্যাপার নয়।"

"ফায়ারড হলে কি করব?"

"আমি রেড হ্যাট-এ সুইচ করলে সেখানে তোমার নাম রেফার করব।"

সুনইনা ফোন করে জিজ্ঞেস করল, "তুই শচীনের সঙ্গে কথা বলেছিস?"

"শচীনকে আমি ফোন করব না। পরশু অফিসে এসে সরাসরি ম্যানেজারের কাছে যাব।"

আভাস বলল, "তৈরি হয়ে নাও।"

সাজতে ইচ্ছে করল না।

অফিসটা ধীরে ধীরে আরও অসহনীয় হয়ে উঠছে। ভাবছি কাল থেকে অফিসে কালো লেগিন্স এবং হাঁটু পর্যন্ত লম্বা কুর্তা পরে যাব। প্রতিদিন আমার গায়ে ওই একই পোশাক থাকবে। ওটাই আমার ইউনিফর্ম হবে। অফিসের ইউনিফর্ম না থাকুক, আমি নিজেই আমার জন্য ইউনিফর্ম নির্দিষ্ট করে নেব। মুখেও কোন মেক-আপ করব না।

আভাস বলে,"তুমি কি পাগল হয়ে গেলে?"

"লাভ নেই, কোন লাভ নেই।"

"আমার বিশ্বাস তুমি অফিসে গিরিধর বা গিরিধরের মত মানুষকে আকর্ষিত করার উদ্দেশ্যে সাজো না," মুচকি হেসে সে টিপ্পনী কাটে।

বিরক্ত হই,"এই, তোমাকে ছুটি নিতে হবে না।"

"রেগো না। আমি বলতে চাইছি আমরা সাজি নিজেকে সর্বসাধারণের কাছে সামগ্রিকভাবে উপস্থাপনযোগ্য করে তুলতে।"

"আমিও তাই ভাবতাম। কিন্তু এখন ভাবছি আমাদের দেশে রাজনীতিবিদরা বিশেষত মহিলা রাজনীতিবিদরা, সমাজসেবকরা বিশেষত সমাজসেবিকারা, শিক্ষকরা বিশেষত শিক্ষিকারা, লেখকরা বিশেষত লেখিকারা সাধারণত সাজেন না...."

"সমাজসেবিকা, শিক্ষিকা, লেখিকা শব্দগুলোকে আলাদা করে উচ্চারণ করছ কেন?"

"কারণ বর্তমানে আমরা তাঁদের লিঙ্গবিশেষে আলাদা করি না। বিশেষত

ইংরেজিতে সবাই পলিটিশিয়ান, সবাই সোশ্যাল ওয়ার্কার, সবাই টিচার, সবাই অথার।"

"হ্যাঁ, সবাই অ্যাক্টরও।"

আমি আগের কথায় ফিরে যাই, "অনেক রাজ্যে উচ্চ চিন্তাভাবনা নিয়ে চলছেন এমন চেহারা পোষণকারী মহিলারা একদমই সাজেন না। বিয়ের পরেও দেখো না... কিছুদিন পর্যন্তই... তারপর এক দুটো বাচ্চার মা হয়ে গেলে অনেক মহিলাই চেহারা এবং মন দুটোতেই ভারী হয়ে যান। দেখে মনে হয় না সাজ নামক শব্দটার সঙ্গে কস্মিনকালে তাঁরা পরিচিত ছিলেন। সুতরাং আমি অফিসের জন্য নাই-বা সাজলাম।"

"অনেকের অর্থনৈতিক অবস্থাও সাজার প্রতিকূল থাকে। অফিসের অন্যান্য মেয়েরা কি করে?"

"সাজে, সে যতই কাজের চাপ থাকুক, যতই শরীরে ব্যথা থাকুক...বেদান্তি আমার কাছেই সাজ শিখল..."

বেদান্তি মেয়েটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ তৈরি হওয়ার পরে ধীরে ধীরে আমার কাছে সহজ হয়েছে। একদিন আমাদের বাড়িতে এসেওছে। আমার ঘরের সব জিনিস নেড়ে-ঘেঁটে জিজ্ঞেস করেছে এটা কি, ওটা কি। আধুনিকতম সাজের সরঞ্জাম কি করে ব্যবহার করতে হয় জেনেছে। আমি সায়লির মত ওকেও আমার জামা পরিয়েছি। আমার ইনস্টাগ্র্যামে পঞ্চাশ হাজার ফলোয়ার দেখে সে নিজেরও ফলোয়ার বাড়াত চেয়েছে, ঘরের বিভিন্ন অংশকে ব্যাক ড্রপ-এ রেখে বিভিন্ন ভঙ্গীতে ফটো তুলেছে, ডার্করুম ফটো এডিটিং অ্যাপ ডাউনলোড করে আমার সাহায্যে ফটো এডিট করেছে এবং সেগুলোকে আপলোড করেছে। তাতে করে তার পাঁচটা ফলোয়ার বেড়েছে। দুটো একত্রিশ থেকে দু'শো ছত্রিশ হয়েছে।

প্রোজেক্টের একটা ককটেল পার্টি ছিল। কিউবকল থেকে অনতিদূরে একটা হোটেলের ব্যাঙ্কয়েট হল ভাড়াতে নেওয়া হয়েছিল। দেখা গেল বেদান্তি ফুলে ফলে সবজিতে সেজে হাজির। মেয়েরা মুগ্ধ। অনেক কষ্টে যদিওবা এই মুখের সঙ্গে বেদান্তি নামক মেয়েটির মুখের মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে, এই শরীরের সঙ্গে বেদান্তির শরীরের একদমই মিল নেই! মনে হচ্ছে কোনভাবে তার মুখের রূপান্তর ঘটিয়ে গলা-কাটা শরীরে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। তা না হলে—তা না হলে বেদান্তির বাতাসদৃশ শারীরিক ফ্রেমের বক্ষদেশের সমতলে কেউ দুটো ডালিম বসিয়ে দিয়েছে, নিতম্বদেশে উল্টো করে বসিয়েছে অর্ধবিভক্ত সংযুক্ত কুমড়ো।

কালো রঙের জিনস এবং ছাই রঙের ওয়ান-শোল্ডার-টপ পরেছিল বেদান্তি। সুনইনা জানে চিক-বোন কন্টোর লাগালে চিক-বোনগুলো উঁচু লাগে, মনে হয় দু'চোখের নিচে ত্বকের মধ্যে ঢুকে গিয়ে দুটো টমেটো গালের উচ্চতা বৃদ্ধি করেছে;

নোজ কন্টোর লাগালে নাক উঁচু লাগে, মনে হয় নাকের গর্তকে আবৃত করে দাঁড়িয়ে পড়েছে পানিফল, নাককে উচ্চতা দিয়েছে; তাই বলে বুবস! বুবস কন্টোরও কি মেয়েরা ব্যবহার করছে আজকাল! সুনইনা পেন দিয়ে বেদান্তির বুকে গুঁতো দেয়, "সাইজ বড় লাগছে কেন?"

গুঁতো খেয়ে বেদান্তি ছিটকে তিন ফুট দূরে, উজ্জ্বলার গায়ের উপর। "আরে, আমি পুশ-আপ ব্রা পরেছি।"

"ব্রা-এর ফিতে কোথায়?" বেদান্তির খালি কাঁধ মাকুন্দর মুখের মত ছিলছিল করছে। সেখানে একটা সুতো পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না।

"আমি স্ট্র্যাপলেস পুশ-আপ ব্রা পরেছি।"

"তাই বল।"

'তাই বল' বলে সুনইনা ভ্রূ কুঞ্চিত করে। সন্দেহ তবু থেকেই যায়। "সাইজ এত বড় হল কি করে?"

"আমি ডাবল পুশ-আপ ব্রা পরেছি।"

"ডাবল পুশ-আপ?" ভ্রূ তার আর সোজা হয় না।

"থিকলি প্যাডেড।"

সুনইনা বেদান্তির দিকে তিন ফুট এগিয়ে যায়। এবার গুঁতো পাছায়, "আর এটার?"

লাফিয়ে আরও তিন ফুট দূরে সরে যায় বেদান্তি। এবার ধাক্কা প্রাজক্তার সঙ্গে। "আহ্, আমি বাটক পরেছি।"

ডাবল পুশ আপ ব্রা কি হতে পারে তার অনুমান লাগাতে পেরেছিল সুনইনা। কিন্তু বাটকটা কি? জিজ্ঞেস করে, "বাটক?" ডাবল পুশ-আপ, বাটক-এর কথা আমার বাড়িতে আসার আগে পর্যন্ত বেদান্তিও জানত না। মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই হাল-ফ্যাশনদোরস্ত হয়ে গেছে সে।

"সিলিকন ভরা শেপার প্যান্টি।"

"শেপার প্যান্টি?" কৌতূহলের শেষ নেই সুনইনার। শেপার শব্দটা প্যান্টির সঙ্গে জুড়ে কি অর্থ তৈরি করতে পারে তারও ধারণা লাগাতে পারছে না।

"যে প্যান্টি শেপ দেয়।"

মুখ দেখে মনে হল সুনইনা তবু পুরোপুরি বোঝেনি। কিন্তু বারবার প্রশ্নের দ্বারা নিজের নির্বুদ্ধিতা জাহির না করে, 'ওহ্, তাই বল' বলে কৌতূহলসূচক প্রশ্নের লাইনে দাঁড়ি টানে।

প্রাজক্তা এবং উজ্জ্বলাও বোঝা না বোঝার মাঝখানে ঝুলছে।

বেদান্তি বলে, "আগামী সপ্তাহে আমেরিকার ছেলেটা আমাকে দেখতে আসবে।"

প্রাজক্তা জিজ্ঞেস করে, "কোথায়?"

"বাড়িতে। আমাকে দু'দিনের ছুটি নিতে হবে।"

অভিলাষা বলল, ''ছেলের বাড়ির লোকের সামনে এসব পরিস না।''

''কেন?''

''ফুলশয্যার পরদিনই দেখবি বর তোকে বাপের বাড়িতে ফেরত দিয়ে যাচ্ছে। কোর্টে চিটিং-এর কেস উঠে যাবে।''

সুনইনা অভিলাষার রসিকতার স্বাদ নিতেও ব্যর্থ। কারণ শেপার প্যান্টি কি জিনিস, কি তার কাজ এখনো তার অজানা। বেদান্তির পাছায় আবার গুঁতো মারে সে, ''কালকে অফিসে নিয়ে আসিস। টাইপটাকে একবার ভাল করে দেখে নেব। আমাকেও কিনতে হবে।''

এতক্ষণ পরে সাক্ষী ছুটে আসে, ''কি করছিস সব? এখানে শুধু আমরা লেভেল ওয়ান-এর মেয়েরাই নেই। শচীন এসেছে, অন্য লেভেলের সিনিয়র ছেলেমেয়েরাও এসেছে। ম্যানেজারও...''

সুনইনা বেদান্তিকে বলল, ''ম্যানেজার তোকে দেখছেন। আর গুঁতো দেব না। ম্যানেজারের চোখের ক্যামেরায় গুঁতোর ভিডিও উঠে যাবে।''

''এই, তোর ইনস্টাগ্র্যামে ফলোয়ারস কত রে?'' জিজ্ঞেস করল প্রাজক্তা।

''দু'শো ছত্রিশ।''

''কাল সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখবি একটা ফলোয়ার বেড়েছে।''

সুনইনার প্রশ্ন, ''কেন?''

''এই মেয়েটা একটা বুদ্ধু। কিছুই বুঝতে পারে না। আরে বাবা, ম্যানেজার রাত জেগে জেগে ফলো করবেন বেদান্তিকে।''

ভাবি ম্যানেজারের মনের কথা প্রাজক্তা এবং সাক্ষীর চাইতে বেশি আর কে জানে!

আভাসকে বলি, ''চেহারা, ভাষার ওপর দক্ষতা, কাজে দক্ষতা কোনকিছুই কোন কাজে আসে না। আমি গিরিধরের ডিনারের প্রস্তাবকে অনাদর করেছি তাই তিনি তাঁর চাওয়ার শাখাটাকে বেদান্তির দিকে প্রসারিত করেছেন। উদ্ভিদের বেঁচে থাকার জন্য জল এবং আলো চাই-ই চাই। যেদিকে আলো থাকে সেদিকে উদ্ভিদ তার কাণ্ডের শাখা লম্বা করে, যেদিকে জল থাকে সেদিকে সে লম্বা করে তার মূলের শাখা।''

''রিলি, তুমি বুদ্ধিমতী মেয়ে, আমি তাই তোমাকে এত পছন্দ করি।''

''কিন্তু গিরিধর একটা চতুর লোক। শুধু চতুরই নয়, ক্ষতিকর। আমি ওঁকে খুবই অপছন্দ করছি।''

''সে তোমার কোন ক্ষতি করেনি।''

''করেছে।''

''কি ক্ষতি?''

"মানসিক ক্ষতি। উনি আমার মানসিক ক্ষতি করেছেন। এমন হবে জানলে আমি প্রেজেন্টেশন দিতাম না।"

তুমি না দিলে অন্য কেউ দিত। বরং তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকো উনি তোমাকে প্রেজেন্টেশন দেবার জন্য যোগ্য মনে করেছেন বলে।"

অনেকটা মায়ের মত করে বিশ্লেষণ করে দিল আভাস। আমার জীবনে ধীরে ধীরে আভাসের ভূমিকা বাড়ছে এবং মায়ের ভূমিকা কমছে। অফিস পলিটিক্সের এত ভয়ংকর, জটিল, কুটিল প্রভাব আমার ওপর তবু আমি মাকে যখন-তখন ফোন করছি না। ফোন করলাম সুনইনাকে, "বল, বেদান্তি আমাকে নিয়ে কি বলেছে।"

"বলেছে, এই মেয়েটা কি রাতে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কাজ করে!"

বেদান্তির আমার পেছনে পড়ার কারণ আছে। পার্টির রাতে ম্যানেজারের নোংরা নজর কাড়ায় তার মনে বিশ্বাস বাসা বেঁধেছিল। মালপত্র গায়ে চড়িয়ে মেক-আপ করে অফিসে এসে টিফিনে, লাঞ্চে আমাকে জোর করে সঙ্গে নিয়ে কিউবকলের ভেতর বেদান্তি ঘুরে বেড়ায়। নানা রকম বিদঘুটে বিদঘুটে পোজ দিয়ে বলে ফটো তোল। তিন-চারদিন তুলে দিয়েছি। ফটো সে নিয়মিত ইনস্টাগ্র্যামে পোস্ট করেছে। তিপান্নটা ফলোয়ারস বাড়িয়েছে। ফলোয়ারস বেড়েছে তাতে আমার হিংসে হয়নি। আমার ফলোয়ারস-এর সংখ্যা এক লাখ তিন হাজার। কিউবকলের মধ্যে ওর এমন আচরণে আমি খুব লজ্জা পেয়েছি।

সুনইনা বলে, "বেদান্তি সাক্ষীকে কুটনী বলে এখন নিজেই কুটনামি করছে। দু'জনার খুব ভাব হয়েছে।"

আমার আভাসের সঙ্গে প্রথম সাক্ষতের দিনে আমি বাড়িতে থেকেই সবরকম সাজগোজ করেছিলাম। পুশ আপ ব্রা, বাটক তো ছিলই। তাছাড়াও নকল চোখের পাতা যাকে বলে ফলস আই লিডস, নকল নখ যাকে বলে ফলস নেলস, নকল চুল যাকে বলে উইগ। আই লাইনার এবং লেন্স আমার চোখকে পুরো মায়াবী করে তুলেছিল, লিপস্টিক ঠোঁটকে বানিয়ে দিয়েছিল গোলাপের পাপড়ি। পরে আভাস সব নকল ছাড়া আসল আমাকে দেখেছে। দেখে হতাশ সে হয়নি। প্রসাধন সাময়িক, আকাশে ভেসে বেড়ানো মেঘের বাহার। প্রসাধন হল পাকা বাড়ির ছাদ-এ, সিলিং-এ, কলাম-এ, দেওয়াল-এ, লিন্টেল-এ এবং জানালা-দরজায় মানানসই চড়ানো রঙ। বাড়ির ডিজাইনটাই যদি চিত্তহারী না হল, রঙ ছড়িয়েও বাড়ি কতই বা মন কাড়বে! অনেক বাংলোতে আমি রঙ-ই দেখি না, অথবা দেখলেও তাতে ইটের বা সিমেন্টেরই রঙ দেখি অথচ কি অপূর্ব লাগে। সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতে আমি আমার শরীর থেকে কিছু উপকরণের স্থায়ী বিয়োগ ঘটিয়েছি। যেমন পেট এবং হাত থেকে লাইপোসাকশন দ্বারা ফ্যাট বের করেছি। লেজার দ্বারা অনেক জায়গায় অপ্রয়োজনীয় চুলের বৃদ্ধি নষ্ট

করে দিয়েছি। আমার দাঁতেরও চিকিৎসা হয়েছে। রিটেনার বসানো আছে দাঁতের পেছনে।

বিকেলবেলা ঘুরতে ঘুরতে আভাসের বাড়ির দিকেই আবার গেলাম। ওর গাড়িতে ওরই বাড়ির কাছাকাছি একটি রাস্তার ধারে গিয়ে বসে আছি। হঠাৎ সাক্ষীর কল, "ওই দুটো ট্রাবল টিকেট ছিল। তোকে লেভেল ফোর-এর অ্যাপ্রুভাল নিতে হত। দেখ ম্যানেজার কালকে তোকে কি বলেন।" পড়ে আসা গলা তার। মনে হয় বিকারহীন। কিন্তু এই গলাতেই অনেক দম আছে। আগামীকাল সকালে গিয়ে সে প্রথমে ম্যানেজারকে ধরবে। আমার বিরুদ্ধে তাঁর মগজ ধোলাই করবে।

"ম্যানেজার কি বলবেন সেটা নিয়ে আমি ভাবছি না।" আমি ভাবছি হয় তুই অফিসে থাকবি নয় আমি। মনকে ঘুরিয়ে নিতে আভাসকে বললাম,"চলো না তোমাদের বাড়ি।"

"এখন আমাদের বাড়ি গিয়ে কি করবে?"

"তোমার মায়ের সঙ্গে কথা বলব।"

"আমার মা তোমার কোন সমস্যার সমাধান দিতে পারবেন না।"

"তোমার বোনের সঙ্গে পরিচয় করব।"

"বোন বাড়িতে নেই।"

"কলেজে গেছে বুঝি?"

"হ্যাঁ।"

আভাস বলেছিল ওর বোনও ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে। ওরই কলেজে, সেকেন্ডে ইয়ারে।

"তবু চলো।"

অনিচ্ছা নিয়ে আভাস গাড়ির চাকা ওর বাড়ির দিকে ঘোরালো।

আজ আভাসের বাড়িতে যাওয়াটা একেবারেই অকস্মাৎ। বিল্ডিং-এর নিচে ভদ্রমহিলা অন্য একজন মহিলার সঙ্গে কথা বলতে ব্যস্ত। যেন আমাকে দেখতেই পেলেন না। অথবা চিনতে পারলেন না। যেহেতু আমার মেক-আপ নেই। সিঁড়িতে পা রাখতে রাখতে আভাস বলল,"রিলি।" তিনতলায় তাদের ফ্ল্যাট।

"তোমরা যাও। আমি আসছি।"

আমরা বাইরের ঘরে বসে আছি। আবার সাক্ষীর ফোন,"শচীন রিজল্ভ করে দিয়েছে ম্যাটার।"

"ঠিক আছে।"

"তবু ম্যানেজার 'মাইক্রোসফট টিমস'এ কথা বলবেন।"

"টিমস-এ এখন কথা বলার কি প্রয়োজন?"

"আমিই ম্যানেজারকে কল করতে বলেছি। সবার জানা দরকার কোথায় কার কি সমস্যা হচ্ছে।"

ম্যানেজার ফোন করলেন। গ্রুপে শচীন, সাক্ষী, সুনইনা, অলিভাষা, বেদান্তি, ম্যানেজার এবং আমি। শচীন বলল,"তোমরা ভুল করলে আমাকে স্যারের কাছে কৈফিয়ত দিতে হয়।"

ম্যানেজার বললেন,"আই আম দ্য ওয়ান হু গেভ ইউ কে টি ফর বেটার হ্যান্ডলিং।" 'কে টি'র অর্থ হল নলেজ ট্রান্সফার। "ইফ ইউ মেক মিস্টেক ইট রিফ্লেসেস অন মী। খেয়াল রেখো এরপর যেন এরকম ভুল না হয়।"

ব্যস এটুকু কথা।

সাক্ষী বলল,"কারো কোন ডাউট থাকলে জিজ্ঞেস করে নে।" মেয়ে তো নয়, নারদ মুনির বউ। ঘুটঘুটি না করলে পেটের খাবার হজম হয় না। আমার মনে হয় শচীনকে টিমলিড বানিয়ে দিয়ে সাক্ষী নিজে শিফট লিড হওয়ার প্ল্যান করছে। অসম্ভব কি! আভাস ছ'মাস কাজ করেই ওর প্রোজেক্টের শিফটলিড হয়েছে। অবশ্য আভাসের কম্পানি ছোট, ছোট বলে কাজ শেখার সুযোগ বেশি। আমাদের কম্পানি বড়, এখানে পলিটিক্সের ক্ষেত্র প্রসারিত, পলিটিক্সের জোরে প্রমোশনও হাসিল করে নেওয়া যায়।

আভাস বলল,"মা জিজ্ঞেস করছেন কি খাবে?"

"কিছু না।"

"কেন? তোমার যে চিড়ের পোলাও ভাল লেগেছিল!"

"না না আভাস, আজ নয়।"

শোবার ঘর থেকে মেয়ের কণ্ঠস্বর ভেসে এল। আভাসকেই জিজ্ঞেস করলাম, "তোমার বোন?"

"হ্যাঁ," বলেই সে তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে গেল। একটু বাদে এসে বলল,"ওর শরীরটা ঠিক নেই। জ্বর জ্বর লাগছে। তাই আজ কলেজ থেকে তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছে।"

"সে কার সঙ্গে কথা বলছিল?"

"কার সঙ্গে বলবে! আমি গিয়েছিলাম, আমার সঙ্গেই কথা বলেছে।"

"আমার মনে হল ঘরে আরেকজন মেয়ে আছে। দু'জনের কথোপকথনের গলা পেলাম!"

"ও হ্যাঁ, ছোট পিসি এসেছেন।" আভাস মাকে মানা করে,"আজ থাক। রিলির মুড খারাপ।" আমাকে বলে,"চলো, আজ আমরা বাইরে ডিনার করব। জোমাটোর মেম্বারশিপ কার্ডটা অনেকদিন ব্যবহার করা হয়নি।"

*****

রাত দশটার দিকে আমরা ফিরছিলাম। গাড়ি চালাতে চালাতে আভাস জানায়, "তোমাদের সোসাইটির সিকিউরিটির সঙ্গে গতকাল আমার একটু হট টক হয়েছে।"

"কেন?"

"তুমি ছিলে না বলে প্রত্যেকদিন ভিজিটরস' খাতায় আমার ডিটেলস এন্ট্রি করতে হয়েছে। গতকাল করতে চাইনি...বলছিল চেয়ারম্যানের কাছে কমপ্লেন করবে।"

"আচ্ছা...!"

"অবশ্য আমি শেষপর্যন্ত এন্ট্রি না করেই উপরে উঠে গেছি।"

আমাদের সোসাইটিতেও অন্য সোসাইটির মত একজন চেয়ারম্যান আছে। কিন্তু আমাদের চেয়াম্যানকে চালায় ক্যাশিয়ার। গত দশ বছরে মাত্র একবারই চেয়ারম্যান এবং সেক্রেটারি পরিবর্তিত হয়েছে, ক্যাশিয়ার আছে সেই একজনই। হিতেশ মঙ্গেশকর। লোকটি বেঁটে, কালো, চৌকো মুখের। রূপালী ফ্রেমের চশমা পরে। হিতেশ একটা রগচটা লোক। মনে অনেক ঘোরপ্যাঁচ। গত দশ বছর ধরে মা'র সঙ্গে তার ঠাণ্ডা-গরম লড়াই চলছে। তার নির্দেশ ছিল আমাদের কোন সমস্যা সমাধানের জন্য আমরা যেন সে ছাড়া কমিটির অন্য কোন সদস্যের দ্বারস্থ না হই। কিন্তু তাকে সমস্যা জানালেও বিপদ, না জানালেও বিপদ। সে সমস্যাকে একদমই গুরুত্ব দেয় না। সমস্যা জানাতেই মায়ের অসীম ধৈর্যের পরীক্ষা শুরু হয় এবং তাতে হেরে গিয়ে মা কমিটির অন্য সদস্যের কাছে গেলে হিতেশ রেগে যায়। বলে,"আপনি তার কাছে গেছেন, সে-ই সমাধান করবে।"

আমাদের ঠিক উপরে চারতলায় গাইতণ্ডে থাকে। গাইতণ্ডে খুব দয়ালু। জানালায় গ্রিলের প্ল্যাটফর্মে অনেক গাছ পুষে রেখেছে। গাছকে রোজ খাবার দেয়। জল। এত জল যে গাছ খেতে পারে না। তিন-চার ঘণ্টা ধরে আমাদের বারান্দার টিনের চালে টপাটপ ফেলে। সেই শব্দে মা না ঘুমতে পারেন না ল্যাপটপে তাঁর কোন কাজ করতে পারেন। মা গাইতণ্ডেকে বহুবার অনুরোধ করেছেন,"গাছের যতটা জলের প্রয়োজন ততটা দিন। নইলে টবের নিচে গামলা রাখুন।" সে মা'র কথা শোনেনি। উল্টে তার কথা মাকে শুনিয়েছে,"আমি জল ফেলবই। কাইন্ডলি আমার দরজায় আপনি নক করবেন না।" গাইতণ্ডের দরজায় নক করার অধিকার চর্চা না করে মা হিতেশের দরজায় নক করেন। হিতেশ,'ঠিক হ্যায়, দেখতা হুঁ...' বলে বোবা হয়ে পড়ে থাকে।

মা আমাকেও হিতেশের কাছে পাঠিয়েছিলেন। সে বলেছিল, যখন জল পড়বে তখন আমাকে ফোন করো। মা ফোন করে জলের টপ টপ শব্দও শোনান।

হিতেশ টেনে টেনে বলে, "দেখতা হুঁ...উসকো বলতা হুঁ...কুছ করতা হুঁ...।" মনে হয় অনিচ্ছা।

মা ভাবেন এবারও সে বোবা হয়ে বসে থাকবে। তাই বলেন, "প্লীজ, আমরা শিক্ষিত। আমাদের উচিত আমাদের সচেতনার অভাবজনিত কারণে অন্যকে যেন এমন ভুগতে না হয় তার খেয়াল রাখা, তাই না? আমিও গাছ লাগিয়েছিলাম।

আমার নিচের ফ্ল্যাট...”

“আরে ম্যাডাম, আমাকে আগে ওদের বলতে তো দিন। তারপর আমরা এ নিয়ে আলোচনা করব।”

“এখন শুনে নিলেই হয়ে যেত। পরে আলোচনার কি আছে!”

হিতেশ অধৈর্য হয়ে ফোন রেখে দেয় এবং ছাড়ার আগে মাকে মূল্যবান উপদেশ দিয়ে মায়ের কানকে সমৃদ্ধ করে, “সবার সঙ্গে মিলেমিশে থাকুন, দেখবেন কোন সমস্যা নেই।”

উপদেশে সমৃদ্ধকান মা আরও হতাশ হন। উনি আমার কাছে আসেন, “দেখেছ রিলি, লোকটা কেমন রগচটা?”

হিতেশ না কিছু দেখেছে, না কিছু বলেছে, না কিছু করেছে। বছরের পর বছর একই অশান্তি। অশান্তি সহ্য করতে করতে মা ভেবেছেন সবার সঙ্গে মিলেমিশে থাকুন বলতে কি বোঝাতে চেয়েছে হিতেশ? নিচে গিয়ে প্রতিদিন ওর স্ত্রীর সখী হয়ে আড্ডা মারা? সেটি তিনি পারবেন না। তার স্বভাবেই নেই তা। সময়ও নেই। ভাষারও অন্তরায় আছে। তারা মারাঠিতে কথা বলে, হিন্দিতে বলতে চায় না। ইংরেজিতে অধিকাংশ স্বচ্ছন্দ নয়। স্বচ্ছন্দ হলেও হয়ত বলত না, যেমন হিন্দিতে বলে না। আড্ডাতে জন্ম নেওয়া পরচর্চা, পরনিন্দা, হাসি-ঠাট্টা, উপহাস, দলাদলি এবং ভুল বোঝাবুঝির ধকল সামলানোর ক্ষমতা নেই মায়ের। বছরখানেক বাদে একদিন মা হিতেশকে মেসেজ করেছেন, “ওরা এখনও জল ফেলা বন্ধ করেনি।” তার কোন উত্তর আসেনি। মা আবার মেসেজ ছেড়েছেন, রোজই আমার চালে জল পড়ছে। তারও কোন উত্তর নেই। মা লিখেছেন, “ঘুমের ওষুধ খেয়েও আমি ঘুমতে পারছি না। কেন সে আমাকে এইভাবে ভোগাচ্ছে?” তারও কোন উত্তর নেই। মা লিখেছেন, “আমার সুইসাইড করতে ইচ্ছে করছে।” তারও কোন উত্তর নেই। সব মেসেজ পড়ে খেয়ে ফেলেছে হিতেশ। অবশেষে মা তাকে ফোন করতে বাধ্য হয়েছেন। হিতেশ ফোন উঠিয়েছে। উঠিয়েই বদহজম হওয়া মেসেজের টক-ঝাল ঢেকুর ছাড়তে শুরু করেছে। আগ্নেয়গিরির চেয়েও ভয়ংকর প্রকোপ তার। ভয়ংকর তেজ। “মেসেজ তো অপনে গলদ কিয়ে হ্যায় ম্যাডাম। আপকো সুইসাইড করনা হ্যায় তো কর লো, মুঝে কুছ লেনা দেনা নহী হ্যায়। মুঝে ইনডাইরেক্টলি ধমকি মত দেনা। আপকা ল্যাঙ্গুয়েজ বহুত সহন লিয়া ম্যায়নে। ইসকে বাদ মুঝে ফোন ভী মত করো, কুছ ভী মত করো। ম্যায় য়হ সেম মেসেজ পুলিস স্টেশন পে অভী ভেজ রহা হুঁ।”

মা বলতে চেয়েছেন, “হিতেশজি, আমার মানসিক অবস্থা ঠিক নেই...।” হিতেশের তেজের মাঝে হারিয়ে গেছে মায়ের গলা।

''নহী নহী, য়েহ মেসেজ লেকর ম্যায় অভী পুলিস স্টেশন কমপ্লেন্ট লঞ্চ (লজ) কর রহা হুঁ যো য়েহ আউরত ঘর বৈঠে মুঝে ইন্ডাইরেক্টলি হ্যারাজমেন্ট (হ্যারাসমেন্ট) কর রহী হ্যায়।'' ইন্ডাইরেক্টলি শব্দটার ওপর অনেক জোর দেয় হিতেশ।

''হিতেশজি ঠিক হ্যায়, ভেজ দিজিয়ে কমপ্লেন্ট। আপ কা হেল্প চাহিয়ে থা...''

''বোলনে কা ক্যা জরুরত থা যো ম্যায় সুইসাইড করুঙ্গি?'' মেঘের গর্জন মেশানো প্রশ্ন।

মা আবার বোঝানোর চেষ্টা করেন, ''হিতেশজি মেরা মেন্টাল স্টেট ঠিক নহী হ্যায়...''

''আরে ঠিক হ্যায় না! বোলনে কা তারিকা কুছ অলগ হোতে হ্যায় য়া নহী হোতে!'' কম হয় না গর্জন।

''হিতেশজি...''

''আউর মুঝে ধমকি দেকে আপকো কিয়া মিলেগা?''

''আপকো ম্যায় ধমকি নহী দে রহী হুঁ হিতেশজি...''

''ইসকা মতলব ক্যা হোতা হ্যায় ম্যায় সুইসাইড করুঙ্গি?''

''হিতেশজি...''

''ক্যা মতলব হোতা হ্যায় ইসকা? কই আচ্ছা বাত করতা হ্যায় তো উসকা জান লেনে কো হ্যায় ক্যা আপকো? আরে মেরা ভী ফ্যামিলি হ্যায়। মেরা ভী ঘরমে মিসেস হ্যায়, দো বাচ্চে হ্যায়!''

''হিতেশজি, মেরা অভী মেন্টাল স্টেট...''

''আরে মেন্টাল স্ট্রেজ(স্টেট), আপ কা বোলনে কা তারিকা অলগ হো ত্তে হ্যায়।'' এবার হিতেশ জোর দেয় 'হোতে'র ওপর। সেই কারণে 'হোতে' হয়ে যায় 'হো ত্তে।'

''হিতেশজি, জব কই ডিপ্রেশন মে হোতা হ্যায় তব উসকা বোলনে কা তারিকা দেখা নহী যাতা।''

''আরে আপকা ডিপ্রেশন আপকে পাশ রাখো না! মুঝে কিউ লে কে আ রহে হ্যায় উসমে? মুঝে কুছ নহী পতা হ্যায় ম্যাডাম, য়েহ গলত হ্যায়। ম্যায় বাপস একবার বোল রহা হুঁ।''

''আপনি যে কাউকে বলুন, সবাই বুঝবে আমি আপনাকে আমার উপরের ফ্ল্যাট আমাকে কতখানি ডিস্টার্ব করছে সেটাই বোঝাতে চেয়েছি। পুলিশকেও বলতে পারেন...''

''কি বলব পুলিশকে? কি বুঝবে পুলিশ? সোসাইটির কমিটিকে ধমকানি দেওয়া ভাল?'' হিতেশ এবার একেবারেই অধৈর্য হয়ে পড়ে। ''আরে ক্যা ইয়ার, কভী ভী উঠতি যো ভু ভু মুঝে ফোন মত করো, চেয়ারম্যানকো ফোন করো। ম্যায় ফোন রাখ

রহা, মুঝে নহী বাত করনা...” অধৈর্য হয়ে কথার মাঝখানে ‘উঠতি যো ভু ভু’ অবোধ্য কিসব বলে এবং ‘ম্যায় ফোন রাখ রহা’র পরে ‘হুঁ’ বলতে ভুলে যায় সে।

“ঠিক আছে, আমাকে চেয়াম্যানের নম্বর দিন।”

“আমি কেন দেব? আমি জানি না চেয়ারম্যানের নম্বর। নিচে গিয়ে সিকিউরিটির কাছ থেকে নিয়ে নিন।”

আভাস আমাদের বাড়িতে আসার আগে জিজ্ঞেস করে আমার কি কি প্রয়োজন। বলি ‘কনডোম’। সে মাঝে মাঝে নিয়ে আসে, মাঝে মাঝে বলে, ভুলে গেছি। জানি সে মিথ্যে বলছে। আসলে মেডিক্যাল স্টোর-এ গিয়ে বলতে লজ্জা পেয়েছে। আমি ওর মনে সাহস জোগানোর চেষ্টা করি,“লজ্জার কি আছে?”

“সে আমাকে চেনে...”

“কত স্টোর শহরে। বাড়ির কাছের স্টোর-এ নাইবা গেলে।”

“তা হলেও...”

ঝুঁকি আমি নিই না। তাই কখনো রাতে একসঙ্গে বাড়ি থেকে ফেরার পথে রাস্তায় গাড়ি থামিয়ে কোন অচেনা স্টোর-এ ওকে পাঠিয়ে দিই। “যাও, নিয়ে এস।” নিয়ে আসে বেচারা। অর্ডার পালন করে বলে সত্যিই ওকে আমার বেচারা মনে হয়।

সোসাইটির গেটের কাছে প্রায় পৌঁছে গিয়েছিলাম। সিকিউরিটি সত্যিই চেয়ারম্যানকে কমপ্লেন করেছে কিনা, আমাকে হিতেশের সঙ্গে কথা বলতে হবে কিনা, কি হবে তার পরিণতি ভাবতে ভাবতে আজ আমি কনডোমের কথা ভুলে গেলাম। আভাসকে বললাম, “একটু দাঁড়াও তো।” আভাস রাস্তার এক পাশে গাড়ি দাঁড় করায়। গাড়ি থেকে নেমে আমি হাঁটি আই জি মেডিক্যালের দিকে।

‘আই জি’ নামের মেডিক্যাল স্টোরটি বছর পাঁচ-ছয় আগে নতুন খুলেছে। শুরু শুরুতে আমি সেখানে দুটো ছেলেকে দেখতাম। কোন কাস্টমার এলেই তার হাত থেকে প্রেসক্রিপশন নিয়ে নিত ওরা। ব্লাউজ পিস কিনতে গেলে দোকানদার যেমন শাড়ি হাতে নিয়ে র‍্যাকে রাখা কাপড়ের রোলের সঙ্গে তার রঙ মিলিয়ে দেখে ঠিক তেমনই ওরা সমস্ত ডিসপ্লে র‍্যাকে রাখা ওষুধের নামের সঙ্গে প্রেসক্রিপশনে লেখা ওষুধের নাম মিলিয়ে দেখত। ড্রয়ারেও খুঁজত। লফট স্টোরেজ র‍্যাকও বাদ দিত না। কখনো স্বল্প পরিশ্রমেই পেয়ে যেত ওষুধ, কখনো গায়ের রক্ত জল করে এসে বলত,“নেই, সরি।” পেলেওবা, দামের হিসেব করতেও অনেক সময় নিত। মাস তিনেক পরে সেখানে একটি মেয়ে এল। চটপটে মেয়ে। ছেলেগুলোকে বলে,“আরে ওখানে অছে দেখ না, সেখানে আছে দেখ না...।” বর্ষায় বাঁধ ভেঙ্গে উপচে পড়া নদীর জলতরঙ্গের ঘষা আওয়াজের মত তার গলার স্বর। কিন্তু কথার গতি ধীর। তীব্রতা কম। বড় মিষ্টি লাগে আমার ওই আওয়াজ। কখনো সে নিজেই প্রেসক্রিপশন

ছাড়াই ফটাফট নিয়ে আসে ওষুধ।

আমি ওকে জিজ্ঞেস করেছিলাম,"তুমি কি এখানে কাজ করো?"

সে বলেছিল,"না, এটা আমার দোকান।"

"তাহলে এতদিন ছিলে না কেন?"

"বি ফার্মাসি-র কোর্স করছিলাম। ফাইনাল পরীক্ষা চলছিল।"

দোকান নতুন হলেও স্টক অনেক। একটা মেয়ের একা ব্যবসা করার জন্য এত বড় পদক্ষেপে আমি মুগ্ধ।

এখানকার মেডিক্যাল স্টোরগুলো ওষুধে কোন ডিসকাউন্ট দিত না। তবু মা প্রতি মাসে দামি দামি শ্যাম্পু, হেয়ার কন্ডিশনার, হেয়ার লোশন এবং মালটি ভিটামিন কিনবেন বলে মেয়েটিকে টেন পার্সেন্ট ডিস্কাউন্টের চুক্তিতে নিয়ে আসেন, তার ফোন নম্বর নেন এবং নাম জিজ্ঞেস করেন। সে বলে, "ভিমি।"

ভিমি বয়সে এবং লম্বায় আমার চেয়ে একটু বড় খুব নম্র। তার চেহারা স্লিম, কাঁধ পর্যন্ত লম্বা ঘন সোজা চুল। শরীরে আঁক বাঁক কম এবং মুখেও কিছুর ঘাটতি আছে। নিশ্চয় আছে। তা না হলে এমনটি হত না। সুন্দরী মনে হতে হতেও ওকে আমার সুন্দরী মনে হয় না। ভিমি কখনো গোড়ালি থেকে তিন ইঞ্চি উপর পর্যন্ত লম্বা লেগিংস-এর সঙ্গে দোপাট্টা ছাড়া সেমিজ পরে। কখনো অ্যাঙ্কল লেন্থ জিনসের সঙ্গে টপ পরে। একদিন দুপুরবেলা আমি ওকে শর্টস পরে ফাঁকা রাস্তা ক্রস করতে দেখেছিলাম। প্রথমে চিনতে পারিনি। সাদা সাদা পা-গুলোর তারিফ করতে করতে ভাবছিলাম মেয়েটি কে? পা থেকে উপরে চোখ যেতেই দেখলাম ভিমি।

ভিমিকে নিয়ে আর একটি সত্য আমি আবিষ্কার করেছি। সে দুপুর দুটো থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত দোকান বন্ধ রাখে। রাত সাড়ে ন'টায় রাতের জন্য বন্ধ করে দেয় দোকান। এক রাতে দশটার দিকে যথারীতি ভিমির দোকান বন্ধ। বাঁ দিকের রাস্তা পার হয়ে টিলা কেটে তৈরি অন্য রাস্তাটি ধরে নিচে নেমে অনেক দিনের পুরনো অম্বিকা মেডিক্যাল-এ গেলাম। দেখলাম সেখানে কাউন্টারে ভিমি দাঁড়িয়ে আছে।

জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি এখানে যে?"

"এটা বাবার দোকান।"

তার মানে ভিমির ব্যবসাটা দাঁড় করিয়েছেন ওর বাবা এবং এখনও তিনি ওর পেছনে স্তম্ভ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

টেন পার্সেন্ট ডিস্কাউন্ট পাওয়া মায়ের মেয়ে হওয়ায় ভিমি আমাকে দশ বিশ টাকার ওষুধেও টেন পার্সেন্ট ডিস্কাউন্ট দেয়।

রাত ন'টা পঁচিশ। ভিমির দোকান বন্ধ করার সময়। কোন কাস্টমার নেই। আমি গিয়ে ওকে জিজ্ঞেস করলাম, "কনডোম আছে?"

"কি?..." মনে হল সঠিক শুনেও নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না সে। আমার চেহারাতে কোন পরিবর্তন নেই। শাড়ি বা সালোয়ার নয়, পরে আছি সেই জিনস এবং টপ। গলায় কোন মঙ্গলসূত্র নেই। হাতে চুড়ি নেই। মাথায় সিঁদুর নামক গুঁড়ো লাল বস্তুটির কোন ছোঁয়া নেই। আমি অনেকদিনের জন্য শহরছাড়াও হয়নি যে তার মধ্যে আমার বিয়ে হয়ে থাকবে বলে ভাবা যেতে পারে। নিয়মিত আসছি। এসে প্যারাসিটেমল বা মেট্রোজিল বা ডোমস্টাল অথবা আকনে জেল, ডেরিভা বা আডেপিলিন কিনে নিয়ে যাচ্ছি। আজ হঠাৎ সেসব ছেড়ে এসবের প্রয়োজন কেন!

আবার জিজ্ঞেস করি, "কনডোম আছে?"

"ও, হ্যাঁ।" এবার সে নিশ্চিত হল আমার সেক্স-লাইফ শুরু হয়েছে।

ভিমি কামসূত্র দেখালো।

"অন্য কোন ব্র্যান্ড?"

ডুরেক্স দেখালো।

"অন্য কোন ভ্যারাইটি নেই?"

কয়েকটি ভ্যারাইটি বের করে সে ক্যাবিনেটের কাচের উপর রাখল।

আমি দূরে কনডোমের বক্স-এ পিংক রঙের কিছু একটা দেখলাম। ইতিমধ্যে পাশে একটি ছেলে এসে দাঁড়িয়েছে। লজ্জার বালাই না রেখে বললাম ওটাও দেখাও। ওটাই কিনে নিয়ে এলাম।

অফিসে মেয়েদের সবাইকে শান্ত লাগছে, অথচ সবাই শান্ত নয়, বিশেষত সুনইনা। দু'দিন আমাকে নিয়ে নিশ্চয় অনেক কানাঘুষা হয়েছে। বেদান্তির কথা আমার কানে বাজছে, "এই মেয়েটি কি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কাজ করে!"

মেয়েটিকে আমার বাড়িতে কত দরদ দিয়ে সাজালাম। জানি সেও পরচর্চাপ্রবণ তবু আমিও যে তার এই বদভ্যাসের শিকার হব ভাবতে পারিনি। সাক্ষীর নিয়মিত সংস্পর্শে থাকায় সাক্ষীর স্বভাবদোষটি বেদান্তির মধ্যেও পুরোপুরি ঢুকে পড়েছে। এখন তার ম্যানেজারের সঙ্গে দহরম-মহরম। প্রোমশনের জন্য সে এসব করছে।

সুনইনা বলে, "বেদান্তির তোকে ওইরকম বলা একদম উচিত হয়নি। আমি প্রতীকের সঙ্গে আলোচনা করেছি। সে বলেছে, একে বলে কম্পেটিটিভ ওয়ার্ক স্টাইল। সোজা পথে না হলে বাঁকা পথে ওঠা।"

লোকা না থাকায় আমাদের টিমে ম্যানেজার ছাড়া শচীনই একমাত্র ছেলে। তার চারপাশে মেয়ে গিজগিজ করছে। আগে যখন লোকা ছিল তখন শচীন সব মেয়েদের

সমর্থনে কথা বলত। হয়ত সে লোকার সঙ্গে না বলা কোন প্রতিযোগিতায় ছুটেছিল। এখন শুধু সাক্ষী এবং বেদান্তির হিতে এবং অন্য মেয়েদের বিপরীতে কাজ করে। ম্যানেজারকে তেল লাগিয়ে শচীন নিজের জন্য ব্যবস্থা করে নিয়েছে এবং ওই দুটো মেয়েকে ছেড়ে দিয়ে লোকাকে অনুসরণ করে অন্যদের জন্য যা তা রোস্টার বানাচ্ছে।

রাতেই আভাসকে বলেছিলাম, ''আমি চাই একদিন লোকা এবং রুচিরার মত শচীনের সঙ্গে আমার কথা কাটাকাটি হোক, আমি তারপর ম্যানেজারকে সিসিতে রেখে 'এইচ আর'কে শচীনের বিরুদ্ধে মেল করি। অপেক্ষা করে ম্যানেজার আরেকবার ক্লায়েন্ট ভিজিট-এ বাইরে যাবেন, কয়েকদিন পর ফিরে দেখবেন অফিস থেকে শচীন হাওয়া হয়ে গেছে।''

আভাস হাসে।

''কিন্তু সাক্ষী এবং বেদান্তির কি হবে!''

''নতুন শিফটলিড এলে তারা তাকেও হাত করবে।''

''ঠিক বলেছ। আমাকেও এই চাকরি ছাড়তে হবে।''

সুনইনা কথা বলতেই থাকে, ''জানিস প্রতীক ওর গার্লফ্রেন্ডকে ছেড়ে দিয়েছে?''

আমি অন্য চিন্তায় মগ্ন—এতদিন বাড়িতে বসে ছিলাম, বাড়িতে বসা আমি মনের দিক থেকে যতটা স্বাধীনচেতা ছিলাম আর্থিক ক্ষেত্রে মা-বাবার ওপর ততটাই নির্ভরশীল। এখন বাড়ির বাইরে স্বনির্ভরতার রাস্তায় পা রেখেছি, কাঁটা দিয়ে ভরা রাস্তা তবু এই রাস্তা ধরেই আমাকে চলতে হবে।

''কি রে, তুই খুশি হলি না?''

''কি কারণে?''

''বললাম না প্রতীক এখন আমার সঙ্গে প্রেম করছে? বেদান্তি খুব বলেছিল প্রেম করতে হলে ওর মত হতে হবে। ওর বয়ফ্রেন্ড কেমন ওকে ছেড়ে পালালো দেখলি?''

বেদান্তির ওপর সুনইনার রাগ আছে। তাই সে আমার কাছে তার বদলে যাওয়া চরিত্র তুলে ধরছে। এই মুহূর্তে বেদান্তি অফিসে নেই। সুনইনা বলল, ''বেদান্তি পুনেতেই নেই, এক সপ্তাহের ছুটিতে কোলহাপুরে গেছে। ডবল পুশ আপ, বাটক, মেক-আপ সেট সব নিয়েই।''

''কেন?''

''সে বলেছিল না ওকে ছেলের বাড়ি থেকে দেখতে আসবে!''

ভুলেই গিয়েছিলাম। ''তুই কি করে জানলি ওইসব নিয়ে গেছে?''

''এটা জানা কথা। নইলে ছেলের বাড়ির লোক ওকে পছন্দ করবে না। আমি বাটক কিনে দেখেছি। খুব ভাল শেপ দেয়। কিন্তু প্রতীক বলেছে আমার জন্য ওটার দরকার নেই।''

বেদান্তির অনুপস্থিতিতে আজ অভিলাষা বেদান্তির কাজ করল, সুনইনার

বয়ফ্রেন্ড-এর ব্যাপারে আগ্রহ নিল। আগে বেদান্তি জিজ্ঞেস করত। আজ অভিলাষা সুনইনাকে জিজ্ঞেস করল, "প্রতীকের সঙ্গে তুই রোজ বেড শেয়ার করছিস?"

"হ্যাঁ।"

"কি করে সাহস পেলি? তোর মা-বাবা রেগে যাবেন না?"

"মা-বাবাকে বলব না। তাছাড়া আমরা বিয়ে করছি না।"

অফিসে সেই সুনইনা, সেই সাক্ষী, সেই প্রাজক্তা, সেই কানুপ্রিয়া...একই মুখ। প্রায় অভিন্ন কথাবার্তা এবং অভিন্ন কথাবার্তার অন্তরালে সুপ্ত পলিটিক্স। বিশ্বাসই হতে চায় না যে অফিসের সুপ্ত পলিটিক্স এমন ভয়ঙ্কর হতে পারে, করো করো ক্ষেত্রে টিকে থাকাটাকে এমন অসম্ভব করে দিতে পারে।

আভাসকে বলেছিলাম, "বেদান্তি, প্রাজক্তা এবং সাক্ষীর স্যালারি তেরো পার্সেন্ট বেড়েছে। আমার আট পার্সেন্ট।"

"অভিলাষার?"

"অভিলাষার অবস্থা আরও খারাপ। মাত্র তিন পার্সেন্ট।"

"বাকিদের?"

"কারও আট, কারও চার, কারও পাঁচ, কারও তিন।"

সুনইনা বলল, "প্রতীক বলেছে সে আমার জন্য অন্য কম্পানিতে চেষ্টা করবে।"

রাতে আভাসও আমাকে আশ্বাস দিয়েছিল, "আমার একজন পরিচিত আছে। তাকে বলে দেখব।"

"ভাবছি এবার নেট ওয়ার্কিং ছেড়ে প্রোগ্রামিং-এ যাব। সঞ্জয় প্রোগ্রামিং-এর কাজ করত। ওদের একটা প্রোজেক্ট এক বা দেড় বছরের একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করতে হত। চব্বিশ ঘণ্টা সাপোর্ট দেওয়ার ব্যাপার নেই। তাই ওর শনি রবির ছুটি বাঁধাধরা থাকত, নিজের জন্য সে অনেক সময় বের করতে পারত। কাজের দিনগুলোতেও সঞ্জয় প্রায়ই তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে ক্রিকেট খেলত যেত।"

"নেট ওয়ার্কিং-এ থাকলে স্কিলস দিয়ে দশ বছর চালানো যায়। প্রোগ্রামিং-এ যেতে চাইলে সফটওয়্যার, ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে আপডেটেড থাকতে হবে।" আভাস পরামর্শ দেয়, "তুমি বরং অনলাইনে ক্লাইড-এর কোর্সটা করে নাও।"

নতুন চাকরি করে পাব, কবে এই চাকরি ছাড়ব সে পরের কথা। আপাতত একটু বিশুদ্ধ বাতাস চাই। কয়েকদিন অফিস থেকে মুক্তি চাই। মাও কলকাতা থেকে ক্রমাগত ফোন করছিলেন উনি একা সেখানে হাঁপিয়ে উঠেছেন বলে। বলছিলেন, মাথা আমার একদমই কাজ করছে না রিলি। চলো, কোথাও থেকে ঘুরে আসি। ডিসেম্বরে দশদিনের ছুটির অ্যাপ্লিকেশন ঢেলেছিলাম। ছুটি পেলাম জানুয়ারিতে। মায়ের এখন ঘোরার প্রয়োজন শেষ হয়ে গেছে, উনি আবার কাজে মন বসাতে পেরেছেন। তবু তিনি

আসবেন যেহেতু পরে আমি আবার ছুটি নিয়ে কম্পানির সঙ্গে সংঘর্ষ করতে পারব না। এই ছুটি আমি দু'জনের সঙ্গে কাটাবো—মা এবং আভাস। মায়ের সঙ্গে চারদিন গোয়াতে থাকব। তারপর আভাসের সঙ্গে বেরিয়ে যাব মসুরি ট্যুর-এ।

মা এলেন। তিন-চার মাসে আমি তার ফ্ল্যাটটার অবস্থা অত্যন্ত করুণ করে দিয়েছি। অবস্থা করুণ করতে আভাসেরও অবদান আছে। বসার ঘরে সোফার কুশন ঠিক জায়গাতে নেই, একধারে জমা হয়ে পাহাড় তৈরি করেছে। ডাইনিং টেবিলে জামাকাপড়, ইলেকট্রিক বিল, ল্যাপটপ, থালাবাটি, হেলমেট। তার চেয়ারগুলোকে আড়াল করে রেখেছে আমার এবং আভাসের লম্বা লম্বা জ্যাকেট। ফ্রুট বাস্কেটে মোবাইল-চার্জার, ল্যাপটপ-চার্জার, পেন্সিল-সার্পনার, সানগ্লাস। কিচেনে তেলচিটে গ্যাসস্টোভ, নোংরা স্লাব, শিশি-বোতল-কৌটো, সিঙ্ক। শোবার ঘরেও সবকিছু অযত্নবিন্যস্ত। সর্বত্র ধুলোর আস্তরণ। বাথরুমে কাদা।

আমি মাকে বলেছিলাম আভাস খুব পরিষ্কার। স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলে। বাইরে থেকে এসে হাত-পা সাবান দিয়ে না ধুয়ে কিছু ছোঁয় না, জামাকাপড় না ছেড়ে সোফায় বসে না। আভাস আমাদের সঙ্গে একেবারে পারফেক্ট ম্যাচ।

দুপুরের স্নান সেরে মা সাফ-সাফাই করতে নেমে পড়লেন। ঘরের দুরবস্থা তাঁর মনে মালিকানাবোধকে একটু বেশিই জাগিয়ে দিল। "এই তোমার আভাস!" ঘর পরিষ্কার না থাকলে তিনি বসে সুখ পান না, রান্না করে সুখ পান না, রাতে তাঁর ঘুমও আসে না। "কখন আসবে সে?"

"বিকেলে।"

কিন্তু বিকেলে আভাস এল না।

পুনরায় জিজ্ঞেস রলেন, "কখন আসবে?"

"কালকে।"

পরদিনও আভাস এল না। বাড়ির কোন কাজে ফেঁসে গেল। মা ভাবলেন সে হয়ত লজ্জা পাচ্ছে।

"কি রে, এল না যে!"

"আসবে কালকে।"

আভাস বলল, "আমি চাই তুমি তোমার মায়ের সঙ্গে একান্তে কয়েকটা দিন কাটাও।"

"উনি তোমাকে দেখার জন্য ব্যাকুল।"

"মাকে নিয়ে একটু ডাক্তারের কাছে যেতে হবে।"

"কি হয়েছে।"

"সিরিয়াস কিছু নয়। গলব্লাডারে স্টোন আছে।"

"তোমার বাবা ডাক্তার। তিনিই তো ওষুধ দিতে পারেন।"

''দিয়েছিলেন। কমেনি। হসপিটালে অন্য ডাক্তার দেখানো হয়েছিল। উনি বলেছেন অপারেশন করতে হবে। আমার বাবা সার্জেন নন।'' আভাস বলে, ''ডাক্তার অপারেশন করতে বলেছেন কিন্তু মা ভাবছেন হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করে দেখবেন কিছুদিন।''

সায়লি ফোন করল, ''এবার তোর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব।'' বয়সের ধর্মে ইদানীং সায়লির মনে প্রেমের বাসনা প্রবল হলেও বাকি জায়গাগুলোতে কুণ্ঠা এখনও কম হয়নি। সে আভাসের মুখোমুখি হতেই চায় না। কিন্তু আমি সাই-এর সঙ্গে পরিচিত হতে চাই।

জিজ্ঞেস করি, ''সেই অয়ও রুমে?''

''না, এবার একটা ভাল হোটেল বুক করব।''

''কে টাকা দেবে?''

''সে-ই।''

''এবার মা-বাবার কাছে আমার অজ্ঞাতসারে আমারই বাড়িতে থাকার দোহাই দিয়ে কাজ সারার পরিকল্পনা সায়লি করেনি। কিন্তু কথা হচ্ছে জানুয়ারির শেষে চার-পাঁচদিন আমি পুনেতে থাকছি না।

সায়লি বলল, ''সে ফেব্রুয়ারিতে আসবে। মা তোকে ফোন করলে তুই বলে দিতে পারবি তোর বাড়িতেই আছি।''

সায়লির পোস্টিং হিঞ্জেওয়ারিতেই হয়েছিল। আমার অফিস থেকে আরও চার কিলোমিটার দূরে। অফিসের কোন ক্যাবও ছিল না। যাতায়াতেই চার ঘণ্টা নষ্ট হয়ে যায়। তাই ওর মা-বাবা ভাবছিলেন হিঞ্জেওয়ারিতেই বাড়ি ভাড়াতে নেবেন। কিন্তু অবশেষে তার প্রয়োজন হল না। অফিস তাকে বাড়ির কাছের আইটি পার্কে ট্রান্সফার করে দিল। এখন পাঁচ মিনিটে সে অফিসে যায়, পাঁচ মিনিটে ফেরে। জেনারেল শিফটে কাজ, রাতে সে ঘরে।

বলি, ''যদি মা রাতে কোন দরকারে হঠাৎ করেই বাড়িতে যেতে বলেন? হোটেল থেকে আসতে তোর সময় লাগবে।''

ওর মুখ কুঁচকে যায়, ''ঠিক বলেছিস।''

''মাকে বলিস, রিলির সঙ্গে গোয়াতে ঘুরতে যাচ্ছি।''

''সেটাই বলতে হবে। আরে শোন না, তোকে আরেকটা কথা বলার ছিল।''

''কি?''

''আমার নতুন অফিসের একটা ছেলে আমাকে প্রপোজাল দিয়েছে। এই ছেলেটিও মাল্লু। আসলে দুটো ছেলে দিয়েছিল। অন্যটা গুজরাটি বলে না করে দিয়েছি।''

আমি জানি সায়লি তাকে না করেনি। না করা সায়লির স্বভাবে নেই। স্পষ্ট করে

কিছু না বলে ঝুলিয়ে রেখেছে। পরে কখনও ছেলের অকাল পড়লে সে তার দিকে ঝুঁকে যাবে।

"ওয়াও! তোর চারপাশে ছেলের ছড়াছড়ি। মাল্লুকে কি বললি?"

"এখনও কিছু বলিনি। দেখি কিছুদিন এর সঙ্গে কেমন চলে। কিন্তু এখন আরেকটা কথা আমার মাথায় এল।"

"কি কথা?"

"ভাবছি ওকে তোর ছুটির মাঝখানেই ডাকি। যদি কখনো মাকে কথায় কথায় ভুল করে বলে দিস জানুয়ারিতে তুই গোয়া ঘুরতে গিয়েছিলি তাহলে মুশকিল হয়ে যাবে।"

"কিন্তু সে কি পারবে আসতে?"

"মানে?"

"মানে...এত তাড়াতাড়ি?"

"ও যে কোন সময় আসার জন্য এক পায়ে খাড়া। আজ বললে আজই।"

*****

মা এবং আমি গোয়ায়। আভাস পুনেতে। গোয়াতে অর্ধেক সময় আমার আভাস আভাস করে কাটছে। সকালে ঘুম থেকে উঠে আভাস, সমুদ্রতটে যাব তার জন্য তৈরি হতে হতে আভাস, সেখানে গিয়ে আভাস, অঞ্জুনা বীচ মার্কেট-এ গিয়ে আভাস, ক্যাথেড্রাল চার্চ-এ গিয়ে আভাস, পানজিম মার্কেট-এ গিয়ে আভাস, রাতে হোটেলে ফিরে এসে আভাস। ভিডিও কল করে সব তাকে দেখাতে হবে। হোটেলের রুম থেকে শুরু করে কি পরেছি, কোথায় যাচ্ছি কি খাচ্ছি সব। সেও দেখাচ্ছে। মসুরির জন্য তৈরি হচ্ছে সে। মাথাভরা রেশমী চুল তার বড় সম্পদ। প্রাণ দিয়ে সে সেই সম্পদের যত্ন করে। রোজ তেল লাগায়, 'হিমালয়ান রোজ (গোলাপ)' শাম্পু করে, বারবার সেলুনে গিয়ে তাকে বিবিধ রূপ দেয়। এবার সে একটা নামীদামি সেলুনে গেল। সেখানে পাঁচশো টাকা দিয়ে বাড়ি ফেরার পথে আমাকে ভিডিও কল করল। বন্ধু গাড়ি ড্রাইভ করছে। সে বসে আছে পেছনের সীটে, শুধুমাত্র প্যাসেঞ্জার হয়ে। আমি বন্ধুকে দেখতে পাইনি। শুধু তাকে দেখেছি। তার নতুন রূপ দেখে আহত হয়েছি। সে জিজ্ঞেস করল, "কি হল?"

"মাথার চারপাশের চুল যেমন ক্ষুদে মাঝখানের চুল তেমনই দৈত্যাকার।"

"তোমার পছন্দ হয়নি?" গলার স্বর কাঁপা।

"গাড়ির রিয়ার মিররে নিজেকে দেখতে পাচ্ছ না? খোলা জানালা দিয়ে সাইক্লোনের স্পীডে ঢুকে যাওয়া হাওয়ার সঙ্গে কিভাবে মোকাবিলা করছে তোমার দৈত্যাকার চুল? বড় উশৃঙ্খল লাগছে তাদের।"

আভাসের মুখ দেখে মনে হল ওর মনটা ছোট হয়েছে। আমি ওকে আরেকটু

চোট দিলাম, ''আমাকে একটা নতুন বয়ফ্রেন্ড খুঁজতে হবে মনে হচ্ছে।''

''আমাকে কি দেখতে এতটাই খারাপ লাগছে?'' নিরাপত্তার অভাব বোধ করছে সে।

''কি করলে হানি! আগেরটাই ভাল ছিল।''

''দাঁড়াও, বাড়িতে গিয়ে আবার ভিডিও কল করছি।'' হানি শব্দটা শুনে স্বাভাবিকের দিকে ওর গলা।

আভাসের দ্বিতীয় ভিডিও কল আমার চোখে তার চেহারায় কোন পরিবর্তন দেখালো না। পরদিন সে তার পুরনো অখ্যাত নাপিতের কাছে গেল। মাত্র একশো টাকা নিয়ে ম্যাজিক দেখিয়ে দিল সেই নাপিত।

সায়লি হোটেলে চেক-ইন করেছে সকালেই। জিজ্ঞেস করেছিল কখন আমি পুনেতে পৌঁছচ্ছি। আমার ফ্লাইট ল্যান্ড করার কথা তিনটে চল্লিশে। আমি তাকে মিথ্যে বলেছি—দুটো পনেরোর ফ্লাইটে আসছি, পৌঁছব সন্ধে পাঁচটা পঞ্চান্নতে। এয়ারপোর্ট থেকে হোটেল 'লেমন ট্রী' মাত্র দুই কিলোমিটারের পথ। ইচ্ছে ছিল সেখান থেকেই সরাসরি ওর সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার। কিন্তু মা এবং লাগেজ সঙ্গে থাকায় তা সম্ভব হল না। বাড়িতে এলাম এবং একই জামাকাপড়ে মায়ের গাড়ি ধার করে একই রাস্তা ধরে রওনা হলাম। গাড়ি ড্রাইভ করতে করতে অনেক কথার বাঁক। আগে ভাবতাম আমি বাইরে হরদম ঘুরে বেড়াচ্ছি, অফিসের কথা ছেড়ে দিলে বয়ফ্রেন্ড নিয়ে আমার মত সুখী কে! কিন্তু এখন দেখছি সায়লি পুনেতে থেকেই কামাল করছে। বাড়ির ভয়ে শহরের বাইরে না যেতে পারায় তার মাইনের টাকার সাশ্রয় হচ্ছে। এদিকে বয়ফ্রেন্ড-এর টাকায় 'লেমন ট্রী'র মত একটা ফোর স্টার হোটেলে মজা করছে। রেস্টরেন্ট, জিম, বার, কাফে, সুইমিং পুল, কনফারেন্স রুম, ডক্টর অন কল সবই আছে। রুমও নিশ্চয় দারুণ হবে। মনের মানুষটি সঙ্গে থাকলে তো কোন কথাই নেই। মনে হবে জীবনের গতি বন্ধ হয়ে যাক।

সাড়ে চারটেতে সায়লিকে ফোন করলাম, ''রুম নম্বর বল।''

''তুই পৌঁছে গেছিস?''

''হ্যাঁ, গাড়ি পার্কও করে দিয়েছি।''

''কোথায়?''

''লেমন ট্রী-এর পার্কিং-এ, আবার কোথায়! কেমন সারপ্রাইজ দিলাম?''

আমার চেয়েও বড় সারপ্রাইজ সায়লি আমাকে দিল, ''আরে আমি ওখানে নেই। আমি হোটেল প্রাইড-এ আছি। শিবাজিনগরে।'' প্রাইড একটি ফাইভ-স্টার হোটেল এবং সায়লি আমাকে না জানিয়ে সেখানে ঢুকে পড়েছে।

''আগে বলবি তো!''

''বলতাম। তুই বলেছিলি ছ'টায় পুনেতে পৌঁছবি...।''

মনে বিরক্তি নিয়ে আরও এগারো কিলোমিটার গাড়ি ড্রাইভ করলাম। গেলাম তার রুমে। সে তার বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে আমার পরিচয় করালো,''রিলি।''

বয়ফ্রেন্ডের মুখ চেনা অথচ সায়লির সঙ্গে আমার যা কথাবার্তা এবং ফটোর আদানপ্রদান হয়েছে তার ওপর ভিত্তি করে আমি এই মুখের সঙ্গে নামের মিল পাচ্ছি না। এই মুখকেও আমি আগে ফটোতে দেখেছি। খুব অস্বস্তি হচ্ছে। কে এ?

বয়ফ্রেন্ড হাত বাড়িয়ে দিল,''হ্যালো।''

''হাই।''

বয়ফ্রেন্ড আমার মনের উথাল-পাথালের খবর না রেখে ভদ্রতা পালন করল, ''হাউ আর ইউ?''

''আই অ্যাম ফাইন।'' আমি অন্যমনস্ক হয়ে গেলাম, ভুলে গেলাম আমার তাকেও হালচাল জিজ্ঞেস করা উচিত। অন্যমনস্ক মন ঘুড়ে বেড়াচ্ছে সেই পুরনো ফটোতে। কে...এ? এ...কে? আমি...আমি...আমি কেন মনে করতে পারছি না! এই ছেলেটি...এই ছেলেটি...হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েছে, আমি সায়লির কাছে জানতে চেয়েছিলাম কোথায় তোলা হয়েছে এই ফটো? সে বলেছিল, কোচিতেই। ট্রেনারদের ফেয়ারওয়েল পার্টি ছিল। এটা তাহলে...।

সায়লি ইতস্তত করল,''শিব।''

''একি! কবে তোর বয়ফ্রেন্ড...'' পরের অংশটা 'চেঞ্জ হল?' বলা হল না। সায়লি চোখের ইশারায় আমাকে থামিয়ে দিল। ''আমি তোকে বলতে ভুলেই গিয়েছিলাম... কি খাবি বল।''

সায়লি আমাকে কি বলতে ভুলে গিলেছিল তা সায়লি জানে, আমিও বুঝলাম সেকথা। কিন্তু শিব নিশ্চয় অন্য কথা বুঝেছে। সে ভেবেছে সায়লি আমাকে আমি কি খেতে চাই তা জিজ্ঞেস করতে ভুলে গিয়েছিল।

''কিছু না। আমাকে তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে। আভাস আসবে। রাতে থাকবে। ভোর পাঁচটা দশে আমাদের দিল্লির ফ্লাইট।''

শিব জানতে চাইল,''দিল্লি ঘুরতে যাচ্ছ?''

''না, মসুরিতে।''

সায়লি বলল,''এনজয় কর। ভিডিও তুলে পাঠাস। মে মাসে আমারও যাব।''

''লেমন ট্রীকে কেন ক্যান্সেল করলি?''

''পরে ভেবে দেখলাম ওটা বাড়ির খুব কাছে হয়ে যাবে।''

দু'য়েকটা কথা বলে সায়লির কাছ থেকে হোটেলের ধোঁকা এবং বয়ফ্রেন্ড-এর ধোঁকা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

আজ রাতে আভাস এবং আমি মায়ের বিছানা দখল করে নেই। কেননা মা আছেন।

তাঁকে তাঁর বিছানা ছেড়ে দিয়ে হয়েছে। আমি অনলাইনে একটা কম্পানির ডে-বেড অর্ডার করেছি। এখনও ডেলিভারি হয়নি। মনে হয় আরও পাঁচ-ছয়দিন লাগবে। ততদিনে আমরা মসুরি ঘুরে ফেরত এসে যাব। আমি আভাসের সঙ্গে ড্রয়িংরুমে একই সোফায় শুয়েছি। ওর বুকে মাথা গুঁজে। ওর বুকের গরম এবং প্রথমবার অন্য শহরে ঘুরতে যাওয়ার উত্তেজনা আমার চোখ থেকে ঘুমকে উধাও করে দিয়েছে। চলছে সায়লির কথাও। আভাস তার বারবার বন্ধু পরিবর্তনের ব্যাপারটাকে মোটেও পছন্দ করছে না। সে অভিলাষার ক্লাসমেটের সঙ্গে এক রাতের সম্পর্ককেও পছন্দ করেনি। অভিলাষার আফসোসকেও কানে নেয়নি। আমি এক কথায় ঠিক নয় বলে মন্তব্য করতে পারি না। আজকাল দুনিয়া অনেক পাল্টে গেছে। আগে মানুষের ইচ্ছে থাকলেও উপায় ছিল না। এখন ইচ্ছের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উপায়ও নাচছে। সম্পর্ক বজায় রাখা একপাক্ষিক দায়িত্ব নয়। কি করে বুঝব তাদের মনে কি চলছে! আমি সায়লি হতে পারিনি সে অন্য কথা। মেয়েটিকে আমার মন্দ লাগে না। চলার পথে কোন বাধা এলে একটু আধটু এগোনোর চেষ্টা সে করে। বাধা সরলে ভাল, না সরলেও হতাশার কিছু নেই। সেই পথ ছেড়ে বিকল্পের সন্ধানে নেমে পড়ে। পুরনোকে বাদ দিয়ে অনবরত নতুনকে গ্রহণ করার অসম্ভব ক্ষমতাহেতু মেয়েটির জীবনের সব দুঃখ, সব আফসোস ক্ষণস্থায়ী, সাময়িক।

আমি আভাসকে বলি,"নিশ্চয় সাই-এর সঙ্গে ওর কোন সমস্যা হয়েছে। বিষ্ণু বা অক্ষয়ের সঙ্গে সায়লির শারীরিক সম্পর্কও হয়নি।"

"তবু..."

"আশা করি সে শিবের সঙ্গে টিকে যবে।"

"টিকবে না। বাজি রাখতে পারি। দু'জন মসুরিতে যেতে পারবে না।"

মা মাঝে মাঝে উঠে এসে পর্দার আড়াল থেকে ডেকে বলছেন,"রিলি ঘুমিয়ে পড়ো। সবে জার্নি করে ফিরেছো। কয়েক ঘণ্টা বিশ্রাম নাও। নইলে কালকে শরীর ধকল নিতে পারবে না।"

আমি মায়ের কথাকে গুরুত্ব দিচ্ছি না। বলছি,"ঘুমোচ্ছি।" কিন্তু আমরা ঘুমোই না। আমরা গল্প করি। মাথামুণ্ডু ছাড়া সব গল্প। অপ্রয়োজনীয় কথার জালে পড়ে হচ্ছে সব।

মা আবার আসেন। এবার একটু কড়া স্বর,"রিলি!"

আমার আওয়াজ মায়ের চেয়েও কঠিন, "ঘুমবো বাবা, তুমি যাও।"

বেয়াদব আমি। মায়ের নিয়ন্ত্রণের বাইরে দেখে প্রকৃতি নিজে হাতে তুলে নিয়েছিল আমাকে শোধরানোর দায়িত্ব। অসময়ে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছিল। চোখে ঘুমের এমন ভারী বর্ম্ম চড়িয়ে রেখেছিল, কানকে এমন অসাড় করে দিয়েছিল যে আড়াইটাতে অ্যালার্ম বেজে বেজে বন্ধ হয়ে গেল তবু আমার বা আভাস কারও কাছে তার খবর

রইল না।

তৃতীয়বার যখন মা উঠে আসেন তখন চারটে বেজে দশ মিনিট।

আমি জেগেছি ভোর চারটেতে। জেগেই আর্তনাদ ছেড়েছিলাম, "আভাস ওঠো।"

আভাস ধড়ফড় করে উঠেছিল, "হ্যাঁ হ্যাঁ, রেডি হতে হবে..."

"কীসের জন্য?"

"আরে এয়ারপোর্টে যেতে হবে যে!"

"এখন আর সময় নেই। ফ্লাইটটা মিস হল।"

"ও শিট! চারটে বেজে গেছে। কি হবে তাহলে?"

"আগামীকাল টিকিট অ্যাভয়লেবল আছে কিনা দেখো।"

"আবার আগামীকাল! এই টিকিটের কি হবে?"

"এই টিকিটের টাকা নষ্ট হবে আভাস।"

"এতগুলো টাকা!"

মসুরিতে 'ওঙ্কার' হোটেল বুক করে ফেলেছি। সেখানকার আইটারিনারি তৈরি হয়ে গেছে। ফেরার টিকিটও করে নিয়েছি। আভাস বলে, "কি করলাম! অ্যালার্মের আওয়াজ একটুও শুনতে পেলাম না!"

মা দেখেন আমরা মন খারাপ করে বসে আছি।

আভাসকে বলি, "কালকের টিকিট কাটো।"

"থাক যাবো না। ক্যান্সেল করো সব।"

"হোটেল বুকিং এবং ফেরার টিকিটের টাকাটাও নষ্ট হবে তাহলে।"

"হোক।"

"কাম অন আভাস! আমরা সেখানে একদিন কম থাকব। তাহলে একদিকের ফ্লাইট টিকিট ছাড়া অন্য কিছুর জন্য অতিরিক্ত খরচা হবে না।"

আর দেরি নয়। সায়লির ধোঁকা, ঘুমের ধোঁকা নিয়ে আমরা মসুরির পথে। এবার হাল্কা হবে মন।

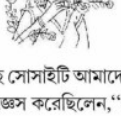

হিতেশ মাকে ফোন করে বলেছে সোসাইটি আমাদের বাড়িতে আভাসের থাকাটাকে ভাল চোখে দেখছে না। মা জিজ্ঞেস করেছিলেন, "সোসাইটি বলতে কারা?"

"কমিটির সদস্যরা।"

কমিটির সদস্যদের মধ্যে প্রধান হল চেয়ারম্যান, সেক্রেটারি এবং ক্যাশিয়ার। আরও আছে চার-পাঁচজন, যারা ভোটিং-এর কাজে আসে। চেয়ারম্যান, সেক্রেটারির

মত তারাও নতুন।

মা হিতেশকে বলেন,"আমরা অন্য কারো বাড়িতে ঢুকে গিয়ে শান্তি বিনষ্ট করছি কি?"

"না, তা নয় ম্যাডাম..."

"অথবা টিনের চালে জল ফেলে কারও ঘুম নষ্ট করছি?"

"আমি সেই কথা বলছি না ম্যাডাম... ওই ছেলেটি নিচে ওয়াচম্যানের সঙ্গে ঝগড়া করেছে জানেন?"

"ঝগড়া করেছে?"

"ঠিক ঝগড়া নয়, কথা কাটাকাটি।"

"কেন?"

"নাম এন্ট্রি করবে না..."

"ওহ্, সো সুইট!"

"ছেলেটির সঙ্গে আপনার মেয়ের বিয়ে হয়েছে?"

"না।"

"তাহলে?"

"তাহলে আর কি! আমি নিজেই চেয়েছিলাম মেয়ে তার খেয়াল রাখবে এমন কাউকে খুঁজে পাক। বিশেষত কলকাতায় থাকলে আমার ওকে নিয়ে অনেক দুশ্চিন্তা হয়।"

"ফোন রাখুন। দেখতা হুঁ।"

হিতেশ আগেও মাকে 'দেখতা হুঁ' বলেছে। বলেছে মানে বলতে বাধ্য হয়েছে যখন মা গাইতণ্ডেকে নিয়ে অভিযোগ করেছিলেন। এবারও সে একই কথা বলল। কথা একই—'দেখতা হুঁ', কিন্তু কারণ বিশেষে তার ফল ভিন্ন হতেই পারে সেই সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দিয়ে মা নিজের কাজে মন দেওয়ার চেষ্টা করেন এবং তাতে অনবরত ব্যঘাতহেতু গাইতণ্ডেকে নিয়ে নিজেই পুলিশ কমপ্লেন করবেন কিনা ভাবতে থাকেন। এমতাবস্থায় মসুরি থেকে ফিরে আভাস কয়েকদিন আমাদের বাড়িতে রইল। মা অনেক বছর বাদে রান্নায় বৈচিত্র নিয়ে এলেন। বাড়িতে আভাসের উপস্থিতির কারণে অনেক রকম বাঙালি খাবার খাচ্ছি। মা তাকে জামাই হওয়ার আগেই জামাই-আদর দিচ্ছেন। আদর নিতে আভাসও কোন দ্বিধা করছে না। প্রশংসা করছে সে মায়ের রান্নার। জেনে মা আনন্দে উল্লসিত হচ্ছেন। বলছেন, "আরও অনেক পদ খাওয়ানো বাকি।" মায়ের এবং আমার খাদ্যাভ্যাস অনেক আলাদা। আমরা দিনের পর দিন ভাত এবং রুটি না খেয়ে কাটিয়ে দিই। ফলে শরীরের ওজন নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং মায়ের সময়ের সাশ্রয় হয়। আভাস ভাত এবং রুটি, বিশেষত রুটি ছাড়া এক বেলাও কাটাতে পারে না। তাই মা তাঁর নিজের চেহারা পাল্টে ফেলেছেন।

তথাকথিত গৃহবধূর চালে তিনি প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই রান্নাঘরে যাচ্ছেন। ব্রেকফাস্ট তৈরি করতে হবে। অতঃপর ঘরের কাজ সেরে দুপুরে আবার রান্না করছেন। বিকেলে ফলমূল কেটে রাখছেন। রাতেও অনেকটা সময় আবার তিনি সেই রান্নাঘরেই কাটিয়ে দিচ্ছেন। দিয়ে বলছেন, ''রিলি তোমাদের ডিনার রেডি।'' তিনি শুনেছেন আমি এবং আভাস পরস্পরকে 'হানি' বলে ডাকি। তাই রাতে ঘুমতে যাওয়ার আগে আভাসকে বলছেন, 'গুড নাইট রিলির হানি।'

প্রেম করে সুনইনার মধ্যে অনেক পরিবর্তন। চালাক চতুর হয়েছে, নিজের চেহারা নিয়ে যত্নশীল হয়েছে। সে জিমে যাচ্ছে। লোকে বলে প্রেম করলে নাকি মেয়েদের বুদ্ধির পরিস্ফুটন ঘটে এবং ছেলেদের বুদ্ধিনাশ। আভাস এবং আমার ক্ষেত্রে অবশ্য দু'জনারই বুদ্ধিনাশ হয়েছে। জ্ঞানে বা অজ্ঞানে। আভাস শরীরের খেয়াল রাখছে না। আমার ঘরে কার্ডিওভাস্কুলার মেশিন, স্টেশনারি বাইসাইকেল বা আর্ম ব্লাস্টার নেই। এখানে ট্রেডমিল আছে কিন্তু সে ট্রেডমিলে হাঁটছে না। আভাসের মধ্যে অন্যান্য ব্যায়াম করেও শরীরকে সুস্থ রাখার এতটুকু ইচ্ছে নেই। বাইসেপস গেছে, সিক্স-প্যাক গেছে। সে শুধু দুটো ডাম্বেল নিয়ে হাজির হয়েছিল। সেগুলোকেও অস্পৃশ্য বস্তু বানিয়ে ঘরের এক কোণে ফেলে রেখেছে। রেখে আমার কাছে নিরাপত্তাহীনতা প্রকাশ করছে, ''আমার চেহারা খারাপ হয়ে গেলেও তুমি আমায় ভালবাসবে তো?''

''নিশ্চয় হানি।''

আমি জিম-এ যাই না। বাড়িতেই ব্যায়াম করি। কিন্তু পিঠের ব্যথার জন্য কয়েক মাস ধরে করতে পারছি না। ট্রেডমিলেও হাঁটছি না। অথচ আভাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে খাওয়া অব্যহত রেখেছি। আভাসের অনুপস্থিতিতে আমি মাকে অনুকরণ করি এবং পুরনো খাদ্যাভ্যাস অনুসরণ করি এবং উপস্থিতিতে অনুকরণ, অনুসরণ শব্দগুলোকে ভুলে যাই। ওজন বাড়ছে। আমিও শঙ্কাঘিত হয়ে পড়ছি। ওকে জিজ্ঞেস করছি, ''আমার চেহারা খারাপ হয়ে গেলে তুমিই কি আমায় ভালবাসবে?''

সে বলছে, ''নিশ্চয় হানি।''

আভাস নিজের বাড়িতে ডুমুরের ফুল হয়ে গেছে। ব্রেকফাস্ট-এ ডাইনিং টেবিলে একসঙ্গে বসে মা আভাসকে জিজ্ঞেস করেন, ''এখানে থাকা নিয়ে তোমার মা-বাবা কিছু বলেন না?''

সে হাসে, ''ক্লিনিক থেকে ফিরে রাতে বাবা একদিন আমাকে দেখে জিজ্ঞেস করেছিলেন, ''আজ শ্বশুরবাড়ি যাওনি?''

আভাসের বাবার এইটুকু কথায় আমার মন ভরে না। জানতে চাই, ''আর কিছু বলেননি?''

''একদিন বলেছেন, বিয়ে করে ওখানেই থেকে যাও।''

"মাও বলেছেন বিয়ের কথা?"

"না।"

"তিনি কি চান না আমরা বিয়ে করি?"

"জানি না।"

মা'র কপালে ভাঁজ, "তাহলে আমার বাড়িতে থাকার সম্মতি দেন কেন?"

"উনি সম্মতি বা অসম্মতি কিছুই দেননি। তবে আমার বিশ্বাস আমাদের বিয়েতে মা কোন আপত্তি করবেন না। মা অনেক আগেই চেয়েছিলেন বিয়ে করি। তখন আমি রাজি হইনি।"

আমার প্রশ্ন, "আমাকে বলোনি যে?"

"তোমাকে বিয়ের কথা বলছি না রিলি। পূর্বাকে। পূর্বাকেও মায়ের পছন্দ ছিল।"

আভাস বলেছে পূর্বা তাকে ধোঁকা দিয়েছে। তার মায়ের যদি পূর্বাকে পছন্দই ছিল, যদি তিনি চেয়েইছিলেন আভাস পূর্বাকে বিয়ে করুক তাহলে বিয়ে কেন হল না? আভাস বলল, "আমি দু'বছর সময় চেয়েছিলাম।"

"কেন?"

"তখন সবে চাকরিতে জয়েন করেছিলাম। স্যালারি কম ছিল। ভেবেছিলাম দু'বছর চাকরির অভিজ্ঞতা নিয়ে অন্য কম্পানিতে সুইচ করব। কিন্তু মা অসুস্থ হলেন। পূর্বাও পিছিয়ে গেল। সে ভয় পেয়েছিল...।"

"ভয় পেয়েছিল!"

"থাক সেসব কথা।"

মা বললেন, "গলব্লাডারে স্টোন, তাতে ভয়ের কি আছে! আজকাল ক্যানসার এমনকি এডস আছে এমন পরিবারেও লোক বিয়ের সম্বন্ধ করতে ভয় পায় না।"

"ক্যানসার থাকলে ভয় পায়।"

আমি বলি, "আমি হলে পেতাম না।"

"সত্যি বলছ?"

"হ্যাঁ।"

আভাস কয়েক সেকেন্ড স্থির বসে রইল। তারপর বলল, "তাহলে সত্যি কথাটা বলেই দিই। মায়ের গলব্লাডারে স্টোন হয়নি। তাঁর অন্য সমস্যা হয়েছিল। পেটে খুব খিঁচুনি হত। স্টুল ঠিকমত ফর্ম হত না। মানে খাবার হজম হত না। বাবা ভেবেছিলেন ইনফেকশন। উনি ইনফেকশনের চিকিৎসা করেছেন। মেট্রোজিল, সাট্রোজিল কিসব দিয়েছেন। ঠিক হয়নি। পরে অন্য ডাক্তার দেখানো হয়েছে। তিনি এন্ডস্কোপি করতে বলেছিলেন। এন্ডস্কোপিতে স্টমাক-এর গায়ে কিছু স্পট দেখা গিয়েছিল। পূর্বা অনুমান করেছিল ক্যানসার।"

"সত্যিই কি তাই?"

"তোমার কি মনে হয়?"

"নিশ্চয় নয়। আমি তাঁকে কয়েকদিন আগেও দেখেছি। ক্যানসার হলে উনি এমন চলাফেরা করতে পারতেন না।"

"স্পট থেকে টিস্যু নিয়ে বায়োপসি করা হয়েছিল। তেমন কিছু খারাপ রিপোর্ট আসেনি। ডাক্তার বলেছেন, ক্যানসার নয়—আলসার।"

ব্রেকফাস্ট সেরে মা তাঁর শোবার ঘরে নিজের কাজে ব্যস্ত। আমার ঘরের জানালা ঘেঁষা বিছানায় মুখোমুখি বসে আমি এবং আভাস। ঘরের আলনা, শু-স্ট্যান্ড, ওয়ারড্রোব-এর সঙ্গে ম্যাচ করা সাদা স্লাইডিং খাট। খাটটাকে আভাসই জোড়া লাগিয়েছে। জোড়া লাগাতে লাগাতে যখন সে তার শক্তপোক্ত হাতদুটোকে লাল করে ফুলিয়ে ফেলেছিল আমি ভেবেছিলাম সে না থাকলে কি হত। সে না থাকলে আমার শরীর থেকে হাত খুলে পড়ে যেত তবু খাট জোড়া লাগত না। জীবনে একা চলা কত কঠিন। মাও এসব কাজ পারেন না। ইলেক্ট্রিসিটি, ফার্নিচার এবং পাইপলাইনের কাজ ছেড়ে দিন চালানোর জন্য বাকি কাজ উনি অসম্ভব দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করেন। বছরখানেক আগে একটা টেবিল-ফ্যান অনলাইনে অর্ডার করেছিলাম। ডেলিভারি হতেই মায়ের পেছনে পড়েছি, "এটাকে চেক করে নাও। কোন ডিফেক্ট থাকলে এক সপ্তাহের মধ্যে ফেরত পাঠাতে হবে।"

মা প্রথমে কথাটাকে তাঁর কানে প্রবেশাধিকারই দিলেন না। পরদিন আবার তাকে একই কথা বললাম। উনি বললেন, "সময় আছে রিলি। চিন্তা আমার বেশি, ওটা আমার টাকায় কেনা হয়েছে।" প্রত্যেকদিন আমি তাঁর পেছনে পড়ি। প্রত্যেকদিন একই কথা শুনি। ষষ্ঠ দিনে মা করুণ কণ্ঠে বললেন, "এসব আমার দ্বারা হবে না রিলি। বাড়িতে একজন পুরুষ মানুষের দরকার।"

ফ্যান জোড়া লাগানো আমারও সাধ্য নয়। এদিকে সত্যি কথাটা স্বীকার করাও আমার ধাতে নেই। মাকে মনোবল দেওয়ার চেষ্টা করি, "অনেক মহিলাই এসব কাজ করে মাম্মা। আমিও করতাম, অফিস নিয়ে ব্যস্ত আছি তাই পারছি না।"

"তুমি অনলাইনে অর্ডার করতে গেলে কেন? আমাকেই যদি করতে হবে তাহলে আমাকে আমার মত করে করতে দিতে! আমি ইলেক্ট্রিক্যালস-এর দোকানে অ্যাসেম্বল করে ডেলিভারির কথা বলে দিতাম।"

"অনলাইনে অনেক সস্তায় পেয়েছি।"

বাক্সে কোন ম্যানুয়াল নেই। মা আমার ঘর থেকে টেবিল-ফ্যানটা নিয়ে কিভাবে লাগানো হয়েছে তা খুঁটিনাটি বোঝার চেষ্টা করেন। কম করেও দশবার ফোন করে অফিসে আমার কাজে বিঘ্ন ঘটান। তারপরেও স্নান-ধ্যান না করে বিরক্তিপ্রস্ফুটিত মুখ এবং অসহায় অথচ অস্থির-চেহারা নিয়ে সন্ধে সাড়ে ছ'টা পর্যন্ত আমার বাড়ি

ফেরার অপেক্ষায় থাকেন। দেখলাম উনি ডাইনিং টেবিলের চেয়ারে বসে সামনে মেঝেতে রাখা অর্ধেক অ্যাসেম্বল করা ফ্যান এবং খোলা পড়ে থাকা ফ্যান গার্ড ও গার্ড রিং-এর দিকে তাকিয়ে আছেন। ''রিং-টাকে ধরো। যতবার স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে লাগাতে চাইছি ততবারই ওটা স্লিপ করে বেরিয়ে যাচ্ছে। আগের ফ্যানগুলোই ভাল ছিল। রিং-ফিং-এর ব্যাপার নেই। গার্ড-এর সঙ্গে তিনদিকে তিনটে হুক...লাগিয়ে দাও, কাজ শেষ।''

মায়ের কথা আমার মাথার উপর দিয়ে গেল। গার্ড-রিং ছাড়া টেবিল-ফ্যানের কোন মডেল আমি কখনও দেখেছি বলে মনে পড়ছে না।

আমি রিং ধরে আছি। মা স্ক্রু-ড্রাইভার দিয়ে স্ক্রু-এ টাইট দিচ্ছেন এবং কুঞ্চিত ভ্রূ নিয়ে বিড়বিড় করছেন, ''সব বাজে মডিফিকেশন। আবার প্যাঁচগুলো কখনও সিধে, কখনও উল্টো...কোনটা কোনদিকে বোঝাও যায় না, মনেও থাকে না...একেবারে যা তা...দেখো তো টাইট হচ্ছে নাকি লুজ হচ্ছে? নতুন ফ্যান, এবারও জোড়া লাগল না, অথচ জায়গাটা ঘষা খেয়ে খেয়ে কেমন এবড়ো খেবড়ো হয়ে গেল...''

''মাম্মা, ছোট স্ক্রু-ড্রাইভার নিয়ে এস।''

''ছোট স্ক্রু-ড্রাইভার কোত্থেকে পাই! ফ্যান ছেড়ে উঠে মা কিচেনে গিয়ে ট্রলি খোলেন, ''এটা স্ক্রু-ড্রাইভার নাকি টেস্টার!''

আমি জানি ওটা টেস্টার। টেস্টার দিয়ে গার্ড-রিং একটু টাইট হতেই মায়ের দম শেষ।

''দেখো তুমি পারো কিনা।''

মায়ের দেওয়া পেটে ঘুষির ব্যথাটা আবার অনুভূতিযোগ্য হয়েছিল। ভেবেছিলাম এখন উনি কত নরম। মন নরম, শরীরেও জোর কমে এসেছে। মানুষ, শুধু মানুষ কেন, প্রতিটি জীবই জীবনের শুরুতে কয়েক বছর নরম থাকে, মাঝের কয়েক বছর শক্ত, তারপরে শেষের দিকের বছরগুলোতে আবার নরম। মাঝের কয়েক বছর তাকে শক্ত হতেই হয়। সেই সময়টা নিজের ব্যক্তিত্বকে রূপ দেওয়ার সময়, নিজের এবং নিজের তৈরি জিনিসগুলোর উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের ও তাদের জীবনের আকৃতির ছাঁচ তৈরির সময়। এখন আমি শক্ত। আমার মন শক্ত। শরীরেও জোর অনেক বেশি। মুখও বড়। বলি, ''আর দরকার নেই।''

''খুলে যাবে না আবার? হাফ ইঞ্চি গ্যাপ রইল যে!''

''ও হো, চিল।''

দিনের বেলায় আমার খাটের অর্ধেকটাকে বাকি অর্ধেকের ভেতরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। রাতে সেটাকে টেনে বের করি। এখন খাট টেনে বের করাই আছে। আমাদের দিনের কাজ শুরু হয়নি তাই। ব্রেকফাস্ট হলেও বিছানায় বসে আবার ঘুমের আমেজ। জানুয়ারি শেষ হতে চলেছে। শহরের নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া শীতকে জাঁকিয়ে

বসার অনুমতি না দিলেও শীতের প্রকোপ একেবারে কমও নয়। জালানার কাচ ভেদ করে আসা সকালের সোনালি রোদ শরীরের তাপকে ধরে রাখতে অক্ষম। ভেতর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে তাপ। বেরিয়ে যেতে যেতে শরীরকে অল্প অল্প কাঁপিয়ে দিচ্ছে। নিচে টগরগাছে কয়েকটি মৌমাছি ফুলে ফুলে ঘুরে বেড়াচ্ছে, মধু সংগ্রহ করছে। আভাসকে বললাম,"ভাগ্যিস তোমার মা অসুস্থ হয়েছিলেন। তা না হলে তোমাকে পেতাম না।"

সে বলল, "ট্রিটমেন্ট চলছে। অনেক ধীরে ধীরে সুস্থ হচ্ছেন। মা নিজেও অনেক চাপে ছিলেন। এখনও চাপমুক্ত হননি। আমার মনে হয় সেই কারণেই উনি আমার বিয়ে নিয়ে কিছু বলছেন না। হয়ত ভাবছেন আগে পুরোপুরি সুস্থ হবেন, তারপর। পূর্বা যে অভিজ্ঞতা দিয়ে গেছে... তোমার সঙ্গে পরিচয় না হলে কি হত কে জানে!..." বলতে বলতে সে অন্য জগতে চলে যায়।

"কার কি হত? তোমার?"

"...আমি নিজেও ট্রমাতে চলে গিয়েছিলাম। এতগুলো বিপর্যয় একসঙ্গে..."

"কেন এত সিরিয়াসলি নিলে? এতগুলো বিপর্যয়ই বা কেন বলছ? মায়ের সামান্য এক আলসারই তো হয়েছে!"

"হ্যাঁ সামান্য আলসার।" স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করল সে। কিন্তু আমিও পূর্বার মত ভাবতে শুরু করেছিলাম... হয়ত ক্যানসার। বোনও নেই..."

'মানে?"

"অ্যাঁহ্," আভাস এবার এই জগতে। "বোন ছিল, কিন্তু সে পিসির বাড়িতে ছিল, যে পিসি এখন আমাদের বাড়িতে আছেন..."

"তোমাদের বাড়িতে পিসি এসেছেন?"

আমার কথায় আভাস আরেকবার চমকে উঠল,"হ্যাঁ, গতকাল আমার এক পিসি আমাদের বাড়ি এসেছেন। মা ফোন করে আসতে বলেছেন..."

"এটা নতুন কি ঘটনা! তোমাদের বাড়িতে বারোমাস একশো বারো আত্মীয়ের যাতায়াত।" আমি কথা ঘুরিয়ে দিই,"আমাদের মসুরির ট্রিপটা খুব সুন্দর ছিল বলো?"

"কেমটি ফলস, গান হিল, ক্যামেলস ব্যাক রোড, হ্যাপি ভ্যালি সত্যি মন খুশি করে দিয়েছে।"

দিল্লি এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে আমরা বাসে বসেছিলাম। দেরাদুন পৌঁছেছিলাম দুপুর একটাতে। সেখান থেকে ট্যাক্সিতে মসুরি। মাঝপথে একটা ধাবা। "ধাবাটার নাম কি যেন ছিল আভাস?"

"মনে নেই। সেখানে আমি আমার জীবনের সবথেকে সুস্বাদু ম্যাগি খেয়েছিলাম।"

"কম্পানি গার্ডেন-এ যেতে যেতে রিকশায় সেই গরম গরম ভুট্টা?"

"রিকশা খুব টুক টুক করে চলছিল..."

"মল রোডের সেই অমলেট! লোকটি কিন্তু অমলেটের জন্যই অনেক নাম কামিয়েছে।"

মা কলকাতায় গেলেন। আভাসও বাড়ি গেল। সে বাড়ি যেতেই সায়লি এল। সায়লি এরই অপেক্ষা করছিল। আমার সঙ্গে আড্ডা দেওয়ার জন্য ছটফট করছিল তার মন। বলল,"এই, ফটো-ভিডিও দেখা।"

"পাঠিয়েছি তোকে!"

"আরও দেখা। প্রেম করতে করতে খুব কৃপণ হয়ে গেছিস।" সে আমার মোবাইল কেড়ে নিল। মনের সুখে সব ফটো ভিডিও দেখে আত্মাকে তৃপ্ত করল। করে হতাশভরা সুরে বলল,"আমার খুব ইচ্ছে করছে কিন্তু মনে হচ্ছে না আমি এমন মজা করতে পারব।"

জিজ্ঞেস করলাম,"সাইকে ছাড়লি কেন?"

"আরে সাই খুব বিয়েপাগল হয়ে গিয়েছিল। মা-বাবা এখন আমার বিয়ে নিয়ে ভাবছেনই না।"

"কেন?"

"দাদা আছে না!"

বিয়েপাগল আমিও। আমি যেদিন আভাসের মায়ের আলসার-এর কথা শুনেছিলাম সেদিন বলেছিলাম,"তোমাকে বিয়ে করতে চাই আভাস। এখনই।"

সে বলেছিল, "একবছর সময় দাও।"

"কেন?"

"একই কারণ। মাকে নিয়ে ছোটাছুটি করতে করতে নিজের জন্য সুইচ-এর কথা ভাবতে পারিনি। খুব মর্মাহত ছিলাম। তা না হলে এখন আমার প্যাকেজ সাত লাখের বেশি হত।"

আমি মাকে বুঝতে দিইনি আমি বিয়েপাগল হয়েছি। উল্টে মা আমাকে বুঝিয়েছেন উনি আমার বিয়ের জন্য পাগল হয়েছেন। সায়লি এবং আমার পারিবারিক কাঠামো আলাদা। ওর মা-বাবা চান ছেলের আগে বিয়ে হোক। তাঁদের ছেলেও চাকরি করে। কিন্তু সেও মনে করছে না সে এখন বিয়ে করার যোগ্যতা অর্জন করেছে। সে এম বি এ করবে, বেশি প্যাকেজের চাকরি পাবে, তারপর। আমার দাদা দিদি কেউ নেই, আমি মায়ের একমাত্র সন্তান। আমার বিয়ের সবুজ সংকেত মা অনেক আগে থেকেই অন করে রেখেছেন, অনুষ্ঠান করে বিয়েতে আমার সমর্থন না পেয়ে রেজিস্ট্রি ম্যারেজ-এই রাজি হয়েছেন। আমি আমার মনের মত ছেলে পেয়েছি তাতেই তিনি খুশি। মনের মত ছেলে এই আশ্বাসটারই তাঁর প্রয়োজন ছিল। প্রতিনিয়ত বলেছেন, ম্যারেজ পেপারটা সাইন করে নাও রিলি। বিলম্ব সয় না। আমি তাঁকে বলতে পারছি

না আভাস সময় চাইছে। বলছি,"আমাকে একটু সময় দাও।"

"আবার সময়?"

"আভাস একটা বেশি মাইনের চাকরি পেলে তবে।"

"সে যে রেড হ্যাট-এ চাকরি পেয়েছে!"

"আরেকটা সুইচ-এর প্রয়োজন।"

"বেশি মাইনের চাকরি শুধু আভাসই কেন করবে? তুমি করবে না?"

"করব। সুইচ পেতে আমার আরও বেশি সময় লাগবে।"

"এই সুইচই এখনকার জন্য যথেষ্ট। আরেকটা বিয়ের পরেও হতে পারে। এখন বিয়ে করলে না খেয়ে তো আর কাটাতে হচ্ছে না।"

"তবু...বিয়ে করে তোমার বাড়িতে থাকা..."

"আমার তাতে কোন অসুবিধে নেই।"

"আমার আছে। আত্মসম্মানে লাগবে।"

"বিয়ে না করে আমার বাড়িতে একসঙ্গে থাকছ। এখন তোমার আত্মসম্মান ঘা খাচ্ছে না?"

যুক্তিতে মাকে আমি হারাতে পারি না। অথচ মানতেও চাই না আমি হেরে গেছি। আরও নানা যুক্তিহীন যুক্তি পেশ করি তাঁর সামনে। উনি তার মাথামুণ্ডু উদ্ধার করতে পারেন না। থেমে যান। মা জানতেন কথা লম্বা আমি হতে দেব না। 'ওহ মাম্মা, তুমি এখন যাও' বলে তাঁকে ঘর থেকে বের করে দেব।

সায়লি বলে, "দাদার জন্য অপেক্ষা করতে করতে চুল পেকে যাবে। তাই প্রেম করে বেড়াচ্ছি। আমার মনে হচ্ছে শিবকেও আঁটকে রাখা যাবে না।"

"কেন?"

"ওরও তোর মত অবস্থা। কোন ভাইবোন নেই। তাই মা-বাবা আর দেরি করতে চাইছেন না।"

সায়লি আগেই আমাকে সংশয় দেখিয়েছিল তার মসুরি ঘুরতে যাওয়া নাও হতে পারে। তখন আমি তাকে গুরুত্ব দিইনি। ভেবেছি এমনিই বলেছে, অবিলম্বে যাওয়ার প্ল্যান করতে পারছে না বলে। এখন বুঝলাম সে সত্যি সত্যি হতাশ। সে বলল, "আমার মনে হচ্ছে তোর জন্য শিব ঠিক ছিল, আমার জন্য আভাস।"

প্রেম করে স্মার্ট হয়ে যাওয়া সুনইনার কাছে অফিসের সব খবর আগে পৌঁছে যাচ্ছে। কেড়ে নিচ্ছে সে খবর। আমার এবং আভাসের ভালবাসা নিয়ে নিরাপত্তাহীনতায় ভোগার সময় অফিসে আরেকটা মস্ত বড় ঘটনা ঘটেছে। ডেলিভারি-লিড অফিস ছেড়েছেন। তাঁকে নিয়ে নাকি ক্লায়েন্টসরা অভিযোগ করছিল।

ডেলিভারি-লিড ম্যানেজারকেও অফিস ছাড়িয়ে তাঁর সঙ্গে নিয়ে গেছেন। কোথায় গেছেন কেউ জানে না। খবরটা সুনইনাই আমাকে দিয়েছে। ওকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ''গিরিধর ট্রান্সপোর্ট কিন্তু আগের মতই চলছে?''

''সে চলছে। কম্পানির কথা কে বলতে পারে! কোনদিন দেখবি কম্পানি নিজের ট্রান্সপোর্ট চালু করেছে।'' সুনইনা বলেছে, ব্যাঙ্গালোরে স্টোরেজ-এর আটান্ন জনকে অ্যাপয়েন্ট করার কাজ সেরে ফেলেছে কম্পানি। তারা ওখানে বসে একই কাজ করবে— মনিটরিং, টিকিট অ্যাসাইনিং, ইনফরমেশন গ্যাদারিং। আমাদের অফিস এখন প্রোজেক্ট-হেড ছাড়া, ডেলিভারি-লিড ছাড়া, ম্যানেজার ছাড়া কেবলমাত্র শিফটলিড শচীনকে দিয়ে চলেছে। শচীনের কাছে প্রাধান্য পাচ্ছে শুধুমাত্র সাক্ষী এবং প্রাজক্তা। নতুন কিছু শেখার হলে শচীন শেষের দিকে ম্যানেজারের প্রিয় হয়ে ওঠা বেদান্তিকে পর্যন্ত বাদ দিয়ে সাক্ষী এবং প্রাজক্তাকে স্কাইপে মিটিং আটেন্ড করতে বলছে। আমরা পরে জানতে পারছি। আমরা এখন কাজ করছি এস পি সি টুল-এ। শুনছি পরের মাসে অফিসে স্নো অর্থাৎ (সার্ভিস নাও) টুল আসবে। কিন্তু সন্দেহ আছে আমি তা শেখার সুযোগ পাব।

অফিসের বাতাবরণ পাল্টে গেছে। সাক্ষী এবং প্রাজক্তার মধ্যে শত্রুতার পর্দা অন্তর্হিত। কানুপ্রিয়া, উজ্জ্বলার সঙ্গে টিকিট, প্যাঁচ আপ ওয়ার্ক ছাড়া অন্য কথা বেশি হয় না। ওরা আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ ছেড়ে দিয়েছে। জানি না অফিস নিয়ে তাদের কি ভাবনা, ব্যক্তিগত জীবন নিয়েই বা তারা কি ভাবছে। গ্রুপে যারা বাকি আছে তারাও বেশি কথা বলে না। মৃতপ্রায় হয়ে গেছে গ্রুপ। সুনইনা আপাতত প্রতীক এবং অফিসের খবর রিলে নিয়ে ব্যস্ত। অভিলাষা ব্যস্ত তার বিয়ে নিয়ে। সংকেত চাকরি পেয়েছে। সংকেতের মহিলা ট্রেনারটি একটা প্লেসমেন্ট সার্ভিস খুলেছে। সংকেতই তার প্রথম ছাত্র, সংকেতই তার প্রথম আবেদনকারী যাকে সে চাকরি দিতে পেরেছে। অনেকটাই টাকা কামিয়ে নিয়েছে সে তার প্রথম ক্লায়েন্ট-এর কাছ থেকে। ট্রেনিং-এর জন্য পঞ্চাশ হাজার এবং চাকরির জন্য পঞ্চাশ হাজার। সুনইনা বলেছিল, ''চাকরির জন্য বেশি নিয়েছে।'' প্রতীকও প্লেসমেন্টের মাধ্যমে চাকরি পেয়েছে। ওকে একমাসের স্যালারি দিতে হয়েছে। মাত্র সাতাশ হাজার।''

অভিলাষা সুনইনাকে বোঝানোর চেষ্টা করে, সংকেতের একমাসের স্যালারি পঞ্চাশ হাজার, তাই ওকে পঞ্চাশ হাজার দিতে হয়েছে।''

একমাসের তর্কে হেরে গিয়ে সুনইনা বলে, ''তা হলেও। পঞ্চাশ হাজার অনেকটাই।''

বেদান্তি বলে, ''আমার দাদাকে প্লেসমেন্ট মাত্র অর্ধেক মাসের স্যালারি দিতে বলেছিল তাও সে রাজি হয়নি।'' সায়লির মত বেদান্তিরও একটা দাদা আছে। কিন্তু সেই দাদাটি সায়লির দাদার বিপরীত মেরুতে বাস করে। বেদান্তির কাছে ওর দাদার

গল্প আমি অনেক আগেই শুনেছি। বি সি এ করেছে। চাকরি করবে না। মদ খায়, বন্ধুদের সঙ্গে দিনরাত আড্ডা মারে, যখন খুশি তখন বাড়ি থেকে বেরোয়, যখন খুশি তখন বাড়ি ফেরে। মদ খেয়ে মাতাল হয়ে বাইক চালিয়ে বাড়ি ফিরতে ফিরতে সে এক রাতে এক ঠেলাওয়ালার গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। ঠেলাওয়ালা সেখানেই অজ্ঞান। ঠেলাওয়ালার ধাক্কা খেয়ে ঠেলা সামনের দু'জন পথচারীকে ধাক্কা দেয়। পথচারী উল্টে যায়, ঠেলা থেকে অনেকগুলো আপেলও রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ে, সেই আপেলে পা পড়ে যেতে আরও দু'জন ওলটায়। বেদান্তি বলেছিল, ''লোকজন জমা হয়ে ঠেলাওয়ালার মাথায় জল ঢালে...''

সুনইনা বাধা দিয়েছিল, ''দাঁড়া, আমাকে হিসেব করতে দে। তাহলে মোট ক'জন পড়ল? এক...দুই আর দুই চার...বল, তারপরে কি হল?''

''লোকটির জ্ঞান ফিরল। দেখা গেল মাথায় কোন সমস্যা নেই। পায়ে সমস্যা। উঠে দাঁড়াতেই পারছে না। পা পোলিও পেশেন্ট-এর মত লিকলিক করছে। বাকি লোকগুলো বেশি চোট পায়নি। পুলিশ আসার আগেই দাদা ঠেলাওয়ালার হাতে এক হাজার টাকা ধরিয়ে দিয়ে হাওয়া। পরে বন্ধুকে পাঠিয়ে ওখানকার একটা কেকের দোকানদারের কাছ থেকে জেনেছে লোকটির পা'টা নাকি কেটে ফেলতে হয়েছে। মাল্টি ফ্র্যাকচার হয়েছিল।''

বেদান্তি বাড়িতে ছুটি কাটিয়ে আজই ফিরেছে। শচীনের কাছ থেকে ঘা খেয়ে আবার খুব রিলি রিলি করছে। অভিলাষা ওকে জিজ্ঞেস করে, ''তোর বিয়ের কি হল রে?''

''ছেলেটি আমাকে আর্ধেক পছন্দ করেছে।''

''আর্ধেক পছন্দের মানে? আমি শুধু পছন্দ এবং অপছন্দ এই দুটো কথাই জানি।''

''মুখশ্রী পছন্দ। শরীরের গঠন পছন্দ নয়...''

সুনইনা জিজ্ঞেস করে, ''তুই পুশ আপ ব্রা, বাটক পরিসনি?''

''পরেছিলাম রে। শোন না...''

''ছেলেটি বুঝতে পেরেছিল?''

''বুঝবে কেমন করে? আমি কি খুলে দেখাতে গেছি? আগে শোন...''

''বল।''

''সে গতকাল আমেরিকাতে ফিরে গেছে। মে মাসে আবার আসবে। বলেছে তার মধ্যে আমাকে মোটা হতে হবে...''

অভিলাষা অবাক, ''বুবস বড়, পাছা বড়, আর কি বড় চাই? পেট। সেটা বিয়ে হলেই হয়ে যাবে।''

বেদান্তি অভিলাষার কথায় কান দেয় না। সে আমাকে অনুরোধ করে, ''মোটা হওয়ার কোন টিপস থাকলে দে।'' কিন্তু আমি ওকে ক্ষমা করতে পারছি না। আমার

মনে পড়ছে সে বলেছিল আমি নাকি অফিসে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কাজ করি।

যেহেতু সুনইনা প্রেম করে চালাক চতুর হয়েছে সে অতীতে অভিলাষার বলা কথার পুনরাবৃত্তি করে, "তুই এই ছেলেটিকে ছাড়। তোর এই বিয়ে হবেই না আমি বলে দিলাম। হলেও ফুলশয্যার পরদিনই দেখবি বর ওর বাড়ি থেকে তোকে তাড়াচ্ছে।"

"না, এবার আমি সত্যি সত্যি মোটা হব। জিমে যাব, ব্যায়াম করব, খাব দাব, বাড়িতে যাব না," বলেই বেদান্তি সুনইনাকে জিজ্ঞেস করে, "তুইও তো জিমে যাস তাই না?"

"যেতাম, এখন ছেড়ে দিয়েছি।"

"ছাড়লি কেন?"

"প্রতীক বলেছে আমার জিমে যাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই।"

"তুই না যা। তোর জিমের নম্বরটা আমার চাই।"

বেদান্তি অভিলাষাকে বলল, "তোর এখন অনেক টাকা। আমাকে দশ হাজার ধার দে।"

"তোর টাকার সংকট কবে থেকে হল?"

"অনেক আগে থেকে। তোদের বলিনি তাই তোরা জানিস না। আমার মা-বাবা শুধু দাদাকে ভালবাসেন। তার কোন অন্যায় তাঁদের চোখে পড়ে না। দাদা এতদিন তাঁদের কাছ থেকে টাকা শোষণ করে উড়িয়েছে। মা-বাবার দিন চলার জন্য আমি টাকা পাঠিয়েছি। এখন সে জিদ ধরেছে বিজনেস করবে। জামাকাপড়ের দোকান খুলবে। তার জন্য মা-বাবা নানা জায়গা থেকে টাকা ধার করছেন এবং আমার ওপরেও চাপ দিচ্ছেন। বুঝতেই চাইছেন না আমার অ্যাকাউন্টে কোন সেভিংস নেই। চাকরি করেও নিজের খুশির জন্য কতই বা আর খরচা করি...।"

আরও অনেক কিছু বলেছিল বেদান্তি। আমি সেসব কথা মন দিয়ে শুনিনি। আমি তখন অন্য কথা ভাবছিলাম। বেদান্তির সঙ্গে ম্যানেজারের সম্পর্কের কথা। সে খারাপ কিছু না-ই করতে পারে। হয়ত শুধুমাত্র একসঙ্গে ঘোরাঘুরি করেছে। করে কম্পানি থেকে ভাল অ্যাপ্রাইজাল হাসিল করতে চেয়েছে। আট পার্সেন্ট ইনক্রিমেন্ট পেয়েছে। আমরা বাইরে থেকে অনেককে অনেক সুখী দেখি কিন্তু তারা আসলে সুখী নয়, আবার যাদেরকে দুঃখী দেখি তারা হয়ত আসলে ততটা দুঃখীও নয়।

বেদান্তি কেঁদে ফেলে, "...মা আমার কাছে এক লাখ টাকা চেয়েছেন। বলেছেন না দিতে পারলে বাড়িতে আসবে না।"

সুনইনার হাত বেদান্তির মাথায়, "আগে এমন বললে তুই তোর প্রেমিককেই বিয়ে করে নিতে পারতিস।"

"না, আমি একেই বিয়ে করব। বাড়িতে আর টাকাই পাঠাবো না। দেখি কি হয়।"

*****

একটা অজানা নম্বর থেকে ফোন পাই, ''আমি কি মিস রিলির সঙ্গে কথা বলছি?'' জিজ্ঞেস করি, ''আপনি কে?''

''রিলি, আমি শ্যামলী, জে এস লার্নিং থেকে বলছি। আমার মনে হয় আপনি ক্লাউড কম্পিউটার-এর পি জি প্রোগ্রাম-এ ইন্টারেস্টেড।''

''আমি রিলি নই, আমি রিলি নই,'' বলেই ফোন রেখে দিয়েছি। গুগল-এ ব্রাউজ করেছিলাম। আজকার গুগল-এ কিছু ব্রাউজ করলেই কোথাও না কোথাও থেকে ফোন এসে হাজির হবেই হবে।

পরদিন একই নম্বর থেকে আবার ফোন, ''আমি কি মিস রিলির সঙ্গে কথা বলছি?'' নম্বরটি অভিন্ন কিন্তু আমি তা আগে খেয়াল করিনি। তাই বলেছিলাম, ''বলুন।''

মেয়েটি সেই একই কথা বলে, ''রিলি, আমি শ্যামলী, জে এস লার্নিং থেকে বলছি। আমার মনে হয় আপনি ক্লাউড কম্পিউটার-এর পি জি প্রোগ্রাম-এ ইন্টারেস্টেড।'' যেন টেপ রেকর্ডার চালানো হয়েছে। লাইন কেটে দিই। পি জি প্রোগ্রাম শুনে মনে হয়েছিল এক বছরের আগে শেষ হবে না। এত সময় দেওয়ার সময় এবং ধৈর্যের কোনটিই আমার নেই। মা পুনে থেকে এম বি এ'র কথা বললে আমি রেগে যাই। 'ইউ এস এ'তে গিয়ে মাস্টার্স করার কথা বললেও আমি ক্রোধে ফেটে পড়ি। মা বলতেন, ''বাড়ি বিক্রি করেই হোক, বা বন্দক রেখে, টাকা আমি জোগাড় করবই।'' এসব কথা আমার ওপর বিশাল চাপ সৃষ্টি করে। টাকা পুরো জলে যাবে না তার কোন নিশ্চয়তা দিতে পারি না। আত্মবিশ্বাসই নেই। আত্মবিশ্বাস-এর অভাব আমার মনে রাগের জন্ম দেয়। মা বলেন ছোটবেলা থেকে তিনি নাকি শুনে এসেছেন চীন দেশটি ভাল নয়। একই কথা তিনি আমাকেও শুনিয়েছেন। তবু আভাস আমার জীবনে আসার আগে মা আমার মনকে চাঙ্গা করতে সাংহাইতে যাওয়ার প্ল্যান করেছিলেন। 'ইউ এস এ'তে একবারও যাওয়া হয়নি। সবাই বলে সেখানে না গেলে, সেখানকার মানুষের জীবনযাত্রা, তাদের সৌজন্য না দেখলে জীবন অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। চীনের প্রগতি আমাকে বিস্মিত করেছে। এত পরিষ্কার শহর, নাগরিকের নিয়মানুবর্তিতা আমি তার আগে যে ক'টি দেশ ঘুরেছি তাদের কোনটিতে দেখিনি। ভাষার সমস্যা ছাড়া পর্যটকদের কাছে সেখানকার সবকিছুই প্রশংসনীয়। ভাষার সমস্যা আমাদের ওখানে থাকার প্রত্যেকটি দিনে অনেক আতঙ্ক দিয়েছে। চীনে ভারতের উবার ওলার মত ডিডি চলে। গাড়ি বুক করে সৌভাগ্যবশত পিক-আপ পয়েন্টে যদি আমরা ড্রাইভারকে পেয়ে যাই, অথবা সে আমাদের পেয়ে যায় তাহলে স্বস্তির নিঃশ্বাস, নতুবা আতঙ্ক। সে ইংরেজি বোঝে না। আমরা পিক-আপ পয়েন্টেই দাঁড়িয়ে আছি দশবার বলেও লাভ হয় না। আসলে পিক-আপ পয়েন্টের যে নাম আমাদের মুখ থেকে উচ্চারিত হয় সেই নাম তাদের মুখ থেকে উচ্চারিত

নামের সঙ্গে মেলে না। রাত বাড়তে থাকে। আমরা আমাদের ভাড়া করা রুম থেকে হয়ত খুব দূরেও নই। তবু সেখানে পৌঁছোতে বুঝি আর পারব না এই ভয়ে হাত-পা থরথর করে। কত নতুন নতুন পাবলিক বাস আমাদের চোখের সামনে দিয়ে চলে যায়। অনেক বাস আমাদের সামনে যাত্রী নামাওঠার জন্য দাঁড়িয়েও পড়ে, অনেক বাস হয়ত আমাদের গন্তব্যস্থল হয়ে যাবেও তবু আমরা সেইসব বাসে চড়তেই পারি না। ইন্ডিয়া, মুম্বাই এসব নামও তারা জানে না অথবা তাদের মত করে উচ্চারণ করে জানে। সাংহাই-এ ডিজনিল্যান্ড ঘোরার সেই রাতে আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম ভবিষ্যতে এমন কোন দেশে যাওয়া নয় যে দেশে ইংরেজি চলে না। ভাষার সমস্যার জন্য আমি জীবনের একবছরও চীনে কাটাতে চাই না। অথচ এক ইংরেজি ছাড়া আমেরিকার কোন শহর সাংহাই-এর চেয়ে বেশি কি প্রগতি দেখাবে সেটাও আমার বোধগম্য হয় না।

অফিস নিয়ে অতিষ্ঠ হওয়ায় সাংহাই থেকে ফিরে ঠিক করলাম বিদেশে যাব। পড়তে নয়, চাকরি করতে। চীন ছাড়া অন্য কোন দেশে। সেটা আমেরিকা হতে পারে, কানাডা হতে পারে, অস্ট্রেলিয়াও হতে পারে। কিন্তু সেইসব দেশে ডিগ্রি না করে সরাসরি চাকরি পাওয়াটা একটু কষ্টকর। আগে এখানে দু'য়েকটা ছোটখাটো কোর্স করে সুইচ করে নিতে হবে। তাকে অবলম্বন করে চাকরি পেলে ভাল, নতুবা খুব বেশি হলে অন্য দেশে একবছরের কোন কোর্স করার কথা ভাবব।

আভাসকে আমি বলেছিলাম ক্লাউড-এর জন্য একবছর দিতে পারব না। আভাস বলেছিল, করা বা না করা তোমার হাতে। মেয়েটা কি বলতে চাইছে তা শুনলে ক্ষতি কি! এবার আমিই মেয়েটিকে ফোন করলাম। মেয়েটি বলল,"রিলি, তোমাকে প্রোগ্রাম ডিটেলস দেওয়ার আগে তোমার প্রোফাইল নিয়ে আমি কয়েকটি প্রশ্ন করতে চাই।"

"করুন।"

"তুমি কোন কম্পানিতে কাজ করছ?"

"একটা মাল্টিন্যাশনাল কম্পানিতে।"

"তোমার কোয়ালিফিকেশন?"

"কম্পিউটার সায়েন্স-এ বি টেক।"

"তোমার জব প্রোফাইলটা?"

"সাপোর্টিং ইঞ্জিনিয়ার।"

"কত বছরের এক্সপেরিয়েন্স তোমার?"

"দু'বছর।"

"ওকে, গ্রেট। কি বিশেষ কারণে তুমি ক্লাউড কম্পিউটিং-এর কোর্স করতে ইচ্ছুক?"

"নিজেকে আপগ্রেড করতে।"

"রিলি, এটি একটি ছ'মাসের অনলাইন কোর্স। এখানে লাইভ মেন্টরিং সেশন

থাকবে। মেন্টরিং সপ্তাহে একদিন হবে। ট্রেনিং দেবেন ইন্ডাস্ট্রি প্রোফেশন্যালস। প্রোগ্রামটি তোমার মত ছেলেমেয়েদের জন্য বানানো হয়েছে যারা চাকরি করছে, যারা মার্কেটের সর্বাধুনিক টেকনোলজির সঙ্গে নিজেদের পরিচিত করতে চাইছে এবং ক্যারিয়ার প্রোগ্রেশন নিয়ে ভাবছে যেখানে তারা ভাল স্যালারি প্যাকেজ পেতে পারে। মার্কেটে এখন অনেক টেকনোলজিই এসেছে যাদের মধ্যে ক্লাউড কম্পিউটিং অন্যতম। ক্লাউড কম্পিউটিং আগামী দু'তিন বছরে বাজারে নিঃসন্দেহে দু'গুণ ছেয়ে যাবে। আজকের তারিখে অন্ততপক্ষে আশি শতাংশ কম্পানি এই প্লাটফর্মের উপরে কাজ করছে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত মাত্র সীমিত সংখ্যক লোক ক্লাউড কম্পিউটিং-এ...।

আওয়াজ আটকে গেল। কথা স্পষ্ট হল না। ''কি বললেন, লিমিটেড নাম্বার অফ...হোয়াট?''

''জাস্ট আ সেকেন্ড, জাস্ট আ সেকেন্ড। আমার ইয়ার ফোনটা ঠিক করে লাগিয়ে নিই...এখন শুনতে পাচ্ছ?''

''হ্যাঁ।''

''যা বলছিলাম, মাত্র কয়েকজনই ক্লাউড কম্পিউটিং শিখে কম্পানিতে ভাল জব প্রোফাইল এবং স্যালারির সুবিধেটা নিতে পেরেছে। এটা একটা কম্প্রিহেন্সিভ কোর্স। এতে তুমি ছয় মাসে ক্লাউড-এর আন্ডারে অনেক টেকনোলজি শিখতে পারবে। তুমি নিশ্চয় সলিউশন আর্কিটেক্ট, ক্লাউড ডেভেলপার, এ ডব্লু এস ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি জব প্রোফাইল-এর ব্যাপারে শুনে থাকবে! শুনেছ কি?''

''হ্যাঁ।''

''তুমি যেহেতু সাপোর্টিং ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কাজ করছ সেই হেতু তুমি অনায়াসে এইসব শিখে নিতে পারবে এবং যেহেতু সাপোর্টিং ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে দু'বছরের অভিজ্ঞতা নিয়ে ফেলেছ, এটাই নতুন টেকনোলজির সঙ্গে জব প্রোফাইল পরিবর্তন করার উপযুক্ত সময়। তিন-চার বছর বাদে কিন্তু খুব কঠিন হয়ে যাবে। তোমাকে বলে রাখি আমরা তোমাকে ক্লাউড কম্পিউটিং-এর এ টু জেড শেখাবো এবং ক্যারিয়ার ট্রানজিশন-এও সাহায্য করব।''

মেয়েটি আমার ব্রেনওয়াশ করেই চলেছে। জিজ্ঞেস করি, ''আমাকে কত টাকা দিতে হবে?''

সে আমার প্রশ্নের উত্তর দেয় না, বলে, ''তোমাকে কোর্সের আরও ধারণা দিই। একটা ইন্ট্রডাক্টরি মডিউল দিয়ে কোর্স শুরু হবে...''

''আপনি রাখুন। আমি একটু পরে আপনাকে কল ব্যাক করছি।''

আভাসকে ফোন করলাম, ''মেয়েটি আমি যা জানতে চাইছি তা বলছে না। একতরফা নিজের খুশিমত বলে যাচ্ছে।''

''কি জিজ্ঞেস করেছিলে?''

"কত টাকা লাগবে। তা না বলে তোমাকে লিনক্স পাইথন ইত্যাদির সঙ্গে পরিচিত করা হবে, ক্লাউড ফাউন্ডেশন-এর সেশন কবে শুরু হবে...এইসব বকবক করছে।"

আভাস রেড হ্যাটে সার্ভার টিমে কাজ করছে। ফিজিক্যাল এবং নেট ওয়ার্কিং-এর মাঝামাঝি কোন কাজ। ডেটা সেন্টার-এর ডেটা ডিভাইস আক্সেস করতে না পারলে নেটওয়ার্ক টিম যদি চেক করে বলে সফটওয়্যারে কোন সমস্যা নেই, তবু ডিভাইস ডাউন তখন ফিজিক্যাল টিমকে মেল করা হয় হার্ডওয়্যারে কোন সমস্যা আছে কি না দেখার জন্য। ডেটা সেন্টারের কাছাকাছিই থাকে ফিজিক্যাল টিম-এর অফিস। রেড হ্যাট-এর ওপেন শিফট-এ আভাস ঠিক কি কাজ করবে তা আমার জানা হয়নি। আভাস নিজেই হয়ত এখনও জানে না তাকে সেখানে কি করতে হবে। শুধু জেনেছে সাপ্তাহিক ছুটিটা তার পাক্কা। শনি এবং রবি।

"তুমি তাকে বললে না আমি যেই কম্পানিতে চাকরি করি সেই কম্পানি লিনক্স তৈরি করে?" আভাসের গলায় মজা।

মজা করি, "যাই বলো, আমার কিন্তু উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম ইউজার ফ্রেন্ডলি লাগে।"

"আমার উল্টো মনে হয়। লিনক্স অপারেটিং সিস্টেম ইউজার ফ্রেন্ডলি।" আভাস জিজ্ঞেস করে, "ওরা এত কিছু শেখাবে? তাহলে শুধু পাইথন কেন? আরও প্রোগ্রামিং লাঙ্গুয়েজ আছে যেমন সি প্লাস প্লাস, জাভা, অ্যাঙ্গুলার জাভা..."

"সেই সবও শেখাবে।"

"তাহলে আরেকবার মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করো কত নেবে।"

"কেন আবার?"

"আমি জানতে চাইছি।"

আমাকে ফোন করতে হল না। মেয়েটিই আমাকে ফোন করল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি শুধু বলুন আমাকে কত টাকা দিতে হবে?"

"বলছি। অন্য ইন্সটিটিউট-এ তুমি দেখবে তারা সরাসরি এ ডব্লু এস, মাইক্রোসফট আজোর দিয়ে ট্রেনিং শুরু করে। কিন্তু আমরা তা করি না। আমরা লার্নিং-এ স্ট্রাকচারড প্রোসেস ফলো করি। আমরা প্রথমে বেসিক শেখাই যেমন ক্লাউড কম্পিউটিং কাকে বলে, কত রকমের ক্লাউড কম্পিউটিং আছে, এ ডব্লু এস কাকে বলে, আজোর কাকে বলে। সুতরাং শুরুর দুই থেকে তিন সপ্তাহ তোমার বেসকে স্ট্রং করা হবে, তারপরে কোর্সের ভেতরে ঢোকা হবে। তুমি নেটওয়ার্কিং, স্টোরেজ, অপারেশন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানতে পারবে। তারপরে তোমাকে অন্যান্য টেকনোলজির জ্ঞান দেওয়া হবে যেগুলো একজন ক্লাউড প্রোফেশন্যাল-এর অবশ্যই জানা দরকার। তুমি নিশ্চয় কন্টেনার, ডকার, মাইক্রোসার্ভিসেস ইত্যাদির কথা শুনেছ?..."

"ইয়েস।"

''নিশ্চয় ক্লাউডের বিগ ডেটার কথা শুনেছ যেখানে স্যানড্রা লাইট, হাডুপ, আপাশে এবং হাইক...''

''ইয়েস।''

''আমাদের শেষের মডিউল-এ আছে ক্লাউড মাইগ্রেশন এবং ক্লাউড সিকিউরিটি।''

''ওকে।''

''শুরুতে তুমি বিগিনার লেভেল-এ থাকবে। কিন্তু ছ'মাস পরে কোর্সশেষে তুমি নিজেকে ক্লাউড কম্পিউটিং প্রোফেশন্যাল হিসেবে নিজের পরিচয় দিতে পারবে। আমরা শুধু থিওরিই শেখাবো না, সিলেবাসে প্র্যাক্টিক্যালও আছে। প্র্যাক্টিক্যাল ছাড়া তোমার জানাটা সম্পূর্ণ হবে না এবং তুমি ইন্টারভিউ-এ পাশ করতে পারবে না। মার্কেটে একমাত্র আমাদেরই প্রোগ্রাম তোমাকে কুড়িটি কেস স্টাডি ও প্রোজেক্ট অফার করবে। প্রোজেক্ট-এ এ ডব্লু এস, মাইক্রোসফট, আজোর-এর ওপর পনেরোটি ল্যাব-প্রবলেম থাকবে। বাকি পাঁচটি প্রোজেক্ট ইন্ডিভিজুয়াল। সেগুলো তুমি মেন্টর-এর গাইড নিয়ে করবে। শেষের তিনমাস ক্লাসরুম-প্রোজেক্ট করবে। সেখানে তুমি তোমার ফাইনাল প্রেজেন্টেশন দেবে।'' মেয়েটি তাদের প্রোগ্রামের দাম বাড়ানোর চেষ্টা করে, ''আমরা কিন্তু একটা ব্যাচে অনেক জনকে নিই না। খুব বেশি হলে পঁচিশ জন থাকে। লাইভ সেশনের আসল এজেন্ডা হল প্র্যাক্টিক্যাল আন্ডারস্ট্যান্ডিংকে বাড়ানো।''

অনেকক্ষণ মেয়েটির লেকচার শোনার পরে বললাম, ''আপনি কিন্তু আমার প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন না।''

''তুমি কি ফী-এর কথা জিজ্ঞেস করছ?''

''ইয়েস।''

''ছয় মাসের পি জি প্রোগ্রামের জন্য আমরা এক লাখ পনেরো হাজার টাকা ফী চার্জ করছি। জি এস টি আলাদা। সুতরাং তোমাকে মোট এক লাখ উনত্রিশ হাজার আটশো টাকা দিতে হবে। তুমি ফিফটিন পার্সেন্ট ডিস্কাউন্ট পাচ্ছ। অ্যাকচুয়াল কোর্স ফী ছিল এক লাখ পঁচিশ হাজার টাকা প্লাস জি এস টি অর্থাৎ এক লাখ সাতচল্লিশ হাজার পাঁচশো টাকা।''

''আচ্ছা।''

''ভর্তির সময় তোমাকে শুধু কুড়ি হাজার টাকা এবং ট্যাক্স অর্থাৎ তেইশ হাজার ছ'শো টাকা দিতে হবে। বাকি টাকার জন্য আমাদের কাছে অনেক জায়গা থেকে লোনের অপশন আছে। বাকি টাকা তুমি তিনমাসের ইনস্টলমেন্টে দিতে পারো, অথবা ছয়মাসের, অথবা বারোমাসের অথবা আঠারোমাসের। আমাদের কাছে পাঁচ বছর ধরে লোন রিপেমেন্টের অপশনও আছে।''

''কারা দিচ্ছে লোন?''

''আমাদের অনেক ব্যাংক এবং ফাইনানসিং ইন্সটিটিউট-এর সঙ্গে টাই-আপ আছে,

যেমন এইচ ডি এফ সি ক্রেডিলা, লিকুইলোন, টাটা ক্যাপিটাল...। তুমি যদি আঠারো মাসের জন্য লোন নাও তাহলে কোন ইন্টারেস্ট দিতে হবে না আর যদি ছয় মাসের জন্য লোন নাও তাহলে প্রোসেসিং ফীও দিতে হবে না। এটাও বলে রাখি বারো বা আঠারো মাসের জন্য শুধুমাত্র দুই পার্সেন্ট প্রোসেসিং ফী দিতে হবে।"

মেয়েটির খাঁচা থেকে বেরিয়ে আভাসকে ফোন করি। আভাস বলে, "অ্যামাজন-এ অ্যাডমিশন নিলে অনেক সস্তা পড়বে।"

ভর্তি হওয়ার আগে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "সবকিছুই অনলাইনে করানো হবে তো?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ...তোমার কোথাও ট্রাভেল করার দরকার হবে না।"

"সপ্তাহে কতদিন ক্লাস করতে হবে?"

"তুমি অ্যাডমিশন নিলে তোমাকে তোমার নিজের কন্টেন্ট পোর্টাল-এ আক্সেস দেওয়া হবে। লার্নিং ড্যাশবোর্ড থেকে তুমি নিজেই নিজের ট্রেনিং নিতে পারবে। দিনে, রাতে অথবা ট্রাভেলিং করার সময়...তোমার সুবিধে বুঝে। তুমি যদি প্রতিদিন গড়ে এক ঘণ্টা সময় শেখার জন্য দিতে পারো সেটাই যথেষ্ট হবে। সেখানে অনলাইন ভিডিও এবং লেকচার নোট তোমার জন্য ছেড়ে দেব। এছাড়াও প্রত্যেক রবিবারে মেন লাইভ মেন্টরিং সেশন থাকবে। সেখানে মেন্টারের সঙ্গে তুমি এবং তোমার ব্যাচের অন্যান্য ছেলেমেয়েরা জয়েন করবে।"

দু'মাসের অনলাইন ট্রেনিং ফ্রীতে। ট্রেনিং-এর পর পরীক্ষা। শুধু পরীক্ষার জন্য আমাকে একশো ডলার অর্থাৎ সাড়ে সাত হাজার টাকা দিতে হবে।

সবার আগে আমিই অফিস ছাড়ব। একেবারে চুপিসারে।

আভাসের মায়ের পেটের ব্যথাটা কমছে না। অপারেশনই করতে হবে। সে কয়েকদিন এল না। মাকে নিয়েই ব্যস্ত রইল। আমি সঙ্গে থাকতে চাইলাম। সে বলল, "দরকার নেই।" দিন পনেরো একা কাটিয়ে এক রবিবারের ভোরে মাকে ফোন করলাম।

মায়ের সঙ্গে যখন ফোনে কথা বলছিলাম, প্যারালিসিস শব্দটা তাঁর দুই কানকে ছেয়ে ফেলেছিল। "কি বলছ রিলি!" তাঁর গলার স্বর ভীতসন্ত্রস্ত।

"প্যারালিসিস নয় মাম্মা, আমার স্লিপিং প্যারালিসিস হয়েছিল।"

টার্মিনোলজিগুলো আগে থেকে জানা না থাকলেও মা বুঝতে একদমই সময় নেন না। "কখন হয়েছিল?"

"এই তো, একটু আগে।"

মা ঘড়িতে সময় দেখেন,"পাঁচটা পাঁচ বাজে। ওখানে এখনও দিনের আলো ফোটেনি। খুব ভয় পেয়েছ বুঝি?"

"হ্যাঁ।"

"কি দেখলে?"

"আমাদের বসার ঘরের দরজাটা হঠাৎ খুলে গেল। খোলা দরজা দিয়ে একজন বেশ লম্বা-চওড়া অচেনা লোক ঘরে ঢুকল। সে আমার দিকে তাকাতে তাকাতে আমার মাথার কাছে এসে দাঁড়ালো। মাথাটাকে আমার মুখের উপর ঝুঁকিয়ে দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে...আমি ওকে জিজ্ঞেস করতে চাইছি 'কে তুমি?' কিন্তু পারছি না। মুখই খুলছে না। হাত-পা নড়ছে না। অবশ হয়ে আছে সারা শরীর।"

"রাতে ভয়ের কোন সিনেমা দেখেছিলে?"

"না।"

"আমারও কয়েকবার এমন হয়েছিল। 'স্লিপিং প্যারালিসিস'এর মধ্যেই তোমাকে ভাবতে হবে এটা কিছু নয়। মনের ভুল...হ্যালুসিনেশন। কোথায় ঘুমিয়েছিলে?"

"ড্রয়িংরুমে।" বাড়িতে একা থাকলে আমি মায়ের ঘরে ঘুমতে সাহস করি না। মায়ের ঘরের পরিবেশ বদ্ধ লাগে। কিন্তু এখন আমার ঘরেও খাট এসে গেছে। ড্রয়িংরুম শুনে মা জিজ্ঞেস করেন,"কেন?"

"আমার ঘরেও একা ভয় ভয় লাগে। ড্রয়িংরুম অপেক্ষাকৃতভাবে খোলামেলা। মনে হয় ভয়ের কোন কারণ ঘটলে দরজা খুলে পালিয়ে সোজা কমন করিডোরে গিয়ে দাঁড়াতে পারব।" তবু আজ পারলাম না। আমার শরীরের পেশী ব্রেনের অবাধ্য হয়ে পড়ে রইল।

"তুমি কি খুব দুশ্চিন্তা করছ?"

"না।"

"স্বাস্থ্যকর খাবার খাচ্ছ তো?"

"হ্যাঁ মাম্মা।"

"তোমার কি দিনে পর্যাপ্ত ঘুম হচ্ছে না?"

"কখনও হচ্ছে কখনও হচ্ছে না।"

"আমি আসব?"

"না। দাঁড়াও, দেখি আভাসকে কল করি।"

"এখন সকাল হতে চলেছে। ভয়ের কিছু নেই। আগে একটু ঘুমিয়ে নাও।"

সকালে আভাসই আমাকে ফোন করল, "আমি আসছি। এবার এসে একমাস থাকব।" মনে শান্তি। সঙ্গে উত্তেজনা। ভদ্রতার খাতিরে ওকে বললাম, মাকে এই

অবস্থায় ফেলে আসা ঠিক হবে না। সে বলল, ''ছোট অপারেশন, সেলাই প্রায় শুকিয়েই এসেছে।''

আভাস পিঠে ঝোলানো ব্যাগ ভরে নিজের জন্য খাবার-দাবার নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। খাবার-দাবারের মধ্যে আছে ওটস, কর্ণফ্লেক্স, ম্যাগি, ইয়েপ্পি, ইনস্ট্যান্ট ফ্রুট জুস ইত্যাদি। এবার মা নেই যে তাকে খাওয়াবেন। বারোটায় তার পৌঁছনোর কথা। অপেক্ষা করছি কখন আভাসের হাতে দরজার কলিং বেলটা বেজে উঠবে তার। কিন্তু কলিং বেল বাজল না। পরিবর্তে আমার মোবাইল বেজে উঠল। আভাসই কল করেছে, বলছে, ওকে সোসাইটিতে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না।

তাড়াহুড়ো করে নিচে নেমে স্কুটি নিয়ে মেন গেটে ছুটে গেলাম। দেখলাম সেখানে দু'জন সিকিউরিটির সঙ্গে হিতেশ আভাসকে ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে।

হিতেশ বলল,''আমি না তো বলছি না। সামনের রবিবারে আমাদের কমিটির মিটিং। তাতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।''

আভাস জিজ্ঞেস করে, ''কি সিদ্ধান্ত নেবেন?''

''বাইরের লোককে এভাবে থাকতে দেওয়ায় অনুমতি দেওয়া যাবে কিনা।''

আমি মানতে চাই না আভাস বাইরের লোক আর হিতেশ মানতে চায় না সে আমাদের ঘরের লোক।

হিতেশকে বললাম, ''আমি এখানে একা থাকি। কাজে অকাজে সাহায্যের জন্য সঙ্গে কাউকে প্রয়োজন।''

হিতেশ বাইকে বসে ছিল। ''সাহায্য করার জন্য আমি আছি,'' বলে সিকিউরিটিকে ঢুকতে না দেওয়ার কড়া নির্দেশ দিয়ে সে বেরিয়ে গেল।

মাকে ফোন করলাম। উনি একই কথা জিজ্ঞেস করলেন, ''আমি আসব?''

''না, আমাকে একা হ্যান্ডেল করতে দাও।''

হিতেশের চোখে জ্বালা ধরিয়ে দিতে আমি আভাসের সঙ্গে গেটের বাইরে রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইলাম। ওর সঙ্গে আমার সম্পর্কের বাঁধন তোমরা বিন্দুমাত্র নষ্ট করতে পারবে না এমন একটা ভাব দেখিয়ে সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা কাটিয়ে দিলাম। সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা পর হিতেশ এল। দেখল আমার মাথা আভাসের বুকে প্রায় ঠেকে আছে। আমাদের দু'জনের অন্তরঙ্গ পোজ বিল্ডিং-এর গেট দিয়ে যাতায়াতের পথে অনেক লোকের দৃষ্টি কাড়ল কিন্তু কাউকেই কোন জ্বালা দিল না, কেউ কিছু বলল না, কোন অভিযোগ উঠল না।

আভাস গেল। অনেকক্ষণ রোদে দাঁড়িয়ে থাকায় শরীরে অসম্ভব ব্যথা। রাতে মাকে ফোন করে বললাম, ''আমি বিছানায় যাচ্ছি। আমাকে আর ডেকো না। কিন্তু মা আমাকে ছাড়লেন না। বললেন, ''আমাকে কুড়ি মিনিট সময় দাও।''

''কি করবে তুমি কুড়ি মিনিটে?''

"তোমাকে তোমার প্রিয় খাবার বানিয়ে দেব।"
"মজা করো না। আমার মুড অফ।"
"মুড ঠিক হয়ে যাবে। দরজা খোলো। আমি বাইরে দাঁড়িয়ে।"
"পুনেতে?"
"হ্যাঁ ডিয়ার।"

কুড়ি মিনিট বাদে তিনি আমাকে রুটির সঙ্গে মটর-পনির পরিবেশন করলেন। আমার প্রিয় মটর-পনির আজ বড় বিস্বাদ লাগল। একদিকে আভাস নেই, অন্যদিকে রান্নায় স্বাদ নেই। আমার চোখে-মুখে হতাশার উপর হতাশা। আমাকে হতাশ দেখে মায়ের মন ছোট, "অন্যদিনের মতই রান্না করেছি। এত খারাপ হয়েছে?"

কি করে বলি খারাপ হয়েছে! আমি জানি রান্না খারাপ হয়নি। রান্না খারাপ হতে পারে না। মা খুব কম সময়ে রান্না করেন। রেসিপি ছাড়া। অন্য কাজের মাঝখানে সামলাতে না পেরে পুড়িয়েও ফেলেন। মায়ের হাতে চিকেন সবথেকে বেশি পোড়ে। উনি কড়াইয়ে সামান্য তেল ঢেলে চিকেন চড়িয়ে দেন। তারপর তাতে নুন-হলুদ দেন, তারপর পেঁয়াজ কুঁচিয়ে কেটে দেন, তারপর রসুন দেন, তারপর হাতের কাছে যে গুঁড়ো-মশলা পান তা ঢেলে দেন। তারপর গ্যাস সিম-এ রেখে অন্য কাজে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে যান। অনেকক্ষণ রান্নাঘর থেকে কোন শব্দ আমার কানে আসে না। অনেকক্ষণ পর মায়ের দৌড়নোর শব্দ শুনি। সঙ্গে চিৎকার, "রিলি, চিকেন পুড়ে গেছে!" মা আশা করেন আমিও দৌড়ে রান্নাঘরে যাব, কড়াই-এ পুড়তে থাকা চিকেনের দিকে হতাশাময় দৃষ্টি ফেলব, কিন্তু আমি তা করি না। আমি কোনই প্রতিক্রিয়া দেখাই না। যেন কিচ্ছু শুনতে পাইনি। মা কড়াই থেকে পোড়া মশলা খুন্তি দিয়ে চেঁচে ফেলে চিকেনে জল ঢেলে নেড়েচেড়ে চলে আসেন। পুনরায় অন্য কাজে মন দেন। পনেরো মিনিট পর পুনরায় তাঁর দৌড়নোর শব্দ, পুনরায় চিৎকার, "চিকেন পুড়ল, কি হবে রিলি!" আমি পুনরায় নির্বিকার। শুনেও না শোনার ভান। আমি জানি স্বাদের এতটুকু তারতম্য ঘটবে না। ঘটেও না তারতম্য।

মাকে বলি, "খুব ভাল হয়েছে।"
"তুমি সারকাস্টিক্যালি বলছ।"
"একদমই নয়।"
"তোমার বানানো পনির সবসময় সুন্দর।"
"কালকে তোমাকে শিখিয়ে দেব।"

রাতে মায়ের বিছানায় মায়ের পাশে শুয়ে। এ সি চলছে তবু গরম লাগছে। জেগে আছি। কমিটির জন্য। নাহ্, কমিটির সবাই নয়। হিতেশ ছাড়া কমিটির অন্য কারোর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে কোন কথা বলার সুযোগ আমি পাইনি। তাই শুধু হিতেশকেই

আমার ঘুম না আসার জন্য দোষ দেব। সে-ই আমার চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। আমার শরীর মনকে গরম করে দিয়েছে। আভাস সঙ্গে থাকলে গরম সহ্য হয়ে যায়। সে না থাকায় হয়নি। মায়ের পাশে শুয়ে শুয়ে সেই গরমের কথাই ভাবছিলাম। মসুরি ঘুরতে যাওয়ার কথা ভাবছিলাম। মসুরি যাওয়ার আগের রাতেও আমার শরীরের তাপমাত্রা খুব বেড়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেই রাত আজকের রাতের মত অসহনীয় হয়নি। কারণ সেই রাতে শরীর গরম হওয়ার কারণ আলাদা ছিল—উত্তেজনা, আজকের কারণ হল রাগ। হিতেশ আমার শরীরকে রাগে সম্পৃক্ত করে দিয়েছে। সেদিন বারবার মায়ের ঘুমিয়ে পড়ার নির্দেশকে অবমাননা করে ঘুমকে ডাকার চেষ্টাও করিনি। ভাবছি মা কত অভিজ্ঞ। কত দূরদর্শী। আর আমি! আমি ঠিক উল্টো। অনভিজ্ঞ এবং অদূরদর্শী। কৈশোর পেরিয়ে এসেছি অনেক বছর আগে। পেরিয়ে এসে ঘোর যৌবনে প্রবেশ করেছি। তবু কৈশোরের নিয়মানুবর্তিতা উল্যঙ্ঘনকারী প্রকট জিনটিকে বশে আনতে পারিনি।

মা ঘুমচ্ছেন। আমার তাঁকে ঘুমতে দিতে ইচ্ছে করছে না। অথচ তাঁকে জাগাতেও পারছি না। আমি একটু একটু করে বিভিন্ন সম্পর্ককে বুঝতে পারছি। কোন সম্পর্কই কোনরকম প্রতিবন্ধকতা ছাড়া স্পষ্ট স্বচ্ছ রাস্তা ধরে চলে না। এমতবস্থায় প্রতিবন্ধকতা কম থাকলে অথবা রাস্তায় ক্রমাগত আসতে থাকা প্রতিবন্ধকতাগুলো সরে যেতে থাকলে বা তাদের সরিয়ে দেওয়া সম্ভব হলে আমরা সেই সম্পর্ককে ভাল বলি। মায়ের সঙ্গে আমার সম্পর্ক সেই রাস্তা ধরে চলে যেখানে ক্রমান্বয়ে প্রতিবন্ধকতা আসে এবং মা তাদের সরিয়ে দেন। সুতরাং এই সম্পর্ক ভাল সম্পর্কের গোত্রে আসে। জোড়াতালি দিয়ে ভাল। কিন্তু আমি জানি তা আসলে খুব খারাপ। আমি মাকে কষ্ট দিয়েছি। অনেক সময় যেমন তাঁর সঙ্গে বন্ধুর মত ব্যবহার করেছি তেমনই অনেক সময় বুঝিয়েছি আমাদের মধ্যে দূরত্বও অনেক। মতবিরোধ হলে শেষপর্যন্ত আমি যে আমার ইচ্ছেতেই চলব তা মা জনেন। আমিও জানি মা তা মেনে নেবেনই। একেই বলে স্নেহের কাছে হেরে যাওয়া। ছেলেমেয়েদের কারণেই কিছু মানুষ দু'ধরণের ব্যক্তিত্ব নিয়ে বাঁচে। ছেলেমেয়ের কারণেই তারা কখনো ভীষণ শক্ত এবং অসহনশীল, আবার কখনো ভীষণ নরম এবং সহনশীল। কলকাতায় থাকলে মা দিনে একাধিকবার ফোন করেন। আমি তাঁকে কখনই এমন কোন ধারণা দিইনি যে প্রত্যেকবার আমি তাঁর কল রিসিভ করব। আগেও পুরোপুরি মুডের ওপর চলতাম। এখনও অনেকটা তাই। অফিসের কাজ এবং ব্যস্ততার জন্য কয়েকবার ধরার মত অবস্থায় থাকি না সত্যি, বাকি সময়ে তো থাকি। তবু তাঁর ফোনকে আমি অবহেলা করি। বাড়ির বাইরে বেরিয়ে বাইরের জগতটাকে একটু একটু করে জানছি। অফিসে এবং অফিসের বাইরে কর্মরত মেয়েদেরও দেখছি। তাদের সঙ্গে চেয়ে বা না চেয়ে অনেকেই কথাবার্তা

হচ্ছে। তাতে তাদের মা-বাবার, আত্মীয়-স্বজনের কথা এসে যাচ্ছে। তাদের সঙ্গে, বিশেষত মা-বাবার সঙ্গে তাদের সম্পর্কের প্রকৃতি স্পষ্ট হচ্ছে। তাদের সঙ্গে তাদের মা-বাবার সম্পর্ক এবং আমার সঙ্গে আমার মা-বাবার সম্পর্ককে একই পাতায় পাশাপাশি রেখে তুলনা করছি। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে অকারণ তাঁদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছি, জোরাজুরি করেছি। মনে হচ্ছে তবু নিজের মধ্যে পরিবর্তন আনতে পারছি না। হয়ত চাইছিই না পরিবর্তন আনতে, যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁরা না আমার চোখের বাইরে থাকছেন, নইলে চোখের সামনে থেকে আমার সবকিছুতেই সম্মতি দিচ্ছেন। বিন্দুমাত্র অসম্মত হলেই সহ্য হচ্ছে না, অধৈর্য হয়ে পড়ছি। নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তাদের প্রতি তৈরি হওয়া সহানুভূতি।

কষ্ট দিয়ে দিয়ে মায়ের অসহনশীলতাকে আমি একেবারে দুর্বল করে দিয়েছি। তিনি এখন অনেক নরম, অনেক সহিষ্ণু। আমি এখন আবার তাঁকে অসহিষ্ণু দেখতে চাই। কিন্তু কেমন করে তা বলি! কি করি!

রাত তিনটে পঁচিশে আভাসের মেসেজ। সেও আমার জেগে জেগে রাত কাটাচ্ছে। বলে, ''কাল অফিস থেকে ছুটি নেব। তোমার কাছে থাকব।''

''সম্ভব নয়। আবার তোমাকে মেন গেটের বাইরে থেকে ফেরত যেতে হবে।''

''আমি আগে পুলিশ স্টেশনে যাব। তুমিও এস। সেখান থেকে পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে তোমার সোসাইটির গেটে পৌঁছব।''

''শান্ত হও। কাল সকালে আমরা এ নিয়ে আলোচনা করব।''

আভাসকে শান্ত হতে বলে আমি আবার দু'চোখের পাতা এক করি। নতুন করে ঘুমনোর প্রয়াস। এবার আধা ঘুম আধা জাগা। শ্রান্ত শরীর। গলার আওয়াজ দুর্বল।

—কি করে এই অসম্ভব সম্ভব হল আভাস?

—তুমি কি মাউন্ট এভারেস্ট চড়ার কথা বলছ?

—ধুর, মজা করো না।

—তবে কি?

—কেমন করে তোমাকে পেলাম? সন্দীপের সঙ্গে সম্পর্ক কেটে যাওয়ার পর থেকে পুরুষ জাতির ওপর বিশ্বাস আরও হারিয়ে ফেলেছিলাম। ঠিকই করে নিয়েছিলাম জীবনটা একা কাটিয়ে দেবো। একা অর্থাৎ প্রেমিকবিহীন। জীবন প্রেমিকবিহীন হবে বলে মনে কোন আফসোস ছিল না। কিন্তু এখন যখন একজনকে পেয়েছি বিশ্বাসই হতে চায় না এমন কখনো ভেবেছিলাম। স্বপ্ন দেখছি না তো!

—স্বপ্ন।

—একদম নয়।

—চোখ খুলে দেখো।

ধড়ফড় করে বিছানায় উঠি বসি। ভোরের আলো ফুটেছে। মাকে ডাকি, "মা, মা, তোমার স্কুটারটা আমার দরকার।"

"এখন?"

"হ্যাঁ, এখনই। পুলিশ স্টেশনে যাব। আভাসও আসবে।"

"এসব ঝঞ্ঝাটে যেও না রিলি।"

"ঝঞ্ঝাট আমরা করছি না। ওরা করছে। আমরা গতকাল ফোনে পুলিশের সঙ্গে কথা বলেছি। পুলিশ বলেছে আভাসকে বাধা দেওয়ার অধিকার সোসাইটির নেই।"

"তবু বলছি, ধৈর্য রাখো। আমি দেখছি কি করা যায়।"

"আমাকে ফিজিওথেরাপিস্ট-এর কাছেও যেতে হবে। আভাসের এখানে আসাটা একান্তই প্রয়োজন।"

"আমি তোমাকে ফিজিওথেরাপিস্ট-এর কাছে নিয়ে যাব।"

মা বিছানা থেকে নেমে টলমল করছেন। তাঁকে ধরতে গিয়ে দেখি জ্বর। উনি বললেন, "ব্রেকফাস্ট করে বেরবো।"

"তুমি কিভাবে যাবে? চলো, তোমাকেই আগে ডাক্তার দেখিয়ে আসি।"

"জল-হাওয়া পরিবর্তনের ফলে গা সামান্য গরম হয়েছে। ফেরার পথে কয়েকটা ক্রসিন নিয়ে নেব।"

"সে তো নেবই। কিন্তু তোমাকে যেতে হবে না।" ব্যথার মাঝখানে কানে হিতেশের সেই কথাটাই বাজছে, "সাহায্য করার জন্য আমি আছি... সাহায্য করার জন্য আমি আছি... সাহায্য করার জন্য আমি আছি...।" হিতেশকেই কল করি, "আমাকে ফিজিওথেরাপিস্ট-এর কাছে নিয়ে যেতে হবে।"

সে জিজ্ঞেস করে, "কোথায়?" গুগল-এ খুঁজে বের করি একটা ঠিকানা। "ধনোরিতে।" বাড়ি থেকে চার কিলোমিটার দূরে।

"রেডি হয়ে থেকো, আমি অফিস থেকে এসে নিয়ে যাব।"

*****

সন্ধে সাড়ে সাতটায় আমাকে তার পাশে বসিয়ে গাড়ি চালাতে চালাতে হিতেশ মায়ের বদনাম করল, "তোমার মা হঠাৎ করে খুব রেগে যান, আমার তোমার মায়ের সঙ্গে কথা বলতেই ভয় করে।"

মা তাঁর প্রখর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে মানুষের চরিত্র নিখুঁতভাবে মুহূর্তে পর্যবেক্ষণ করে নেন। অনায়াসে অনুমান করে নেন কোন অবস্থায় মানুষটি কেমন আচরণ করতে পারে। তিনি জ্বরের মধ্যেও তাঁর অনুমানশক্তি হারাননি। আমাকে বলেছিলেন, "লোকটা তোমাকে একা পেয়ে অকারণ আমার প্রসঙ্গ টেনে নিয়ে আসবে দেখো।" তাই হল। স্টিয়ারিং-এ হাত রেখেই সে আমার দিকে আড়চোখে তাকালো। নিশ্চয় ভেবেছিল মায়ের সঙ্গে আমার বোঝাপড়ায় কোথাও সামান্যতম ফাটল থাকলে তা

তার খোঁচায় বড় হয়ে যাবে। সেই বড় হয়ে যাওয়া ফাঁক দিয়ে তার সুরের সঙ্গে সুরমেলানো কথা বেরিয়ে আসবে। কিন্তু আমি নীরব রইলাম। আমি মনে মনে হাসছিলাম এবং ভাবছিলাম তার 'যো যো ভু ভু'-ওয়ালা অবোধ্য ভাষার রেকর্ডিংটা আমার মোবাইলে নেই। থাকলে চালিয়ে দিতাম।

গাড়ি অনতিবিলম্বে বিশ্রান্তওয়ারির চৌমাথার সিগন্যালে দাঁড়িয়ে গেল। সে সামনে দেখছে। সামনে স্কুটার, বাইক, চারচাকা প্রাইভেট গাড়ি, টেম্পো এবং দু'য়েকটি নগরপালিকার বাস ভিড় করেছে। আমার চোখ যায় বাঁ পাশের একটা রেডিমেড জামা-কাপড়ের দোকানের দিকে। ডিসপ্লেতে রাখা বাচ্চাদের কয়েকটি পোশাক দৃষ্টি আকর্ষণ করে। হিতেশের ছেলের জন্মদিনে আমন্ত্রিত হয়ে মা এখান থেকেই উপহার দেবেন বলে দুটো পোশাক কিনেছিলেন। বছর তিনেক বাদে তার দো বাচ্চের দ্বিতীয়টির জন্ম হয়। সেটি মেয়ে। মা মেয়ের জন্মবার্ষিকীর অপেক্ষা করেন না। জন্মের খবর পাওয়া মাত্রই দুটো জামা কিনে বাড়িতে গিয়ে দিয়ে আসেন। প্রতিদান হিসেবে হিতেশ সেই মায়ের মেয়ের সুখের দরজায় কুড়ুল মেরেছে।

ফিজিওথেরাপিস্ট আমাকে দশ দিনের কোর্স করতে বললেন। তিনি আমার হাত পিঠ এবং গলার কয়েকটি ব্যায়াম করাবেন এবং পিঠে ইলেক্ট্রোম্যাগ্নেটিক ওয়েভ দেবেন।

"দশদিন আসতে পারব না," আপত্তি জানাই। "আগামী সপ্তাহে আমার সকাল দশটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত ডিউটি থাকবে। যা করার সাতদিনে করুন।"

ফেরার পথে হিতেশ বলল,"তোমার বয়ফ্রেন্ডের আসতে কোন মানা নেই। কিন্তু তাতে দুই পক্ষেরই অভিভাবকের এন ও সি লাগবে।"

"এন ও সি!" এন ও সি অর্থাৎ নো অবজেকশন সার্টিফিকেট আমরা বড় বড় লেনদেন-এ ব্যবহার করি। আমার মুখে বিস্ময় দেখে হিতেশ বলল,"মানে অনুমতি।"

হিতেশ জানত না আমার মনে কি চলছে। সে হয়ত ভেবেছিল আমি তার মুখে মায়ের নিন্দে শুনে খুব রেগে গেছি। বাড়ি গিয়ে মাকে বলব নিন্দের কথা এবং মা কমিটিতে গিয়ে চিৎকার করবেন,"এটা কি ধরণের অসভ্যতামি! মায়ের অলক্ষ্যে মেয়ের কাছে মায়ের বদনাম! সে কি আমাদের পরিবার ভাঙ্গার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে? তার কথা শুনে আমার মেয়ে যদি আমাকে ছোট চোখে দেখতে শুরু করে, যদি আমাদের কোন ভুল বোঝাবুঝির মুহূর্তে আমাকে আঘাত দিতে বলে 'দেখেছ তোমাকে কেউ পছন্দ করে না, তোমার সঙ্গে সবার ঝামেলা, হিতেশও তোমাকে বদরাগী বলেছে?' তাহলে আমার কাছে জীবন অর্থহীন হয়ে যাবে, ভাবব যাকে নিয়ে আমার সংঘর্ষ সে-ই আমাকে ঘৃণা করছে, যার সঙ্গে আমার সংঘর্ষ তাকেই সে সমর্থন করছে। এমন হলে আমি নির্ঘাত সুইসাইড করব এবং এই

সুইসাইডের পেছনে হিতেশের প্ররোচনা আছে এমন নোট লিখে যাব।" একেবারেই অখণ্ডনীয় অভিযোগ। হিতেশ তখন বলতে পারবে না "ম্যায় অভী পুলিস স্টেশনে মে কমপ্লেন্ট লঞ্চ কর রহা হুঁ যো য়ে আউরত মুঝে হ্যারাজমেন্ট কর রহী হ্যায়... আরে মেরা ভী ফ্যামিলি হ্যায়। মেরা ভী ঘরমে মিসেস হ্যায়, দো বাচ্চে হ্যায়।"

মা সুইসাইড করুন বা না করুন এটা নিয়ে সোসাইটিতে শোরগোল সৃষ্টি হবেই। বলি,"আমার মা রাজিই আছেন..."

"ছেলেটিরও মা-বাবার কাছ থেকে লিখে নিয়ে আসতে হবে।"

"ডান।"

রাতে ক্রসিন নিয়ে মা অনেকটা ঠিক,"কি বললেন ফিজিওথেরাপিস্ট? হাড়ে কিছু হয়নি তো?"

"না না, ক্রনিক লাম্বার স্ট্রেন। মাসল স্প্যাজম হচ্ছে।"

"তুমি জানো লাম্বার কাকে বলে?"

"না।"

"পিঠের নিচের এরিয়াটা হল লাম্বার এরিয়া যেটাকে লোয়ার স্পাইনও বলা হয়। মানুষের লাম্বার এরিয়াতে পাঁচটা লাম্বার ভার্টিব্রি আছে—এল-১, এল-২, এল-৩, এল-৪ এবং এল-৫। লাম্বার টিস্যুতে কোথাও ইনজুরি হয়ে থাকবে।"

"যা হয়েছে হয়েছে। আর ছয়দিন যাব।"

"মাত্র সাতদিনে ঠিক হয়ে যাবে?"

"সারলে সারবে। না সারলে না সারবে। পরে দেখব। হিতেশ আভাসের জন্য সবুজ সংকেত দিয়েছে..."

তেতো হাসেন মা, "দেখেছে এখন তুমি তোমার প্রয়োজনে সত্যি টানাটানি করছ। তবু আমার কিন্তু বিশ্বাস হচ্ছে না যে লোকটা আবার ঝামেলা করবে না।"

"করবে না ঝামেলা। আভাসকে শুধু একটা স্টেটমেন্ট নিয়ে আসতে হবে...হিতেশ তোমার নিন্দে করছিল। তুমি নাকি..."

"বলেছিলাম না? থাক, শুনতে চাই না।"

"দেরি কেন! আজ সোমবার। আমার ছুটি। আসছে শনি-রবি আভাসের সাপ্তাহিক অফ। আমার এদিককার ঝামেলা চুকিয়ে নিয়ে শনিবারে আভাসকে আসতে বলব। সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র এই পাঁচদিন হিতেশই আমাকে নিয়ে যাক।"

"একদম না। আমি এখন ঠিক আছি। কাল থেকে আমার সঙ্গে যাবে।"

শনিবার সকাল থেকেই আমার মনে ভীষণ উত্তেজনা। আগের দিনগুলোতে মা রাস্তার ধারে গাড়ি পার্ক করে আমার সঙ্গে তিনতলায় উঠে গেছেন। আমি ক্লিনিকে ঢুকেছি, উনি বারান্দায় এক ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকেছেন। শনিবারে মায়ের গাড়ি বিল্ডিং-এর

নিচে ফুটপাথে জোর ধাক্কা খেল। গাড়ি থেকে অয়েল লিক হচ্ছে। মা বললেন, "তুমি যাও, আমি গাড়িটাকে মেকানিকের কাছে নিয়ে যাই।" ভেবেছিলাম মায়ের আসতে দেরি হবে। আজ আমাকেই মায়ের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। তাই ক্লিনিক থেকে বেরিয়ে মাকে বারান্দায় দেখে অবাক হলাম। "তোমার গাড়ির কি খবর? নিশ্চয় এখনও ওয়েল টপটপ করে মাটিতে পড়ছে?"

"হবে হয়ত।"

"বলেছিলে যে মেকানিকের কাছে যাবে?"

"যাওয়া হয়নি। আভাস আসবে বলে ফলমূল কিনছিলাম।"

ফিজিও-ক্লিনিক থেকে ফিরতে ফিরতেই আমি আভাসকে আসতে বলে দিলাম। কিন্তু বাড়ি ফিরে আমার মনের আনন্দ নিভে গেল। তার জায়গায় জন্ম নিল অনিশ্চয়তা, বিষণ্ণতা। তিনটে বেজে একচল্লিশ মিনিটে আমি হিতেশকে মেসেজ করেছিলাম,'আমার বাগদত্ত আসছে। আপনি প্লীজ সোসাইটির মেন গেটের সিকিউরিটিকে বলে দিন তারা যেন তাকে ভেতরে ঢুকতে বাধা না দেয়।' হিতেশ সেই মেসেজ পড়ল কিন্তু যে উত্তর দিতে এক আধ মিনিট সময় লাগে সেই উত্তর সে আধ ঘণ্টাতেও দিল না।

হিতেশ আমাকে উত্তর না দিলেও, রেগে মাকে কোন সমস্যা হলে চেয়ারম্যানের কাছে যেতে বললেও আমাকে পুনরায় তাকেই মেসেজ করতে অথবা তারই সঙ্গে ফোনে কথা বলার চেষ্টা করতে হবে কারণ আমি জানি মুখে যতই বলুক, সে চায় আমি বা আমরা তার কাছেই যাই। তাকেই খোশামোদ করি। তাইতো আভাসের সোসাইটিতে আসার প্রশ্নে অন্য কেউ নয়, একমাত্র সে-ই বাধা দিতে এবং শর্ত রাখতে ধেয়ে এসেছে।

আধ ঘণ্টা পরে আমি তাকে কল করলাম। সে বলল,"তাকে আজ আসতে মানা করো। আমাকে সোসাইটির কমিটির অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে। সন্ধে ছ'টা থেকে সাতটার মধ্যে আমি আমাদের সিদ্ধান্ত জানতে পারব।"

"সে কি! সে বেরিয়ে পড়েছে যে! একটু পরেই পৌঁছে যাবে।"

"আরে, কালকে আসতে বলো না!" হিতেশের কথার কোনই মাথামুণ্ডু নেই। আগে সে শর্ত রেখে বলেছিল আভাসকে তার মা-বাবার কাছ থেকে লিখিত অনুমতি নিয়ে আসতে হবে, এখন বলছে কমিটির মিটিং-এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে আভাসকে আসার অনুমতি দেওয়া যাবে কিনা। আবার একইসঙ্গে এটাও বলছে কালকে আসতে বলো। যদি এমনই হয়, যদি মিটিং-এর সিদ্ধান্তের জন্য আমাকে অপেক্ষাই করতে হয় তাহলে আমি তাকে এখন এটাই বা কি করে বলি 'আভাস, আজ ফিরে যাও, কালকে এস!' সিদ্ধান্ত 'না'ও হতে পারে! হিতেশের কথাবার্তা এবং আমার অনুভূতি আমাকে বুঝিয়ে দেয় হিতেশ আমাকে ঘোল খাওয়াচ্ছে। তবু আমি আশাবাদি। আমার

আশা আমায় বলে, কমিটির সিদ্ধান্ত নিশ্চয় 'না' হবে না। তাকে অনুরোধ করি, ''প্লীজ আমাকে পাঁচটার মধ্যে জানিয়ে দিন।'' জানিয়ে দিন মানে 'হ্যাঁ' বলে দিন।

আমি হিতেশকে ফোন করি বিকেল পাঁচটা বেজে তিন মিনিটে। সে বলে, কমিটির বাকি সদস্যরা এখন ঘুমচ্ছে, সুতরাং আরও সময় লাগবে। আমি আমার বেডরুমে মনমরা হয়ে বসে থাকি। সাতটা দশে পুনরায় তার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করি । সে ফোন রিসিভ করে না। দশ মিনিট বাদে সে আমায় ফোন করে। বলে,''ম্যাডাম, আপনার একদমই ধৈর্য নেই। কমিটির এতগুলো সদস্যকে জমা করতে হয়। আমি এখন নিচে মিটিং-এর জন্য যাচ্ছি। মিটিং হলে আপনাকে জানাবো। সাতটা বেজে ছাপান্ন মিনিটে হিতেশ আমাকে জানালো, কমিটি রাজি নয়। জিজ্ঞেস করলাম, ''কেন''?

''সোসাইটিতে বাইরের কাউকে রাত কাটানোর অনুমতি দেওয়া যাবে না।''

হিতেশ যখন আমায় এই দুঃসংবাদটি দিয়েছে আমি তখন ড্রয়িংরুমে মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে। মা সোফায় বসে আছেন, নিজের কাজ করছেন। এক মুহূর্তে মাকে নিয়ে আমি অনেক ভাবনা ভেবে ফেলি। এই মানুষটি সারাজীবন একা ঘরে, বাইরে, সোসাইটিতে লড়াই করে গেছেন। বুঝিনি তাঁর লড়াই-এর মাত্রা, তাঁর অসহায়তা, তাঁর হতাশা, বাধাপ্রদানকারীদের প্রতি তাঁর রাগ, ক্ষোভ, অনুভব। উল্টে যখন তাঁর সঙ্গে আমার কোন কারণে মতানৈক্য হয়েছে তাঁকেই দোষী করেছি মতানৈক্যের জন্য, বলেছি এটা আসলে হওয়াই উচিত ছিল না, তথাপি যদি হয়েই গেছে তাঁরই মেনে নেওয়া উচিত, তাঁরই আমার মত করে চলা উচিত, নইলে তাঁর আমাকে আমার মত করে চলতে দেওয়া উচিত সে আমি যেভাবেই চলতে চাই না কেন, তাঁরই বাড়িতে থাকি না কেন, তাঁরই ওপর অন্ন ও বাসস্থানের জন্য পুরোপুরি নির্ভরশীল হই না কেন। তাঁর সুবিধে আমি দেখিনি, আমার কাছ থেকে তার কোন আশা আমি বুঝিনি, তাঁর কোন হতাশাকে আমি একদমই প্রশ্রয় দিইনি। ভৌগোলিক এবং মানসিক দূরত্বকে অতিক্রম করে উনি কখনো দু'য়েকটা আত্মীয়স্বজনের কাছে যেতে চেয়েছিলেন, বন্ধন পুনর্গঠন করতে চেয়েছিলেন তাদের সঙ্গে কিন্তু ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছেন। ব্যর্থতার মূল কারণ আমি। তাদের থেকে আড়াই হাজার মাইল দূরে বড় হওয়া আমার পোশাক, আমার কথা, আমার খাদ্যাভ্যাস কোনকিছুই তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি। অথচ আমাদের মতানৈক্যের সময় বেহেকুব আমি তাঁকে আহত করেছি এই বলে যে তাঁকে কেউ পছন্দ করে না।

মা আমার মনের কথা বুঝলেন। বললেন,''দাঁড়াও আমি হিতেশকে ফোন করছি।'' উনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন,''আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে পারি কি?''

''বলুন।''

"আপনারা এমন সিদ্ধান্ত কেন নিলেন একটু এক্সপ্লেন করবেন প্লীজ?"

"আমি এইমাত্র আপনার মেয়েকে বলেছি।"

"বলেছেন তার বাগদত্তকে আসতে দেবেন না। আমি কারণটা জানতে চাইছি।"

"হাম পারমিশন নহী দে সকতে, নহী দে সকতে, নহী দে সকতে," হিতেশ বাচ্চার মত চিৎকার করে কথায় ফুলস্টপ মেরে দিতে চায়।

"আরে আপনারা এত বড় একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তার পেছনে নিশ্চয় কোন কারণ আছে..."

হিতেশ 'কারণ'কে লিগাল শুনে বাক্যটিকে পুরো অর্থহীন বানিয়ে দিল। উত্তেজনাতে এই ধরণের ভুল করা তার স্বভাবদোষ। বলে,"লিগাল নহী হ্যায় ম্যাডাম। বাইরের লোকের সোসাইটিতে রাতে থাকার অনুমতিই নেই।"

"আমি সেই বিষয়েই আলোচনা করতে চাইছি..."

"এতদিন সে আপনার বাড়িতে ছিল। আমরা তা নিয়ে কখনো বিরোধিতা করিনি..."

মা ভাবেন বিরোধিতা করার অধিকারই বা তাদের কোথায়!

"আমরা দেখিনি আপনার বাড়িতে কে আসছে কে আসছে না..."

মা ভাবেন কেউ না এলে তাদের তাকে দেখার প্রশ্নই আসে না, এবং কেউ এলে তাকে বাধা দেওয়ারও কোন প্রশ্ন আসে না। আমার বাড়িতে কে আসবে কে আসবে না তা শুধু আমার বিচার্য বিষয়। সে বা তারা সোসাইটির সুরক্ষা নষ্ট না করলেই হল। আমাদের বাড়ির দরজায় হিতেশের চৌকিদার চোখ সাঁটা আছে, তাই সে জানে আভাস কতদিন আমার কাছে ছিল, কতদিন ছিল না।

মা শুধু বলেন,"আপনি কথা উল্টোদিকে ঘোরাচ্ছেন।"

"আমার সঙ্গে কথা বলে কোন লাভ হবে না। কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে, এর ওপর কোন বাতবির্তক হয় না। বোঝার চেষ্টা করুন, আউটসাইডার কাউকে আমরা অনুমতি দিতে পারি না।"

মাকে এবং আমাকে একা দেখে হিতেশ তথা সোসাইটির কমিটিকে মানসিক প্রতিবন্ধকতা পেয়ে বসেছে। কমিটি আমার বাগদত্তকে আমার নিজের লোক ভাবতেই পারছে না। একটি ছেলে ও একটি মেয়ের বিয়ে না করে পারস্পরিক বোঝাপড়ায় একসঙ্গে থাকাটা আইনের কাছে গ্রহণযোগ্য কিন্তু সোসাইটির কমিটির কাছে নয়। এটাই যে কমিটির আভাসকে বাধা দেওয়ার একমাত্র কারণ তা স্পষ্ট। আমার এবং আভাসের শারীরিক সম্পর্ক কমিটির সদস্যদের গায়ে বিছুটির জ্বালা ধরিয়েছে। জ্বালা নেভাতে তারা আইনের খেলায় আমার সঙ্গে বাজি রাখতে বদ্ধপরিকর।

হিতেশ প্রস্তাব দেয়,"আপনি মিটিং-এ এসে আপনার বক্তব্য রাখুন।"

"সে পরে হবে। অনুমতি না দেওয়া সংক্রান্ত ব্যাপারে আমার আরেকটা জিজ্ঞাস্য

আছে।"

"আমার সময় নেই। আপনি কাল ফোন করুন।"

পরদিন মা হিতেশকে ফোন করে সময় নষ্ট করলেন না। তার বদলে তিনি একজন উকিলকে জানালেন সোসাইটি কিভাবে আমাদের উৎপীড়ন করছে।

উকিল বললেন,"আপনি একটা পেন এবং সাদা কাগজ নিয়ে বসুন। আমি যা যা আপনাকে বলব তা লিখে নিন।"

মা হাসেন।

"আপনার মেয়ের বয়স কত?"

"পঁচিশ বছর।"

"মেয়ের সঙ্গে যে থাকছিল তার বয়স কত?"

"ছাব্বিশ বছর।"

"ওরা কি একই কম্পানিতে কাজ করে?"

"না, আলাদা।"

"ওদের পরিচয় কিভাবে হয়েছে?"

"কোন সোশ্যাল নেটওয়ার্ক-এ।"

"ছেলেটির ধর্ম এবং কাস্ট কি?"

"সে হিন্দু। কাস্ট জানি না। নাম আভাস ভার্মা।"

"দু'জন কবে থেকে লিভ-ইন রিলেশনশিপ-এ আছে?"

"পাঁচ-ছ'মাস।"

"তখন কি সোসাইটি জানত যে ছেলেটি আপনার বাড়িতে আছে?"

"নিশ্চয়!"

"এটা আপনার ফ্ল্যাট, আপনি আপনার আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব বা পরিচিত যে কাউকে এখানে ডাকতে এবং রাখতে পারেন। সোসাইটির চেয়ারম্যানকে ফোন করে বলুন, আপনি আমার রাইট টু ফ্রীডম বাই দ্য কন্সটিটিউশন অফ ইন্ডিয়া ভায়োলেট করছেন। এটা ভারতীয় সংবিধানের ১৯ থেকে ২২ নম্বর ধারায় উল্লিখিত নাগরিকদের মৌলিক অধিকার।"

উকিলের সঙ্গে কথা শেষ হতেই মা হিতেশের ফোন পান, "আপনি সোসাইটির মিটিং-এ আসুন।"

"মিটিং-এর তারিখ?"

"আমি এখন বলতে পরব না। যখন হবে জানাবো।"

"আপনি এত অনিশ্চয়তার মধ্যে আমাকে রাখতে পারেন না। আমি অনুরোধ করছি এই নির্দিষ্ট কারণেই আপনি আজ-কালের মধ্যে মিটিং ডাকুন।"

"ঠিক আছে। আগামীকাল সকাল দশটায় নিচে মন্দিরের সামনে আসুন।"
সমস্ত পয়েন্ট গুছিয়ে লিখে মা একটা লম্বা-চওড়া ড্রাফ্‌ট তৈরি করেন।

সোসাইটির কমিটির মেম্বারদের মধ্যে আমাদের প্রতিবেশি লোকটিও আছে। লোখণ্ডে। লোখণ্ডে একটি এক বেডরুম ফ্ল্যাটের মালিক। সে এয়ারপোর্টে কোন একটা পোস্টে চাকরি করে। তার পরিবারের সঙ্গে আমাদের পরিবারের সম্পর্ক অর্থাৎ আমার এবং মায়ের সম্পর্ক খারাপ নয়। খুব বেশি কথা আমরা বলি না। খুব বেশি আশা একে অন্যের থেকে রাখি না। তার একটা ছেলে আছে। অমিত। ছেলেটি আমার চেয়ে বছর তিন-চারেকের বড়। আমার আগেই ইঞ্জিনিয়ারিং করে চাকরিতে লেগেছে। ছেলেটাকে দেখে শান্তশিষ্টই মনে হয়। একবার লোখণ্ডের বউ পায়ের রগ ছিঁড়ে হসপিটালে ভর্তি ছিল। মা তাকে নিয়মিত দেখতে গেছেন, লোখণ্ডের শাশুরি লোখণ্ডের পরিবারে সেই অসময়ে রান্নাঘর সামলাতে এলে তাকেও হসপিটালে নিয়ে গিয়ে মেয়ের কাছে ছেড়েছেন। বউটি যেমন চেহারাতে মোটা তেমনই মাথাতে। স্বল্পশিক্ষিত। সব ওষুধের নাম ভুল বলে।

লোখণ্ডের বউ-এর হ্যাজব্যান্ড অর্থাৎ লোখণ্ডের হার্টে একবার রক্ত জমা হওয়ায় অ্যাটাক এসেছিল। বেশ কিছুদিন হসপিটালে ভর্তি ছিল সেও। সেটা আমাদের এই সোসাইটিতে আসার আগের ইতিহাস। তাই মা তাকে হসপিটালে দেখতে যেতে পারেননি। কিন্তু বউটির মুখে বসার ঘরের দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার অসুস্থতার অনেক গল্প শুনেছেন। ডাক্তার বলেছেন যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন তাকে প্রতিদিন একটা করে ইকোস্পোরিন নিতে হবে। বলতে বলতে বউটির চোখ বড় হয়ে গোলাকার..."বুঝেছো। যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন..."

"তা তো বটেই। মানুষ মরে গেলে ওষুধ কি করে নেবে!"

"না না, আমি বলতে চাইছি...সারাজীবন...একদিনও বাদ দেওয়া যাবে না..."

"বুঝলাম। কিন্তু ওষুধটার নাম বুঝতে পারলাম না। কি যেন বললেন?"

"ইকোস্পোরিন," চোখ আরও বড় হল লোখণ্ডের বউ-এর।

"ইকোস্প্রিন?"

"না না, ইকোস্পোরিন," এবার গলা বড়।

এবার মা বুঝলেন। বুঝলেন যে লোখণ্ডের বউকে তার বোঝা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে দিতে হবে। মাকে আসল জিনিসটা নিঃশব্দে বুঝে নিতে হবে।

ছেলেটির ইঞ্জিনিয়ারিং-এর বিষয় নিয়ে লোখণ্ডের বউ মাকে আলাদা আলাদা খবর দিয়েছে। প্রথমে বলছে মেক্যানিক্যাল। পরে যখন জেনেছে আমি কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে করেছি তখন বলেছে অমিতও কম্পিউটার নিয়ে করেছে। আমার সঙ্গে বিষয় মেলাতে গিয়ে সায়েন্স শব্দটাকেও বাদ দিয়ে ফেলেছে। উচ্চারণই করতে পারেনি।

একবছর ছেলেটি কাজ পায়নি। চাকরির নাকি বাজার খারাপ। একবছর পরে বিনে মাইনেতে কোথাও একটা জয়েন করে। ছ'মাস ফ্রীতে সার্ভিস দেওয়ার পর মাইনে হয় পাঁচ হাজার টাকা। দু'য়েক মাস বাদে বাদেই মা জানতে চান, ''অমিতের মাইনে বাড়ল?''

বেশিরভাগ সময় নহী নহী বলতে বলতে একদিন বউটি বলে, ''হাঁ, এবার আট হাজার হয়েছে। আবার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হল। মা অন্তর থেকে চান অমিতের মাইনে বাড়ুক। আরও অনেক মাস পেরিয়ে গেল। নহী নহী বলতে বলতে অমিতের মাইনে বেড়ে বারো হল, সেখান থেকে লাফিয়ে আঠারো, সেখান থেকে সাতাশ। এখন সে সম্ভবত চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা মাইনে পায়।

লোখণ্ডের নাকি এক বেডরুমের আরেকটি ফ্ল্যাট আছে। সেই ফ্ল্যাটটি আসলে কোন সোসাইটিতে আছে বা কোন অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং-এ, বারো বছর অর্থাৎ এক যুগ হয়ে গেল তবু মা এখনও জানলেন না। মায়ের জানার বিশেষ আগ্রহও নেই। লোখণ্ডের বউ নিজেই জানাতে চায়, আবার চায়ও না। বারবার সেই ফ্ল্যাটের গল্প করে এবং বারবার আলাদা আলাদা সোসাইটির নাম বলে। লোখণ্ডের বউ-এর কথা ছলবলে মাগুর মাছের মত পিছলে পিছলে স্থান পরিবর্তন করে বলে একদিন তাকে মা জিজ্ঞেস করলেন, ''আপনার পায়ের নার্ভ কেমন করে ছিঁড়ল? কোথায় পড়ে গিয়েছিলেন? ঘরে না ব্যাঙ্কনিতে?''

বউটি বলল, ''ব্যাঙ্কনিতে।'' সে আগে বলেছিল, ঘরে। এবার তার কথা মায়ের বিশ্বাসযোগ্য মনে হল। কয়েক বছর আমাদের বিল্ডিং-এর ব্যাঙ্কনির পাইপের মুখগুলো নিচে খোলা ছাড়া ছিল। মা দেখতেন প্রতিদিন জল আমাদের পার্কিং-এ জমা হচ্ছে। জায়গাটা শুকনোরই সময় পাচ্ছে না। শ্যাওলা ধরে কালো হয়ে গেছে। শুধু আমাদেরই নয়, এমন করুণ অবস্থা আরও কয়েকটি পার্কিং-এর। কিছু জল পার্কিং থেকে উপচে বিল্ডিং-এর সামনের ওয়াক এরিয়াতেও জমা হত। কোথা থেকে জল আসছে কেউ বুঝতে পারছে না। সন্দেহজনক পরিবারগুলোকে জিজ্ঞেস করা হলে সবাই বলত আমাদের এখান থেকে নয়। আমরা ব্যাঙ্কনি ধুই-ই না। মাঝে মাঝে তাই নোটিশ বোর্ডে সবারই উদ্দেশ্যে নোটিশ লেখা হত 'অনুগ্রহপূর্বক ব্যাঙ্কনি ধোবেন না, শুধু ভেজা কাপড় দিয়ে মুছে ফেলুন। অন্যথা ফল খারাপ হবে। নিচে জল জমা হয়ে হয়ে অনেক জায়গা পিচ্ছিল হয়ে গেছে। বাচ্চারা খেলে, দৌড়ঝাঁপ করে। তারা পিছলে

পড়ে যেতে পারে। অনেক জায়গায় পাডল তৈরি হয়েছে। সেখানে মশা ডিম পাড়তে পারে। সোসাইটিতে ডেঙ্গু ছড়াতে পারে।' কিন্তু মনে হত যাদের জন্য নোটিশ তারা কেউ নোটিশ বোর্ড দেখতেই পায়নি। অথবা দেখেছে, পড়েছে এবং এমন ভাব করেছে যেন এই নির্দেশ তাদের জন্য নয়। তারা হল সব সাধু মানুষ। মা মোটামুটি নিশ্চিত ছিলেন আমাদের পার্কিং-এর দুরবস্থার জন্য শুচিবাই লোখণ্ডের বউই দায়ী। ব্যাঙ্কনি না ধুলে তা পরিষ্কার হবে না—এই ভাবনার বৃত্ত থেকে সে বেরোতে পারে না। তবু মা তার ওপর দোষারোপের ইঙ্গিত ঢালতেও ভয় পান। উনি যখন লোখণ্ডের বউকে বলেন 'দেখুন না, কে যে এমন কাজ করে!' সে বলে, 'ঠিক বলেছেন, লোকের কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই।' মা ভাবেন, এরপর কি বলা যাবে আমার পার্কিং-এ যখন জল পড়ার কলকল শব্দ হয় তখন আপনার ব্যাঙ্কনিটা চেক করতে চাই? তাঁকে একটি কথা গ্রাস করে—প্রতিবেশি, রাগিয়ে লাভ নেই, ভবিষ্যতে আমি সংক্রান্ত কোন জরুরি কাজে যদি দরকার হয়।

বেশ কয়েক বছর পর মাত্র কিছুদিন হল আগে আমাদের পার্কিং সমস্যার সমাধান হয়েছে। সোসাইটির কমিটি পাইপগুলোর আউটলেট মাটির নিচে করে দিয়েছে।

বউটি দীপাবলীতে আমাদের ঘরের দরজার সামনে আমাদের হয়ে আলপনা দেয়, নিজহাতে বানানো নানারকমের মিষ্টি থালা ভরে মাকে দিয়ে যায়। মা চান উনি যখন কলকাতায় থাকেন তখন তাঁর কোন কারণে আমার সঙ্গে যোগাযোগ না হলে লোখণ্ডে বা তার বউয়ের কাছে আমার খবর পেতে। তার জন্য তিনি লোখণ্ডের বাড়ির সবাইকে অনেক জিনিস উপহারও দেন। কিন্তু তারা মাকে তাঁর গিফটের তুলনায় একেবারেই নগন্য সার্ভিস দিয়ে থাকে। মা যদি ফোনে আমাকে না পেয়ে বউটিকে রিং করে অনুরোধ করেন, 'একটু দেখে বলুন না আমার ফ্ল্যাটে তালা আছে কিনা' সে দেখে বলে, এই পর্যন্তই। লোখণ্ডে প্রথমবার মেজাজ নিয়ন্ত্রণে রেখে বলেছে, ''তালা আছে।'' দ্বিতীয়বার বলেছে, ''আমি একটা বিয়েতে এসেছি। আপনি আমাকে এখন ডিস্টার্ব করবেন না।'' শুনে মা আহত। আহত হয়েও সেই একই কথা ভেবেছেন কি আর করা যাবে! প্রতিবেশি, অসন্তোষ দেখালে ভবিষ্যতে সাহায্য পাওয়ার আশা আরও কমে যাবে।

আমাদের বাঙালি সেক্রেটারি সুরজিৎ দেবনাথের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে বিশেষ ভূমিকা থাকে না। আমার ধারণা কেবলমাত্র জাতিভেদ-এর প্রশ্নকে ঠেকিয়ে রাখতে দেবনাথকে পদটি দেওয়া হয়েছে। দেবনাথ বোবা মুখ নিয়ে মিটিং-এ উপস্থিত হয়, বোবা মুখ নিয়ে চেয়ারম্যানের তরফ থেকে নোটিশ সাইন এবং ফ্ল্যাটের মালিকদের সঙ্গে চিঠি চালাচালি করে। সেক্রেটারিকে নিয়েও একটা গল্প আছে। আমি তখন ছোট। তখনও মা-বাবার ডিভোর্স হয়নি। কিন্তু বাবা পুনেতে নেই। নতুন চাকরি পেয়ে তাকে কলকাতায় যেতে হয়েছে। পুনেতে গণেশোৎসব শুরু

হয়েছে। সকাল আটটা থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত লাউড-স্পীকার চলছে। দিনরাত পুজো-প্যান্ডেলে দর্শকের আনাগোনা। রাতে প্যান্ডেলের সামনে মিউজিক ফাউন্টেন চালানো হচ্ছে, পাপেট-শো হচ্ছে। দশদিন চলবে উৎসব। বাবা এখন আসবেন না, কারণ তাকে দুর্গাপুজোয় আমাদের সঙ্গ দিতে হবে এবং মাত্র একমাস পরেই দুর্গাপুজো। উনি এখন এলে আবার ছুটি পাবেন না। তখন সুরজিৎ এবং আমরা আলাদা বিল্ডিং-এ থাকতাম। সে মাঝে মাঝে আমাদের বাড়িতে আসত। আমাদের এমন একাকীত্বের দিনে সুরজিৎ মাকে প্রস্তাব দিল, ''চলুন রিলিকে গনেশ প্রতিমা দেখিয়ে নিয়ে আসি।'' মা আপত্তি করলেন না। কয়েকটি প্রতিমা দেখিয়ে আইসক্রীমের কোণ খাওয়ালো সুরজিৎ। মা তাকে ধন্যবাদ জানালেন। ধন্যবাদ পেয়ে সুরজিৎ সন্তুষ্ট হল না। কয়েকদিন পরে সে আমাদের বাড়ি এসে মায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের ইচ্ছে জানালো। মা বললেন, ''সম্ভব নয়।'' তারপর সুরজিৎ আমাদের বাড়ি আসা বন্ধ করল। মায়ের পরিচিত মহলে প্রচার করল মা খুব অহংকারী। মা ভাবলেন, ছেলেটি বড় ধান্দাবাজ। রাগ হল তাঁর। তিনি একদিন স্কুটারে করে বাইরে থেকে বাড়ির দিকে ফিরছিলেন। হঠাৎ দেখেন সুরজিৎও মুদিখানার দোকানফেরৎ হেঁটে হেঁটে তার বাড়ির অভিমুখে। মা তাঁর স্কুটার সুরজিৎ-এর সামনে দাঁড় করিয়ে তার গতিরোধ করলেন, ''আমি সেদিন একটা মস্ত বড় ভুল করেছি।''

সুরজিৎ মায়ের দিকে তাকায়। হয়ত ভাবে মা তাঁর জবাব 'না' থেকে 'হ্যাঁ'তে পরিবর্তন করবেন। মা বললেন, ''আপনাকে সেদিন সর্বসমক্ষে উলঙ্গ করতে হত।''

শুনে সুরজিৎ মাথা নিচু করে আবার হাঁটা দেয়। সেই যে মাথা নিচু সে করেছে, এখনও পর্যন্ত নিচুই আছে তা, অন্ততপক্ষে মায়ের সামনে।

মা তাঁর ড্রাফ্‌ট নিয়ে মিটিং-এ গিয়ে দেখেন সেখানে ছয় জন পুরুষ, একজন মহিলা। পুরুষরা হলেন চেয়ারম্যান মাতকারি, ক্যাশিয়ার হিতেশ, সেক্রেটারি সুরজিৎ, আমাদের প্রতিবেশি লোখণ্ডে এবং আরও দু'জন। সেই দু'জন এবং মহিলাটির নাম মা জানেন না। মিটিং শুরু করেন লোখণ্ডে, ''আপনি যখন কোন সোসাইটিতে বাস করছেন তখন অ্যাডজাস্টমেন্ট শব্দটার সঙ্গে আপনাকে পরিচিত হতে হবে। অ্যাডজাস্টমেন্ট একপাক্ষিক নয়...'' বিশ্বাসঘাতক প্রতিবেশির আক্রমণাত্মক ভঙ্গিমা মাকে বিহ্বল করে দেয়। মা আশংকা করেইছিলেন সেখানে কথা বলার সুযোগ তিনি পাবেন না। তিনি তাঁর উপস্থিত বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে চেয়ারম্যানের হাতে ড্রাফ্‌টটা ধরিয়ে দেন, ''আমি আমার বক্তব্য এখানে লিখে নিয়ে এসেছি। আপনি কাইন্ডলি এটা পড়ে যা বলার বলুন।'' চার পাতার ড্রাফ্‌ট। প্রথম পাতার দুটো ইংরেজি লাইন পড়তেই মাতকারি দু'মিনিট সময় নিল। এই ড্রাফ্‌ট পড়া শেষ হতেই দু'ঘণ্টা সময় লাগবে। নিজের ক্ষমতা বুঝে মাতকারিও উপস্থিত বুদ্ধি কাজে লাগায়। মাকে বলে,

"আপনি এখন আসুন। আমরা পরে জানাবো।"

"অ্যাকনলেজমেন্ট দিন প্লীজ," মা ড্রাফ্টের ডুপ্লিকেট কপি মাতকারিকে দেন। মাতকারি সেই কপি পাশে মাথা নিচু করে বসে থাকা সেক্রেটারিকে চালান করে, "সাইন করে দাও।"

মাথা নিচু করেই সাইন করে সুরজিৎ।

ড্রাফ্ট-এ লেখা ছিল চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে উত্তর দিতে হবে। চব্বিশ ঘণ্টা সমাপ্ত হওয়ার সাত মিনিট আগে মা উত্তর পেলেন। সুরজিৎ-এর সাইন করা উত্তর। মা উকিলকে ফোন করলেন। উকিল জানতে চাইলেন ওরা কি লিখেছে।

"আপনি সোসাইটিকে অভিযুক্ত করেছেন, হিতেশকে ব্যক্তিগতভাবেও অভিযুক্ত করেছেন। হিতেশ কমিটির সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করে কমিটিরই সিদ্ধান্ত আপনাকে জানিয়েছে। এই মুহূর্তে কমিটি আপনার মেয়ের বাগদত্তকে সোসাইটিতে ঢোকার অনুমতি দিতে পারছে না। এক সপ্তাহ পরে আমরা আবার মিটিং-এ বসব। নতুন সিদ্ধান্ত আপনাকে জানানো হবে।"

মা থানায় গিয়ে পুলিশ কমপ্লেন করার জন্য একটা চিঠি তৈরিও করে ফেলেছেন। কিন্তু অ্যাডভোকেট বলেন, "চিঠিটা আমি চেক করতে চাই। কারণ সেখানে ভাষায় কোন ভুলভ্রান্তি থাকলে কেস ঘুরে যাবে।"

"ঠিক আছে।"

"আমি আপনাকে পরে ফোন করছি।"

ঘণ্টা তিনেক বাদে অ্যাডভোকেট সময় নিয়ে মাকে ফোন করেন, "আপনার ল্যাপটপটা খুলে বসুন।"

মা আমাকে ডাকেন, "রিলি, ল্যাপটপটা নিয়ে এস।" আমি তখন ধীর-স্থির মায়ের একান্ত বাধ্য মেয়ে, ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানি না। এক মিনিটের মধ্যেই চিঠির স্ক্রীন মায়ের চোখের সামনে। পাশে আমি।

"সাবজেক্ট-এ লিখুন, সোসাইটি আমার রিলেটিভ, ব্রাকেট-এ আমার মেয়ের বাগদত্তকে আমাদের নিজেদের ফ্ল্যাটে ফিরে আসতে দিচ্ছে না। মেয়ের বাগদত্তের নামও লিখতে হবে। লিখুন আমাদেরকে মানসিক, শারীরিক এবং অর্থনৈতিকভাবে হেস্তনেস্ত করছে। নিচে লিখুন, ডিয়ার স্যার...না না লিখুন, রেসপেক্টেড স্যার..."

"ওকে...রেসপেক্টেড স্যার..."

"না না রেসপেক্টেড স্যার না...লিখুন, স্যার উইথ ডিউ রেসপেক্ট আমি এই কমপ্লেন্ট লেটারটা লিখছি। প্লীজ নিচের পয়েন্টগুলো নোট করুন...প্রথম পয়েন্ট-এ আপনার নিজের ফ্ল্যাট, কত বছর ধরে এখানে আছেন, মেয়ের নাম, বয়স যতসব ইতিহাস লিখেছেন একদম ঠিকঠাক আছে। আভাস ভার্মা এতদিন এখানে থেকেছে...ও

ব্যক্তিগত কোন কারণে বাড়িতে গিয়েছিল...ওহ্‌কে...আমাদের কি কারণে গিয়েছিল বলার কোন প্রয়োজন নেই, কারণ যা-ই হোক না কেন... যদি পুলিশ জিজ্ঞেস করে কেন গিয়েছিল, আমরা বলতেই পারি মা-বাবা বলেছিলেন কয়েকদিন এখানে থেকে যাও। পুনে চিঞ্চওয়াড-এর পিনকোড ঢেলে দিন...”

“পিনকোড কত?” মায়ের জিজ্ঞাসা।

“খুব সম্ভব তেত্রিশ।”

“না না ওটা উনিশ,” আমি ইন্টারনেট থেকে ইতিমধ্যে খুঁজে নিয়েছি।

মা জিজ্ঞেস করেন, “পিম্পড়ি লিখব না চিঞ্চওয়াড লিখব?”

“পিম্পড়ি-চিঞ্চওয়াড কমা পুনে।” অ্যাডভোকেট চিঠি পড়ছেন, “আভাস ভার্মা আমার মেয়ে এবং আমার সঙ্গে...না না আমার মেয়ে এবং আমার সঙ্গে কাটুন, লিখুন আমাদের সঙ্গে...। আমার মেয়ে ক্রনিক ব্যাক পেন-এর পেশেন্ট...এই প্যারাগ্রাফটা একদম পারফেক্ট লিখেছেন...এরপরে আপনি আপনাদের মধ্যে যা যা কথাবার্তা হয়েছে তা লিখেছেন...ঠিকই আছে। আমি মিস্টার হিতেশকে ফোন করে জিজ্ঞেস করেছিলাম কেন আমার মেয়ের বাগদত্তকে সোসাইটির মেন গেট থেকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। উনি বলেছেন, বাইরের লোক বলে। এই প্রসঙ্গে বলে রাখি, আভাস ভার্মাকে বাইরের লোকের দলে ফেলাটা জেনেশুনে অন্যায় করা। কে আমাদের নিজের কে নয় তা ঠিক করার দায়িত্ব সোসাইটির নয়...সুতরাং আমি বলতে বাধ্য হব যে সোসাইটি আমাদের রাইট টু ফ্রীডমকে ভায়োলেট করছে...বাহ্‌ এজাক্টলি, পারফেক্ট লিখেছেন...আর্টিকল নম্বর একুশ...দারুণ, আর্টিকল নম্বরও উল্লেখ করে দিয়েছেন...।”

ওদিক থেকে আর কোন আওয়াজ নেই। একেবারে সুনসান লাইনের ওপার।

আমি বলি, “হ্যালো...হ্যালো...”

মা বলেন, “হ্যালো...হ্যালো...”

নাহ্‌, ঠাণ্ডা হয়ে গেছে মোবাইল। মা একটু রাগান্বিত, “রেজিস্ট্রি ম্যারেজটা করে নাও রিলি...কতদিন ধরে বলছি। তাহলে আমাকে এভাবে যুদ্ধ করতে হয় না। ম্যারেজ সার্টিফিকেট ধরিয়ে দেব...গল্প শেষ।”

আমিও অশান্ত। এমন এক বিশেষ সময়ে অ্যাডভোকেটের লাইন কেটে গেল! নম্বর ডায়াল করলে লাগছেও না। আভাসকেই ফোন করলাম। “সে বিয়েতে রাজি নয়। বলে, মাত্র একবছর সময় চাইছি। একবছরে সবকিছু ক্লিয়ার হয়ে যাবে।”

“সব কিছু ক্লিয়ার হয়ে যাবে! কি বলতে চাইছ তুমি?”

“কিছু না। তুমি আমাকে দিয়ে লিখিয়ে নিতে পারো...একবছরের মধ্যে তোমাকে আমি বিয়ে করবই।”

আমি মাকে আভাস যে এখন বিয়েতে রাজি নয় সেকথা বলতে পারি না। বলি,

''সোসাইটির চাপে পড়ে বিয়ে করা মানে তাদের কাছে আমার হেরে যাওয়া। আমি এভাবে নিজেকে হারতে দেব না।''

অ্যাডভোকেট ফোন করলেন, ''আমার মোবাইল হ্যাং হয়ে গিয়েছিল। সিম কার্ড বের করে আবার লাগালাম। আপনি লিখেছেন...আমি চেয়ারম্যানকে ফোন করেছিলাম। উনি বললেন, আমি এসবই শোনার জন্য বসে আছি নাকি! এখন লাঞ্চ করছি...আমি বলেছি আমি এখনও স্নানই করার সময় পাইনি...দাঁড়ান দাঁড়ান...এই কথাটা এখানে খারাপ লাগছে। ওটা কেটে দিন।''

''হা হা হা।''

''তার বদলে যা বলছি লিখুন...উত্তরে আমি বলি যে আমরাও মানসিক চাপে আছি। যার ফলে আমি আমার লাঞ্চ তৈরি করতে পারিনি। তারপর...আপনি লিখেছেন, সময় আমাদের কাছে মূল্যবান, আমাদের মানসিক এবং শারীরিক স্বাস্থ্যও মূল্যবান। সেইজন্য সময় নষ্ট, টাকাপয়সা নষ্ট, শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি সবকিছুই সোসাইটির কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ দাবি করে। আমি আরেকবার সোসাইটিকে উল্লিখিত সমস্ত পয়েন্ট পুনরায় বিচার করতে অনুরোধ করে ব্যর্থ হয়েছি...''

আরও অনেক ঘষামাজা হয়ে শেষ হল চিঠি। চিঠি নিয়ে মা আমাকে সঙ্গে করে পুলিশ স্টেশনে ছুটলেন। পুলিশ স্টেশন থেকে হিতেশের মোবাইলে ফোন গেল। হিতেশ বলল, ''ওদের আমার সঙ্গে কথা বলতে বলুন। আমরা নিশ্চয় কোন না কোন রাস্তা বের করব।''

পুলিশ তার মোবাইল মায়ের হাতে ধরিয়ে দিল।

''ম্যাডাম, আপনি নিচে আসুন। আমরাও দু'মিনিটে আসছি।''

মা জানালেন, ''আমি দু'মিনিটে আসতে পারব না।''

''কেন?''

''এখন পুলিশ স্টেশনে আছি।''

''কত সময় নেবেন?''

''আধ ঘণ্টা।''

বিল্ডিং-এর নিচে এসে দেখি হিতেশ গায়েব। সিকিউরিটি বলল, হিতেশ এবং সোসাইটির চেয়ারম্যান দু'জন পুলিশের সঙ্গে কথা বলতে বলতে বাইরে গেছে।

*****

শচীনের ওপর কাজের চাপ বেড়ে যাওয়ায় সে 'পি ও সি' সিস্টেম চালু করেছে। 'পি ও সি'র অর্থ হল পয়েন্ট অফ কন্টাক্ট। প্রতি শিফটে একজন পয়েন্ট অফ কন্টাক্ট থাকে। রোজ প্রত্যেক শিফটে পয়েন্ট অফ কন্টাক্ট বদলে দেওয়া হয়। দিনে তিন

শিফটে মোট দু'শো থেকে আড়াইশো টিকিট আসে। এক একটা শিফটে সত্তর আশি। কখনো বেশিও হয় কারণ পুরনো টিকিটও থাকে। পয়েন্ট অফ কন্টাক্ট শিফটে সবার মধ্যে টিকিট ভাগ করে দেয়।

আমার মর্নিং শিফট, কিন্তু আমি অফিসে অনুপস্থিত। কোন খবর দিইনি আসছি না বলে। অভিলাষা আগেই ফোন করেছিল। সে আজ পি ও সি। অন্য মেয়েদেরও ফোন পাচ্ছি। সাক্ষী বলল, '' সুনইনা অফিস ছেড়ে দিয়ে ব্যাঙ্গালোরে চলে যাবে।''

অবাক হলাম, ''ব্যাঙ্গালোরে যাওয়ার কথা ছিল প্রাজক্তার। সে-ই পুনেতে জেঁকে বসে রইল। তার জায়গায় সুনইনা যাচ্ছে!''

''প্রাজক্তার প্রেমিক ব্যাঙ্গালোরে চাকরি পায়নি। প্রতীক পেয়েছে। ওরা বিয়ে করছে।''

বিয়ে সুনইনা করতেই পারে, পুনে সে ছেড়ে দিতেই পারে, কিন্তু যেই মেয়েটি এত মাস আমার পাশে বসে বকবক করে আমার মাথা খেয়েছে সে নিজে এই খবরটা আমাকে দিতে পারল না!

বেদান্তি ফোন করল, ''দেখেছিস, মেয়েটা কত চালাক। প্রতীকের প্রেমিকার কাছ থেকে প্রতীককে বাগিয়ে নিল। এদিকে আমাদের কাছে মা-বাবা রেগে যাবেন বলে ভেতরে ভেতরে মা-বাবাকে মানিলেও নিল! যে কাজটা আমি করতে পারলাম না সেটা কত অনায়াসে সে করে ফেলল!''

আমি ভেবেছিলাম আমিই সবার আগে অফিস ছেড়ে সবাইকে অবাক করব, তা হল না। 'ডব্লু এন এস'ও কমপ্লিট হল না। পরীক্ষার স্লটই পাচ্ছিলাম না। 'মক টেস্ট মাইক্রোসফট অ্যাপ'এ একটা মক টেস্ট হয়েছিল। তাতে আমিই সবার চাইতে বেশি উত্তর করেছিলাম। টেস্ট দিয়ে নিজের ওপর আস্থা জন্মেছে। ফেল তো করবই না, উপরন্তু ভাল স্কোর নিয়ে পাশ করব। আজ সন্ধে সাতটা থেকে আটটা আমার পরীক্ষা। এক ঘণ্টায় চল্লিশটা প্রশ্নের উত্তর করতে হবে। কোন ব্রেক নেই। পঁয়ত্রিশটা উত্তর সঠিক হলে আমি ক্লাউড আর্কিটেক্ট বা ডেভেলপার ইঞ্জিনিয়ারের পদে আবেদন করতে পারব।

হিতেশ এল কুড়ি মিনিট পরে। স্কুটার চালিয়ে, একা। একটা টি-শার্ট এবং বারমুডা পরে। আমাদের থানায় যাওয়ার কথা শুনে সে ফুল প্যান্ট পরতে ভুলে গেছে। মা নিজের পার্কিং-এ গাড়ির পেছনে দাঁড়িয়ে। হিতেশ তাঁর সামনে তার স্কুটারে বসে। পা মাটিতে। ''ম্যাডাম, আপনি আপনার মেয়ের ফিয়ন্সেকে নিয়ে আসতে পারেন। আমাদের দিক থেকে কোন মানা নেই। আপনি থানায় গিয়েছেন, কোন ব্যাপার না, কিন্তু যাওয়ার আগে যদি আমাকে একবার জানাতেন, খুব খুশি হতাম।''

মা বললেন, ''আপনাকে জানানো হয়েছিল। চিঠিতে লিখেছিলাম, আপনাদের উত্তর হ্যাঁ-বাচক না হলে আমি আপনাদের বিরুদ্ধে অ্যাকশন নিতে বাধ্য হব। ঠিকমত

পড়ে দেখেননি? আর শুনুন, এভাবে মুখে বললে হবে না। আপনারা লিখে বিরোধিতা করেছেন, তাই এখন আপনাদের লিখেই অনুমতি দিতে হবে।"

"ঠিক আছে।"

"আরেকটা কথা।"

"বলুন।"

"একটা সরি নোট দেবেন। তাতে লিখবেন এতদিন আপনারা আমার সঙ্গে যা করেছেন তা অন্যায়।"

"সেটা আমরা লিখতে পারব না ম্যাডাম।"

"আমি তাহলে আপনাকে দিয়ে লিখিয়ে নেব।" মা উপরে চলে আসেন। উনি হিতেশকে বলেন বটে কিন্তু আর ঝামেলায় যেতে চান না। বিকেলেই কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা হন।

*****

সায়লি আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য অস্থির হয়েছে, হোয়াটসঅ্যাপ-এর পরে হোয়াটসঅ্যাপ। আভাস আছে বলে সে আসতে পারছে না। দিন দশেক বাদে এক সোমবারে আভাস এক বেলার জন্য বাড়ি গেল। মাকে হসপিটালে নিয়ে যাবে। পেটের সেলাইটা কাটতে হবে। সেই এক বেলার সদ্ব্যবহার করল সায়লি। চলে এল আমার বাড়ি। বিছানায় আমার পাশে বসে বলল, "শিব বলেছে সে আমার জন্য তিন-চার বছর অপেক্ষা করবে।"

"সুখবর।"

সে তার বাঁ হাতটা আমার চোখের সমানে এগিয়ে দিল, "কেমন?"

"আর্মানি এক্সচেঞ্জ রিস্ট ওয়াচ! কত দাম?"

"সেটাই তো জানি না।"

"কেন?"

"অনলাইনে অর্ডার করে আমার ঠিকানায় ডেলিভারি করিয়েছে। আমি দাম জিজ্ঞেস করেছিলাম। ও বলেছে ট্যাগে লেখা আছে, দেখে নাও।"

"ট্যাগে কত লেখা আছে?"

"চৌদ্দ হাজার চারশো পঁচানব্বই টাকা।"

"বাহ্, তোর এবারের বয়ফ্রেন্ড-এর সিলেকশনটা সঠিক হয়েছে মনে হচ্ছে।"

"না রে, প্রবলেম আছে। আমি মিন্ত্রায় ঘড়িটার দাম চেক করছিলাম। ওখানে সেভেন্টি পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট-এ পাওয়া যাচ্ছে। সেভেন্টি পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট পেলে এটার দাম হয় মাত্র চার হাজার তিনশো পঞ্চাশ টাকা।"

"এই মডেল-এ এত ডিসকাউন্ট নাও থাকতে পারে।"

"আছে। আমি দেখে নিয়েছি।"

"হোক, তবুও পেলি।"

আমার মনে হয় সায়লির পাওয়ার ভাগ্য আমার থেকেও ভাল। আভাস আমার জন্য খরচা করে। আমাকে রাতের ট্রিট দেয়, তার গাড়িতে ঘোরায়, অন্যান্য খরচাতেও হিসেব করে চলে না, কিন্তু এখনও পর্যন্ত তার কাছ থেকে কোন উপহার আমার জোটেনি।

সায়লি বলে, "শিব মিথ্যে কথা বলছে। ভাবছি কি করি।"

"কি করি মানে?"

"আরে, তোকে আমাদের অফিসের মাল্লু ছেলেটির কথা বলেছিলাম না? ইভান। ওর বাবাও আর্মিতে ছিলেন, এখন পুনেতেই থাকেন।"

"কোথায়?"

"চন্দননগরে কোথাও। আমি জানতামই না, সেও কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে পড়ত। আমি ক্লাস টু-তে ছিলাম, সে থ্রী-তে।"

ফুলে ফুলে মধু খেয়ে বেড়ায় মৌমাছি। আমরা যদি মেয়েদের ফুলের সঙ্গে তুলনা করি তাহলে ছেলেরা হল মৌমাছি। ফুল নড়ে না, মৌমাছি নড়ে। মৌমাছি ওড়ে। আমি সায়লিকে উড়তে দেখি। সায়লির প্রেমে ফুলও ওড়ে, মৌমাছিও ওড়ে। আমার এবং সায়লির প্রেমের মহল আলাদা। আমার প্রেমের মহল হল শান্ত মহল। সায়লির অশান্ত। সেই মহলের মেয়েগুলোকে আমার খুব সুখী মনে হয়, তারা আত্মবিশ্বাস নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, ছেলেদের পেছনে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ায়। মেয়েগুলো জানে একজনকে ঠুকরে দিলে আরেকজন আসবে। ছেলেগুলোকে বড় বেচারা লাগে। সায়লির প্রেমের মহলে মেয়েদের সেই সুখের প্রতি অবশ্য আমার কোন আসক্তি নেই। কারণ, সেই মহলের মেয়েগুলোর মৌমাছির মত উড়ে বেড়ানোর খেলা ওই বিয়ে পর্যন্তই। বিয়ে হল কি ওড়া বন্ধ হল। বন্ধ তো হবেই। ফুল কতদিন মৌমাছির মত উড়তে পারে! বিয়ের কিছুদিন পরেই ফুলের মধু শুকিয়ে যায়, ঝরে যায় ফুল। মধু খেয়ে, ফুলকে ঝরিয়ে দিয়ে মৌমাছি অন্য ফুলের তলাশ করে। তখন বেচারা মৌমাছি আর বেচারা থাকে না। তখন মেয়েগুলো হয়ে যায় বেচারি।

সায়লি বলে, "তোকে একদিন ইভানের সঙ্গে পরিচয় করাবো। কবে যাবি বল।"

"পনেরো দিনের আগে সম্ভব হবে না। আমার অফিস থেকে কয়েকদিনের ছুটি পাওনা। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ব্যবহার করতে না পারলে নষ্ট হয়ে যাবে। আভাসের নতুন চাকরি। তাই ঠিক হয়েছে শনিবারে আমরা গোয়াতে যাব। একরাত্রি থাকব। গোয়া থেকে ফিরে আভাস আবার যেদিন বাড়ি যাবে সেদিন।"

সায়লির মহলের মেয়েগুলোকে আমার যতই খুব সুখী মনে হোক, আত্মবিশ্বাস নিয়ে তারা যতই ঘুরে বেড়াক, ছেলেদের যতই নাকানি-চোবানি খাওয়াক সত্যি কথা স্বীকার করতে অসুবিধে নেই যে সায়লির নতুন নতুন বয়ফ্রেন্ড-এ আমার

আগ্রহ কমে যাচ্ছে। সায়লির গল্প শুনতে আভাসও পছন্দ করে না। আভাস ভয় পায় বান্ধবীর কাছে আমি হয়ত বয়ফ্রেন্ড ধরা এবং ছাড়ার শিক্ষা নিয়ে ফেলব।

সে আমাকে জিজ্ঞেস করে, "আভাসের সঙ্গে তোর সম্পর্ক কতদূর গড়াল?"

"অনেকদূর। বলতে পারিস বিয়ে পর্যন্ত।"

"আমাকে না বলেই বিয়ে করে নিয়েছিস? মর তুই।"

"বিয়ে মানে কি? ওই একটা কাগজ সাইন করাই তো! হয়ে যাবে..."

"কবে?"

"যে কোন সময়ই হতে পারে।"

"একটা কথা জানার ছিল..." ইতস্তত করে সে।

"বল।"

"না থাক আজ। কিন্তু শোন বিয়ে করার আগে আমার সঙ্গে কিছু ব্যাপারে আলোচনা করে নিস।"

আভাসের কাছে আমার অভিযোগ, "তুমি আমায় কিছু দাও না।"

"দিয়েছি তো।"

"কি দিয়েছ?"

"জানো না?"

"না।"

আভাসকে সায়লির কথা বলি। আভাস বলে, "আমি তোমাকে যা দিয়েছি তা ওই ঘড়ির চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান।"

"মোটেও না।"

"ঠিক বলছ?"

ভাবি সত্যি ঠিক বলছি! কি পেলে বেশি খুশি হব? মানুষ যখন দেখে সে দুটো বিকল্পকে একসঙ্গে পেতে পারে না, সুতরাং তাকে দুটোর মধ্যে একটিকে বাছতে হবে তখন সে তার মনকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। করে বুঝতে পারে তার কোন জিনিসটা বেশি প্রয়োজন। কোন জিনিসটা ছাড়া তার জীবন চলবে কোন জিনিসটা ছাড়া চলবে না। চটজলদি আমি আমার ভুল সংশোধন করে নিই, "না ভুল বলেছি। তুমি আমাকে সত্যিই অনেক দামি জিনিস দিয়েছ..."

"ভালবাসা।"

"শুধু ভালবাসাই নয়। ভালবাসার সঙ্গে প্রতিশ্রুতি।"

"প্রতিশ্রুতি!"

"তুমি হলে মহান দাতা। দিয়ে ভুলে যাও। মনে আছে তুমি বলেছিলে আমাকে একবছরের মধ্যে রেজিস্ট্রি ম্যারেজ করবে? চলো, একটা এম ও ইউ বানিয়ে নিই।"

আভাস আমার চোখের দিকে স্থির তাকিয়ে থাকে।

"কি দেখছ অমনভাবে?"

"তোমার সঙ্গে আমার গুরুত্বপূর্ণ কথা আছে।"

"এতদিন পরে?"

"এখনই সেই সময় এসেছে।"

"তুমি কি তোমার প্রতিশ্রুতি থেকে সরে যেতে চাইছ?" আভাসের সামনে এসে একেবারে ওর গা ঘেঁষে দাঁড়াই। ওর টি-শার্টের কলারটা ডান মুঠোতে নিয়ে চোখ, ঠোঁট সংকুচিত করে ওর দিকে তাকিয়ে বলি, "ইফ ইউ চিট মী হানি, আই উইল কিল ইউ।"

"হে...হোয়াট আর ইউ ডুইং?"

"রিয়ালি, আই উইল কিল ইউ।"

"নেভার...আই উইল নেভার চিট। আমি এমনি তোমাকে কয়েকটা ঘটনার কথা বলব। জানি না তোমার কেমন লাগবে।"

"কেমন ঘটনা? ভাল না খারাপ?"

"বলতে পারব না। ভাল-খারাপের ঊর্ধ্বে।"

"আচ্ছা বলো, সেইসব ঘটনা আমাকে আনন্দ দেবে না কষ্ট দেবে?"

"সেটা তুমিই পরে বলতে পারবে। আমিও জানতে আগ্রহী। জানতে আগ্রহী যে সেইসব ঘটনা আমাকে যে অনুভব দিয়েছে, তোমাকেও সেই একই অনুভব দিচ্ছে কিনা।"

আমার সায়লির কথা মনে পড়ল। যদিও এম ও ইউ মানে বিয়ে নয়। কিন্তু তা আমার কাছে বিয়ের চাইতে কমও নয়। কালকে, সোমবারে আমার ছুটি, সায়লি ছুটি নেবে আমারই জন্য।

আভাসকে বললাম, "তোমার কথা আমি কাল রাতে শুনব।"

পরদিন আভাস অফিসে গেলে সায়লি এল, "আমি শিবের সঙ্গে মসুরি গিয়েছিলাম।"

বললাম, "জেনে কি করব?"

"জানি না তুই কি করবি। কিন্তু আমাকে বলতে দে।"

"শিবের সঙ্গে ব্রেক আপ-এর সিদ্ধান্ত কবে নিয়েছিস?"

"ওখানে গিয়েই।"

"একটু আগে নিলে খরচাটা বাঁচাতে পারতিস।"

"আরে না রে, টাকা গেছে যাক, কিন্তু মানুষটাকে চিনতে পেরেছি, নইলে বিয়ে করে অযথা ঝামেলায় ফেসে যেতাম।"

"কি এমন হয়েছে তোদের মধ্যে?"

"হোটেলের রুম থেকে বেরোতে চায় না। কোথাও ঘুরতে যেতে চায় না। পুনেতে হোটেলে থাকা এবং পুনের বাইরে অন্য কোথাও হোটেলে থাকার মধ্যে পার্থক্য আছে। শিব ভাবে জীবনটা একটা আরামের গদি। আমি ওখানে শুধু সেই গদীতে শোওয়ার জন্য যাইনি! ছেলেটা অন্য কিছু বোঝেই না। শুনতেই চায় না আমি কি চাই। দায়িত্বজ্ঞান বলতে কিচ্ছু নেই। যখন ব্যাঙ্গালোরে ট্রেনিং দিতে এসেছিল তখন ওকে কত আলাদা লেগেছিল। দায়িত্বজ্ঞানহীনতা বিষ্ণুর চরিত্রের সঙ্গে একেবারে মানিয়ে যায়। এমনকি সাইও অমন করলে আমি এত আঘাত পেতাম না। সাই ছেলেমানুষিতে ভরা। কিন্তু শিব..." মুখ দিয়ে চুক করে আওয়াজ করে হতাশায় নিজের থাই-এ জোরে একটা চাপড় মারে সায়লি।

আমার মনে পড়ে মসুরিতে গিয়ে আভাস বলেছিল, "এখন আমার স্যালারি বেড়েছে। ভাবছি মায়ের এবং আমার জয়েন্ট নামে ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে একটা ফ্ল্যাট কিনব।" শুনে আমিও অবাক। আমার অনেক কষ্টও হয়েছিল, আভাস আমার কথা ভাবল না! সায়লিকে বলতেই সে বলল, "আভাসের বলা উচিত ছিল ওর এবং তোর নামে ফ্ল্যাট কিনবে, যেহেতু ওর একটা ভাই আছে। তোদের ফ্ল্যাটে মায়ের থাকতে কোন বাধা নেই!"

সায়লি বলে, "শিবের সঙ্গে আমার একটু আর্গুমেন্ট হয়েছে।"

"কেন?"

"ওই ওটা নিয়েই। ঝগড়ার পরে ওর প্রতি আমার আকর্ষণ একেবারে কমে গেছে। ওরও হয়ত তাই-ই হয়ে থাকবে। তার মানে আমাদের ভালবাসার ভীত দুর্বল ছিল।"

আমার এবং আভাসের মধ্যেও ঝগড়া হয়েছিল, একই কারণে। কয়েক ঘণ্টা মুখ দেখাদেখি বন্ধ রেখেছিলাম, কিন্তু পরে আবার আমরা এক হয়ে গেছি। কেউ কাউকে ছেড়ে থাকার কথা ভাবতে পারিনি। তার মানে আমাদের ভালবাসার ভীত অতটা দুর্বল নয়। সায়লিকে বলতেই সে বলল, "এক দু'বারের ঝগড়ায় এমন সিদ্ধান্তে আসা যায় না।"

সায়লি বলে, "হোটেল রুমের বাইরে ঘুরতে যেতে চায় না বলে আমি রুমের মধ্যেই ওর সঙ্গে অন্য নানাভাবে সময় কাটানোর চেষ্টা করছিলাম।"

"যেমন?"

"লুডো খেলা, দাবা খেলা...কোন আগ্রহ নেই!"

ওসব পুরনো খেলা আজকাল চলে না। অনলাইন গেমস নিয়ে বসতে পারতিস।"

"ক্রস গেম, গ্যাং ক্ল্যাশ, ওয়ার্ড ওয়ার, টাউনশীপ সব ট্রাই করেছি। বলে আমি জানি। সাথই দেয় না! শেষে দেখতাম ও শুয়ে শুয়ে নেটফ্লিক্স-এ সিনেমা দেখছে ও আমি গল্পের বই পড়ছি।"

আভাস যখন নারুটো সিরিজ দেখে আমি গল্পের বই পড়ি। এমন হতেই পারে!

অস্বাভাবিক কিছু নয়! সায়লিকে বলতেই সে বলল, "মনে করে দেখ তুই ওকে একসঙ্গে বসে ভি ফর ভেন্ডেটা দেখতে বলেছিলি, বেবী দেখতে বলেছিলি, সে রাজি হয়নি। ভবিষ্যতে পছন্দের এমন অমিল আরও প্রকট হবে। ভাল লাগার কয়েকটা সাধারণ জায়গা থাকা দরকার। জীবনসঙ্গী হিসেবে শিব আমার একদমই উপযুক্ত নয়। দেখি ইভানকে নিয়ে লাস্ট ট্রাই মারব। লিভ টুগেদার করব ওর সঙ্গে। বেশির ভাগ দিনের বেলায়। কখনো কখনো রাতে...তোর বাড়িতে থাকার বাহানা দিয়ে।"

ডিনারের পর আভাস আমাকে বলল, "আমি তোমাকে একটা পরিবারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব।"

জিজ্ঞেস করি, "কোন পরিবার?"

"আছে একটা।"

"কোথায়?"

"পিম্পড়িতেই।"

"তুমি আমাকে কিছু বলতে চেয়েছিলে।"

"সেই পরিবার নিয়েই।"

"হানি, আজও তোমার ভেজা টাওয়েলটা বিছানায় পড়ে।"

"সরি।" টাওয়েল হাতে উঠিয়ে নিল আভাস। "আর কখনও হবে না। প্রমিস।"

নারকেলের ঝাড়ু দিয়ে বিছানা ঝাড়তে আমার ভ্রূ সংকুচিত হল, "তার সঙ্গে আমাদের বিয়ের কি সম্পর্ক?"

"হয়ত বিশেষ নেই।"

"বলো।"

"এখন ঘুমোও। কালকে।"

আভাস বলতে চায় না, আমিও ছাড়তে চাই না। "না বললে আমার ঘুম আসবে না।"

"সেই পরিবারকে গত আট বছরে আমি আরও ভাল করে জেনেছি। সেখানে এক ভাই এবং দুই বোন ছিল। মা-বাবা ছিলেন। ভাই বড় এবং দুই বোন ছোট। ছোট বোন, যখন তার বয়স ছিল তেরো বছর হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছে..."

"এত ছোট বয়সে হার্ট অ্যাটাক! কি যা তা বলছ!"

"যা তা বলছি না, সত্যি বলছি। এমন সচরাচর হয় না, কিন্তু মেয়েটির ক্ষেত্রে হয়েছিল। শুনলে আরেকবার অবাক হবে, তার বড় বোন মারা গেছে আঠারো বছর

চারমাস বয়সে...হার্ট অ্যাটাকেই...বড় বোন এবং ভাই একই কলেজে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ত...বোন ফার্স্ট ইয়ারে, ভাই থার্ড ইয়ারে। বাড়িতে দুটো শোবার ঘর...ছোট বোন মারা যাবার পর একটাতে মা-বাবা, অন্যটাতে দুটো তিন বাই ছয়-এর বিছানায় ভাই এবং বড় বোন...তখন রাত তিনটে বেজে দশ মিনিট...বোন হঠাৎ করে বিছানা থেকে উঠে এসে ভাইকে বলল বুকে ব্যথা হচ্ছে...ভাই ভেবেছিল...”

সায়েন্স ডেইলিতে আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশন-এর একটা রিসার্চ নিউজ পড়েছিলাম। ছাপা হয়েছিল ২০১৩ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারিতে। পরিণত কোন ভাই অথবা বোনের হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যু হলে বাকি ভাইবোনের মধ্যেও হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যুর সম্ভাবনা বেড়ে যায়। আমি ডাক্তার নই, সুতরাং মনে প্রশ্ন, আভাসের কথা সত্যি হলে ছোট বোনটি মাত্র তেরো বছরের ছিল। পরিণত বলতে আমরা আঠারো বছরের বুঝি।

“...বেঁচে ছিল ভাই মা এবং বাবা...”

“তুমি আরও কিছু বলছিলে আভাস, আমি অন্য কথা ভাবছিলাম। ভাই ভেবেছিল...কি ভেবেছিল ভাই? আবার বলো প্লীজ।”

“ভাই ভেবেছিল গ্যাস, অ্যাসিড হয়ে থাকবে। সে বোনকে জল খাইয়ে শুইয়ে দিল...তার মনে একবারের জন্যেও সন্দেহ উঁকি মারেনি...ঘুমিয়ে পড়েছিল সে। ভোরে ঘুম ভাঙতে দেখে বোন চেয়ারে বসে আছে। শ্বাস নিতে অসুবিধে হচ্ছে...মা-বাবাকে ডাকাডাকি করে হসপিটালে নিয়ে যেতে যেতেই শেষ।

“ইশ্।”

“ছোট মেয়েকে হারানোর পরেই ভদ্রমহিলার চোখের ঘুম উধাও হয়ে গিয়েছিল...ডাক্তার তাকে রোজ পয়েন্ট ফাইভ-এর ঘুমের বড়ি নিতে বলেছিলেন...বড় মেয়েকে হারানোর পরে বড়ির ডোজ পয়েন্ট ফাইভ থেকে বেড়ে...।”

“খুব ঘুম পাচ্ছে আভাস...”

সায়লি এসেছে। জিজ্ঞেস করছে, “কবে বিয়ে করছিস?”

“এখনও ঠিক করিনি।”

“আমরা যখন কারও ভালবাসার জালে পড়ি ও মা-বাবার বাড়িতে থেকে মাঝে মাঝে বাইরে দেখা করি, দু'য়েকদিনের জন্য বাইরে ঘুরতে যাই তখন তার বিরক্তিকর অভ্যেসগুলো যেমন তর্ক করা, ভেজা টাওয়েলটা বিছানায় ফেলে রাখা ইত্যাদিকে উপেক্ষা করি। সাইটা বড্ড তর্কবাগিশ ছিল।”

“সাই-এর সঙ্গে বেশিদিন রইলিই বা কোথায়?”

“তোকে বলিনি?”

“কি?”

"আমাকে মাঝখানে এক সপ্তাহের ট্রেনিং-এ ব্যাঙ্গালোরে যেতে হয়েছিল। সেখানে আমি সাই-এর সঙ্গে ছিলাম।"

ভাবি আভাস তর্ক করে না কিন্তু সায়লি জানে না বিছানায় ভেজা টাওয়েল ফেলে রাখার অভ্যেস তার আছে। এতদিন অসহনীয় মনে হয়নি। গতকাল সে আমাকে শেষবারের মত প্রমিসও করেছে আর ফেলে রাখবে না বলে। তবু আমার মনে হচ্ছে সে প্রমিস রাখতে পারবে না। ঘুমের মধ্যেও আমার অস্বস্তি হচ্ছে। তাহলে কি সায়লিই ঠিকই বলেছে!

"তুই এটা ভেবে নিশ্চিন্ত হলে ভুল করবি তার আজীবন সেই একটিই বদভ্যাস থাকবে। বিয়ের পরেও যে কোন সময় সে অন্য বদভ্যাস তৈরি করতে পারে। যদি এমন হয় তোর বোঝা আরও বেড়ে যাবে।"

আভাসের ভেজা টাওয়েলের ব্যাপারটাই আমাকে এখন অস্থির করছে, ঘুমতে দিচ্ছে না। "আরও বদভ্যাস বলতে?"

"যেমন অফিস থেকে ফিরে শার্ট-প্যান্টটা মেঝেতে ফেলে রাখা। উইকেন্ড-এ ওয়াশিং মেশিন চালানো ওর কাজ, কিন্তু দেখবি সে ভিডিও-গেম নিয়ে বসে আছে, আসছি করছি বলে করছে না, শেষে তোকেই পিঠের ব্যথা নিয়ে যেতে হচ্ছে ওয়াশরুমে।"

"আছে আছে, প্যান্ট-শার্টের ব্যাপারে আভাস একেবারে ডিসিপ্লিনড। কিন্তু সে বাচ্চাদের মত ভিডিও-গেম নিয়ে ব্যস্ত থাকে। বেশিরভাগ দিন ওয়াশিং মেশিন আমাকেই চালাতে হয়। বলে বলে হয়রান গেছি। তুই যে বদভ্যাস-এর কথা বলছিস তার অনেকগুলোই অদ্ভুতভাবে আভাসের ক্ষেত্রে ম্যাচ হয়ে যাচ্ছে। ছোটখাট ভুল বোঝাবুঝি মেনে নেওয়া যায়, ওয়াশিং মেশিন-এর ব্যাপারটাও না হয় মেনে নিলাম, কিন্তু ভেজা টাওয়েল! দাঁড়া দেখি আভাস কোথায়। এই মুহূর্তে টাওয়েল আমার একপাশটা একেবারে ভিজিয়ে দিয়েছে। আভাস, আভাস কোথায় তুমি? আভাস...।"

আভাসকে ডাকছি, মানে ডাকতে চাইছি, কিন্তু মুখ দিয়ে কোন আওয়াজ বেরোচ্ছে না। চোখ বন্ধ, নয়ত পিটপিট করছে চোখ। অবচেতন মন বলছে চোখ পুরো না খুললে আমার মুখ দিয়ে আওয়াজ বেরোবে না। তাই প্রাণপণ চেষ্টা করছি চোখ উন্মীলিত করার। চোখের পেশির সঙ্গে অনেক ধস্তাধস্তির পরে অবশেষে চোখ খুলল। "আমি ভিজে গেছি আভাস," নিচে চাপা পড়ে থাকা টাওয়েলটা টেনে বের করি। "উফফ্।"

দেখলাম আভাস চিৎ হয়ে শুয়ে। ঘরের সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে। সেখানে আকাশ আছে, চাঁদ, তারা, গ্রহ, ধুমকেতু আছে। অন্ধকার রাত। দেখে মনে হয় না আমার ঘরের সিলিং-এ আকাশটা কৃত্রিম। বরং মনে হয় তা বহু দূরের বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত শূণ্য অংশ যার মধ্যে বিচরণ করছে বাঙালি বধূর কপালে পরিয়ে দেওয়া ছোট

সিঁদুরের টিপের মত অথবা মোমবাতির ছোট আগুনের শিখার মত বস্তুত বিশালকার গ্রহ এবং তারকা।

চোখ খোলা রেখে আভাস তার মনকে পাঠিয়ে দিয়েছে সেই দূরেই, বহু দূরে। কিছু ভাবছে সে, অথবা মনকে খালি করে দিয়ে সমস্ত ভাবনা থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়েছে।

আভাস এবার সরি বলল না। প্রথমবার এই ভুলের জন্য কোন দুঃখ প্রকাশ করল না সে।

"কি হল তোমার? ঘুমোওনি এখনো?"

"আসছে না ঘুম। চাপে আছি। অনেকদিন পরে এমন হল।

"কেন?"

"তুমি জোর করে শুনতে চেয়ে ঘুমিয়ে পড়লে..."

আমিই তাকে সরি বললাম। "তুমি মহিলাটির ঘুমের সমস্যার কথা বলছিলে। এখন উনি ঘুমতে পারছেন?"

"হ্যাঁ...স্লিপিং পিল ছাড়াই।"

"কাল বিকেলে ডিউটির পরে আমরা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাব। তুমি হয়ত জানো না মা ঘুমের বড়ি নিয়ে ঘুমতে যান। আমি আগে তাঁকে নিতে বারণ করতাম। উনি তাঁর এক বান্ধবীর কাছ থেকে পরামর্শ নিয়েছেন। বান্ধবীও ঘুমের বড়ি নেন। পয়েন্ট ফাইভ-এর। তাকে নাকি ডাক্তার বলেছেন না ঘুমিয়ে অসুস্থ হওয়ার চেয়ে বড়ি নিয়ে ঘুমনো ভাল। তারপর থেকে কিছু বলি না।"

"ওকে।"

"এখন আমাদেরও ঘুমনো দরকার। সকাল সাড়ে চারটেয় আমাকে উঠতে হবে।"

"গল্প এখনও শেষ হয়নি।"

"শেষ হয়নি! উনি ভাল আছেন তো?"

"তুমি কি জানতে চাইছ বেঁচে আছেন কিনা?"

"ঠিক তাই। কিন্তু ওভাবে জিজ্ঞেস করতে পারছিলাম না।"

"বেঁচে আছেন কিন্তু সুস্থ নেই।"

"উনি তোমার কে হন?"

"খুব কাছের লোক। তাঁকে নিয়ে আমি শুধু ভাবিই না, তাঁর জন্য আমি কাঁদি। নিঃশব্দে, তাই তুমি বুঝতে পারো না। সবথেকে বেশি কষ্ট কখন হয় জানো? যখন ভাবি উনি নিজেই জানেন না উনি সুস্থ নেই।"

"উনি তোমার কে আভাস? ঠিক করে বলো।"

"মা।"

"আভাস! তার মানে তুমি যে বলেছিলে তোমার মায়ের গলব্লাডারে স্টোন

হয়েছে...সেটা মিথ্যে কথা?"

"মায়ের গলব্লাডারে স্টোন হয়নি রিলি...মায়ের..."

"ক্যানসার? তাহলে এতদিন ধরে উনি এত সাবলীলভাবে কিভাবে চলাফেরা করছেন?"

"তুমি আমাদের বাড়িতে যাঁকে দেখেছ উনি আমার মা নন।"

"কোথায় আছেন তোমার মা?"

"বাড়িতেই। শোবার ঘরে।"

"ও মাই গড! তোমার বোনকে আমি দেখেছি...চাক্ষুষ না হলেও ফটোতে...কিন্তু তোমার তো একটাই বোন..."

"আমার দুটো বোন ছিল। তোমাকে আগে যে সময়ের গল্প বলেছিলাম তার দুই বছর দু'মাস পরে আমার আরেকটি বোনের জন্ম হয়েছিল।"

"আমি যেই মহিলাকে দেখেছি উনি কে?"

"কাজের মাসি। দিনরাত আমাদের বাড়িতেই থাকে। তোমাকে মিথ্যে বলেছিলাম। কাল মাকে দেখাতেই আমি তোমায় আমাদের বাড়িতে নিয়ে যাব।"

"কি ভয়ংকর জীবন তোমার হানি!"

শোনা কথা হিসেবে আভাসের বড় বোন যখন মারা যায় তখন আভাসের বয়স ছিল পাক্কা একুশ বছর, আজ থেকে ছয় বছর তিনমাস আগে। সে আমার থেকে নয়মাস আগে জন্মেছে। আমার বয়স ছাব্বিশ পেরিয়ে একমাস হয়েছে। দু'মাস বাদে আভাস সাতাশ বছর পূর্ণ করবে।

"তোমার মা-বাবার মত আমার মা-বাবাও ভালবেসে বিয়ে করেছিলেন। তাই মা এবং বাবার বাড়ির সবাই মা-বাবার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ছেদ করেন। সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় আমার বড় বোনের মৃত্যুর পর। আমি এবং বাবা সর্বদা মায়ের খেয়াল রাখতাম। মাকে নিয়ে বাইরে খেতে যেতাম, আত্মীয়রাও নিয়মিত আমাদের বাড়ি আসত। তিন বছর আগে..." হঠাৎ সচেতন হয়ে যায় আভাস। "বারোটা বেজে গেছে তাই না?"

"এখন সাড়ে বারোটা বাজে।"

"তাহলে ঠিক এই দিনই সন্ধেবেলায় বাবা, মা এবং আমি কাছেই এক পিসির বাড়ির উদ্দেশ্যে বেরিয়েছি। হেঁটেই যাওয়া যাবে। বিল্ডিং-এর নিচে গিয়ে মা অজ্ঞান হয়ে গেলেন। বাবা পালস চেক করতে গিয়ে দেখলেন পালস বন্ধ। নাকের কাছে হাত দিয়ে দেখলেন শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ। বাবা বললেন, মনে হচ্ছে কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট। পিসিকে সঙ্গে সঙ্গে ফোন করলাম। পিসি এবং পিসেমশায় গাড়ি নিয়ে ছুটে এলেন। ইতিমধ্যে বাবা তাঁর একজন হার্ট স্পেশালিস্ট বন্ধু, অরুণ কাকুকে ফোন করেছেন।

উনি ইনল্যান্স হসপিটালে ডিউটিতেই ছিলেন। মাকে সেখানে নিয়ে গেলাম। ডাক্তারেরও একই কথা, সাডেন কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট...”

আভাস গল্প বলছে, আমি মনের গুপ্ত আয়নায় সেই মহিলাকে দেখছি। উনি মরার মত পড়ে আছেন। শরীরের কোন অংশে কোন স্পন্দন নেই।

“ডাক্তার তাকে একবার ডিফিব্রিলেশন দিলেন।”

জানতে চাই,“ডিফিব্রিলেশন মানে?”

“ইলেকট্রিক শক।”

আভাসের বাবা নিজে ডাক্তার হলেও মাকে নিয়ে এখন সম্পূর্ণ দিশেহারা। একজন সাধারণ অভিভাবকের মত অসহায়চিত্তে চিকিৎসকের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছেন। মনে এক আকাশ আশা। আভাস স্থির দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। পা-গুলো ভীষণ কাঁপছে। হসপিটালে আভাসের এক মামা যিনি একজন হোমিওপ্যাথ ডাক্তার পৌঁছে গেছেন। তিনিও বোনের অচেতন শরীরটার দিকে তাকিয়ে আছেন। ডাক্তার বলেছেন অনেক পেশেন্ট-এর একটি শকেই হার্ট আবার স্বাভাবিক গতিতে চলতে শুরু করে। কিন্তু তিনটে ডিফিব্রিলেশনেও মা কোন সাড়া দিলেন না। তিরিশ মিনিট পেরিয়ে গেল। হার্ট চলল না। ডাক্তার বললেন, ব্রেন ডেড।

আভাস কান্নায় ফেটে পড়েছে। ট্রিটমেন্ট-রুম থেকে বেরিয়ে এসে আত্মীয়স্বজনকে জানাতে শুরু করেছে। এদিকে ট্রিটমেন্ট-রুমে আভাসের মামা অরুণ কাকুকে বলছেন, “আপনি ডেড বলেই দিয়েছেন, এর চেয়ে অধিকতর খারাপ কিছু হওয়ার নেই। আমি দুটো হোমিওপ্যাথ ওষুধ সঙ্গে নিয়ে এসেছি। সেগুলো তার মুখে ঢেলে দিতে চাই। প্লীজ।”

“দিন। তাতে আপত্তির কি থাকতে পারে!”

ওষুধ খাইয়ে মামা বললেন,“আরেকবার শক দিন ডাক্তার।”

“লাভ হবে না। প্রত্যেক ডিফিব্রিলেশনেরপরে বাঁচার সম্ভাবনা আরও কমে যায়।”

“তবু দিন প্লীজ।”

চতুর্থ বারেও মা কোন সাড়া দিলেন না। মামা অরুণ কাকুকে বললেন, “আরেকবার।”

আরেকবার শক দেওয়া হল। লাভ হল না।

আভাস বলে,“ডাক্তার ডেথ সার্টিফিকেট তৈরি করে ফেললেন।”

“এত তাড়াতাড়ি। আমি শুনেছি...”

“ডেথ সার্টিফিকেটটা আমি নিজের চোখে দেখেছি রিলি। বাবা এতক্ষণ পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ডেথ সার্টিফিকেট হাতে নিয়ে বললেন,“অরুণ আরেকটা

শক... অরুণ প্লীজ। প্লীজ...”

এ যেন এক ভেলকি। মামার ওষুধের জোরে নাকি ইলেকট্রিক শকের জোরে বোঝা গেল না, আভাসের মায়ের হৃৎপিণ্ড চলতে শুরু করল। ডাক্তার তাঁর সিটি স্ক্যান, এক্স রে, এম আর আই করলেন। হৃৎপিণ্ড চলতে শুরু করলেও বাঁচার সম্ভাবনা কমই ছিল। তাঁকে ইন্টেনসিভ কেয়ার ইউনিট-এ রাখা হল। মুখে ভেন্টিলেটর। ইন্টেনসিভ কেয়ার ইউনিট-এ উনি পনেরো দিন রইলেন। তারপর তাঁকে প্রাইভেট রুমে শিফট করা হল। সেখানে আত্মীয়দের মধ্যে থেকে কেউ না কেউ তাঁর কাছে থাকছে। হৃৎপিণ্ড চললেও তেইশ দিন মায়ের কোন জ্ঞান ছিল না। চব্বিশতম দিনে জ্ঞান ফিরে আসতেই উনি হাসলেন।”

অবাক হলাম। “এত কষ্টের মধ্যেও হাসি!”

“একমাস সাতদিনের মাথায় মাকে বাড়িতে নিয়ে আসা হল। ট্র্যাকিওস্টোমি টিউব এবং ফুড-পাইপসহ। মা কথা বলতে শুরু করলেন। সব অসংলগ্ন কথা। কয়েকদিনেই স্পষ্ট হয়ে গেল উনি সামান্য কয়েকটি জিনিস ছাড়া পঁয়তাল্লিশ বছরের সমস্ত স্মৃতিকে হারিয়ে একটা পাঁচ বছরের শিশুর মত হয়ে গেছেন।”

“বড়ই দুঃখের কথা।”

আভাস বলল,“একদিকে ভালই হয়েছে। তাঁর যে দুটো মেয়ে ছিল তাদের কথাও মা মনে রাখলেন না। কন্যাশোক থকে মুক্তি পেয়ে গেলেন।”

“মা তোমাকে চেনেন না?”

“না।”

“তোমার বাবাকে?”

“না রিলি। উনি শুধু নিজের নাম জানেন, তাঁর মা-বাবার নাম জানেন।” একটু সময় চুপ থেকে আভাস বলে,“মায়ের বা বাবার পরিবারে এখনও পর্যন্ত আর কারও ওই রোগটা হয়নি জানো? তুমি হয়ত ভাবছ আমারও... তাই বললাম, আমার হার্ট খুব স্ট্রং। তা না হলে এত স্বাভাবিকভাবে তোমার সঙ্গে মিশতে পারতাম না। আমাকে দেখে কেউই বুঝতে পারে না। আমার তোমাকে খুব প্রয়োজন... তাহলে দেখবে আমি অনেকদিন বাঁচব।”

আভাস আমাকে এমন বলছে, তাঁর মানে সেও সেই খবর রেখেছে।

“তুমি নব্বই বছর বাঁচবে।”

“ভাই-বোন মারা যাওয়ার পরে আঠারো বছর পর্যন্ত রিস্ক থাকে...। একটা রিসার্চ নিউজে পড়েছিলাম।”

“অনুমান করেছি।”

“হ্যাঁ, এই ঝুঁকি মেয়েদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে বেশি, পঁচিশ শতাংশ, ছেলেদের

মধ্যে পনেরো শতাংশ। মারা যাওয়ার দুই থেকে সাড়ে ছয় বছরের সময়টা মেয়েদের ক্ষেত্রে বেশি রিস্কি। ছেলেদের ক্ষেত্রে চার থেকে সাড়ে ছয় বছরের সময়টা...”

“তুমি সেই সময় পেরিয়ে এসেছ।”

“পূর্বা...আশ্চর্য দুই বোনের মৃত্যু মেনে নিল, অথচ মায়ের এই অবস্থাটা মেনে নিতে পারল না। মা অসুস্থ হওয়ার একমাসের মধ্যেই কেটে পড়ল। এম ও ইউ-এর আগে আমার মনে হয়েছে তোমাকে সব জানানো দরকার।”

“তোমার মা এখন চলাফেরা করছেন?”

“করলে তুমি যখন আমাদের বাড়িতে গিয়েছিলে, বসার ঘরে দেখতে পেতে। পাঁচমাস মা শুয়ে রইলেন। তাঁকে ফুড-পাইপ দিয়েই খাওয়ানো হত। পাঁচমাস বাদে উনি মুখ দিয়ে খাওয়া শিখলেন। প্রথমে আমরা তরল খাবার দিতাম। পরে ধীরে ধীরে শক্ত খাবার দিতে শুরু করলাম। সাতমাস পরে ট্রাকিওস্টোমিও বের করে দেওয়া হল। বসতে শেখানো হল। হুইল চেয়ারে বিল্ডিং-এর নিচে নিয়ে গিয়ে চারপাশের জায়গাগুলো চেনানোর চেষ্টা করা হল। কিন্তু তিনি কিছুই মনে করতে পারলেন না। মায়ের পেছনে সময় দিতে গিয়ে ক্লিনিকে বাবার উপস্থিতি আরও অনিয়মিত হল, উপার্জন আরও কমে গেল। জমানো টাকা ভেঙ্গে সংসার চলতে লাগল। জমানো টাকা দিয়েই বাবা একটা গাড়ি কিনলেন। গাড়ি করেও মাকে অনেক ঘোরানো হল। বাড়িতে অনেক সিনেমা দেখানো হল। তবু তাঁর মধ্যে কোন পরিবর্তন এল না।”

আভাসের স্কুল ফাইনালের পরের বছরগুলো বড় কষ্টের। ইঞ্জিনিয়ারিং-এ আমার একাগ্রতার অভাবে রেজাল্ট ভাল হয়নি। সেকেন্ড ডিভিশনে পাশ করেছি। এদিকে আভাস পরিবারের ভয়ানক সঙ্কটকালে প্রস্তুতির সুযোগ না পেয়েও ফার্স্ট ক্লাস হাসিল করেছে। ছেলেটি বুদ্ধিমান। আমি বুঝি না কোন জিনিসটা মানুষকে বেশি কষ্ট দেয়। নিকটজনের মৃত্যু নাকি তার জীবনমৃত হয়ে বেঁচে থাকা।

ডিউটির পরে আভাসের গাড়িতে বসে ওর বাড়িতে যেতে যেতে অনেক কথাই ভাবছিলাম। আভাসের জন্য মা কম্প্রোমাইজ করেছেন। ম্যারেজ সার্টিফিকেট না পেয়ে খালি হাতে সোসাইটির সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন। আমিও আভাসের সঙ্গে কম্প্রোমাইজ করছি। এখন সম্পর্কটা অনেকখানি ওর ছাঁচে পড়ে চলছে, আমি ওকে বিয়ে করে ওর সঙ্গে থাকতে চাইছি কিন্তু সে রাজি হচ্ছে না। এমনিতেই ওকে তন-মন দিয়ে চলেছি। সত্যি কথাটা হল আভাসের সঙ্গে আমি কোন এম ও ইউ-এ যেতে চাইনি। ওর কাছ থেকে আমি একটা স্টেটমেন্ট চাইছিলাম যেখানে লেখা থাকবে আগামী এক বছরের মধ্যে আমি তৈরী থাকলে আভাস আমাকে বিয়ে করতে বাধ্য হবে কিন্তু আমি কোন কারণবশত পিছিয়ে গেলে সে আমাকে বিয়েতে বাধ্য করতে

পারবে না। আমি অনেক মানিয়ে নিয়েছি, এবার ওর মানিয়ে নেওয়ার পালা।

*****

যদিও কোনদিন মহিলাটির চেহারার সঙ্গে আভাসের চেহারার কোন মিল খুঁজে পাইনি তবু বিশ্বাস হতে চায় না ইনি আভাসের মা নন। তাই যে সম্মান আমি তাঁকে প্রথম দিন থেকে দিয়ে এসেছি সেই সম্মান ফিরিয়ে নিতে পারি না। এবারেরটা নিয়ে আমার এ বাড়িতে চতুর্থ বার আসা। মহিলা দরজা খুলে আমাকে দেখে একটু হাসলেন,"অফিস থেকে সোজা এসেছ বুঝি? কি খাবে বলো।"

"কিছু না।"

আভাস দেরি না করে আমাকে বেডরুমে নিয়ে গেল। সেখানে আরেকজন মহিলা। ফর্সা, শীর্ণকায় চেহারা, লম্বাটে মুখ। চুল একদম ছোট করে কাটা, জওয়ানদের মত। চার বাই ছয় ফুটের তোষক, বেডশীটসহ একটা লোহার খাট। খাটের চারপাশে রেল। রেল ধরে ডান পাশ ফিরে তিনি শুয়ে আছেন। পরিধানে নাইটি। তাঁর পাশে একটা কাঠের চেয়ার-টেবিল। চেয়ারে বসে বাবা পেপার ওয়ার্ক করছেন। সঙ্গে মহিলাটিরও খেয়ালও রাখছেন। এই মহিলাটিই আভাসের মা। এবার আমি আভাসের মিথ্যের ছিদ্র অতিক্রম করে সত্যের খাঁচায় ঢুকে পড়েছি। বেডরুমটাকে আমার রুম মনে হচ্ছে না। খাঁচা মনে হচ্ছে। মহিলার বিছানাটাকে খাঁচার কক্ষ। কান এবং চোখ আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের দুই ইন্দ্রিয়। শ্রবণযোগ্য অনেক কিছু যেমন মেঘের তর্জন-গর্জন, গান ইত্যাদিকে কান দ্বারা আমরা সঠিকভাবে অনুধাবন করি। তার জন্য চোখের অংশগ্রহণের কোন দরকার পড়ে না। দৃশ্যমান অনেক কিছু যেমন কোন ব্যক্তি, বস্তু, স্থান-এর সৌন্দর্যকে আমরা কেবলমাত্র চোখ দিয়ে সঠিকভাবে অনুধাবন করি। তার জন্য কানের অংশগ্রহণের কোন দরকার পড়ে না। কিন্তু কোন গল্প, কোন ঘটনার জ্ঞানপ্রাপ্তিতে কান এবং চোখের যৌথ অবদান প্রয়োজন। গতকাল আভাসের মায়ের পরিণতির কথা শুনে আমি ভীষণ আহত হয়েছিলাম। রাতে তারপর দু'চোখের পাতা এক করতে পারিনি। আজ স্বচক্ষে তাঁকে দেখে নিদারুণ কষ্ট পেলাম। কি জানি তাঁর এই চেহারা আমার আরও কত রাতের ঘুম কেড়ে নেবে।

কাজের মাসি আমাদের পেছন পেছন এসেছেন,"কে এসেছে বলোতো।"

উনি আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। পরক্ষণেই চোখ দুটোকে কুঁচকে দিলেন, "কে?"

আভাস জিজ্ঞেস করে, "আমি কে?"

"আভাস।"

"আভাস কে?"

"কেউ না।"

বাবা উঠে অন্য রুমে গেলেন। ভদ্রলোক আগে কেমন ছিলেন জানি না। এখন উনি আমার বিচারে লাজুক অথবা অন্তর্মুখী এবং শান্ত। বাবার জন্যেও আমার অনেক কষ্ট হল। মনে পড়ল উনি ছেলেকে বলেছিলেন কোন মেয়ের হৃদয় না ভাঙ্গতে। ছেলে আমাকে তা বললে আমি মজা করে তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম,"হৃদয় কেমন করে ভাঙ্গে ? হাতুড়ি দিয়ে?"

"তুমি জানো না?"

"না।"

আভাস আমার কথা বিশ্বাস করে নিয়েছিল। বলেছিল,"হৃদয় ভাঙ্গার অর্থ হল ভালবাসার অনুভূতিকে ক্ষতবিক্ষত করা।" ওর ব্যাখ্যা শুনে আমি আরও অবুঝ হয়ে গিয়েছিলাম,"মানুষের ভালবাসা হৃদয়ে থাকে বুঝি?"

"ঠিক তা নয়। ভালবাসা হল এক প্রকারের আবেগ। আবেগ ব্রেন-এ তৈরি হয়। আবেগ বা ইমোশনকে দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে, পজিটিভ এবং নেগেটিভ। আনন্দ, সুখ, ভালবাসা, আগ্রহ, কৌতূহল, উত্তেজনা, কৃতজ্ঞতা, তৃপ্তি হল পজিটিভ ইমোশন। রাগ, হিংসে, দুঃখ, একাকীত্ব, আত্মসমালোচনা, ভয়, প্রত্যাখ্যান ইত্যাদি নেগেটিভ ইমোশন..."

মজা দিয়েই মজা শেষ হতে পারত এবং মজা গম্ভীর আলোচনার মোড় নেওয়ায় ছেলেটি কেমন রে বাবা, কোন মজাও বোঝে না ভেবে আমার মধ্যে হতাশা তৈরি হতে পারত, কিন্তু তা না হয়ে প্রত্যেকটা জিনিস নিয়ে তার গভীর অনুভব আমাকে অভিভূত করেছিল।

"২০১৪ সালে ফিনল্যান্ডের আলটো ইউনিভার্সিটির রিসার্চ টিম হিট ম্যাপের সাহায্যে মানুষের তেরোটি ইমোশন তার শরীরের কোন অংশগুলোকে সক্রিয় করে তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সেখানে উনি বলেছেন ভালবাসার অনুভূতি সারা শরীর জুড়ে হয়, অবশ্য পায়ে তুলনামূলকভাবে কম। আমাদের ভালবাসা ঘা খেলে আমরা দুঃখ পাই। দুঃখ অনুভব করি মাথায় এবং বুকে। বুক মানে হৃদয়। তাই বাবা বলেছেন।"

"তুমি বললে ভালবাসা ঘা খেলে আমরা মাথাতেও দুঃখ অনুভব করি। তাহলে তখন মাথা না ভেঙ্গে শুধু হৃদয় কেন ভাঙ্গে?"

"মাথাও ভাঙ্গে, তবে সবার নয়, কারও কারও। যেমন তোমার ভেঙ্গেছে। সন্দীপ তোমার মাথাটাকেও টুকরো করে দিয়েছে। তাই পাগলামি করছ।"

শীর্ণ অবুঝ মহিলাটিকে দেখে আমার চোখের সামনে আরেকবার সেই মধ্যবিত্ত পরিবারের চিত্র ভেসে উঠেছে যেই চিত্র প্রথম দিন আমি এই বাড়িতে পা রেখেই দেখেছিলাম। সেই চিত্র আজ আরও স্পষ্ট। সঙ্গে আজ আমি আরেকটা নতুন চিত্র দেখছি। একটা তেইশ চব্বিশ বছরের যুবক একটা কুড়ি একুশ বছরের যুবতীকে

বলছে,''আমি তোমাকে ভালবাসি।'' সেই যুবকটি দেখতে কেমন ছিল, যুবতীটিই বা কেমন ছিল আমি একটু একটু অনুমান করতে পারি। কিন্তু কোথায় তাদের পরিচয় হয়েছে, কোথায় থাকত তারা আমি জানি না। কেননা সেসব কথা আভাস আমায় বলেনি। আমি কয়েকটি জায়গা কল্পনা করে নিয়েছি। কোন একটা গলিতে একটা বাড়ির আড়ালে, অথবা গাছের নিচে, অথবা একটা জল-কাদায় ভরা বড় গর্তের ওই পাশটাতে যেই পাশে ঝোপঝাড় আছে। আজ থেকে আনুমানিক তিরিশ বছর আগে। তখন এই এলাকার রূপ তেমনই ছিল যেমন আমি ভাবছি। এখন সেই গর্ত বুজে গেছে। সেই জায়গায় অট্টালিকা তৈরি হয়েছে। বাবা মায়ের হৃদয়ের সঙ্গে নিজের হৃদয় লাগিয়ে ফেলেছিলেন। এখন মায়ের স্মৃতি তাকে সরিয়ে দিয়েছে, তাঁর হৃদয় তাঁকে বাইরে বের করে দিয়েছে। মা এসব জানেন না। না জানলে কি হবে! আছে তো বাবার হৃদয় বাইরেই। বাইরে বেরোনো ভাঙ্গা হৃদয় নিয়ে তিনি ছেলেকে অমূল্য উপদেশ দিয়েছেন যাতে ছেলে তার ভালবাসার হৃদয়ের ঠিকঠিক খেয়াল রাখে।

শীর্ণ মহিলাটির দিকে আমি তাকিয়েই আছি। আভাস বলেছিল, তার স্কুল টিচারদের খুব ভাল লাগে, সমাজসেবিকাদের খুব ভাল লাগে, গৃহবধূদের খুব ভাল লাগে। ভাল সবাই কিন্তু আভাসের তাদের খুব ভাল লাগার পেছনে আরও একটি কারণ ছিল, সে সবার মধ্যে একজন মাকে দেখেছিল। এই শীর্ণ অবুঝ মহিলাটিকেও সে মনেপ্রাণে ভালবাসে। ইনিও একজন মা। এঁর অবুঝ চোখে এখনও সে অপরিমেয় স্নেহ, মায়া, মমতা, ত্যাগ, ভালবাসা এবং পরিশ্রম দেখতে পায়।

কাজের মাসি মাকে জিজ্ঞেস করেন,''চা খাবেন?''

''হ্যাঁ হ্যাঁ, চা খাব।''

মাসি আমাকে বলেন,''চা না দিলে রাতের খাবার খান না।''

আভাস বলে,''মায়ের কোন অপারেশন হয়নি, আমি সেদিন মাকে স্টেম সেল থেরাপির জন্য হসপিটালে নিয়ে গিয়েছিলাম। মোট পাঁচটা থেরাপি দেওয়া হয়েছে। এক একটা সিটিং-এর জন্য এক লাখ টাকা। সব জলে গেল। যাকগে, বাবার ওটাই সান্ত্বনা যে উনি তাঁর দিক থেকে কোন ত্রুটি রাখেননি।''

''শুধু বাবার সান্ত্বনা! তোমার নয়?''

''আমারও। আমাকে চিনতে না পারুন, আমরা চেয়েছিলাম উনি অন্ততপক্ষে বসতে শিখুন, বাড়িতেই একা একা চলাফেরা করতে শিখুন, পরনির্ভরশীল না হয়ে নিজের কাজগুলো যেমন স্নান, খাওয়া, টয়লেট যাওয়া ইত্যাদি...তিনটে সিটিং-এর পরে একটু উন্নতি লক্ষ্য করছিলাম...।''

কাজের মাসি নেই, চা বানাতে গেছেন। তবু আভাসের গলার স্বর নিচু,''মেনোপজ

মাঝখানে এসে পড়ায় সব গেল। দেড় মাস ধরে অনেক ব্লাড গেছে, হিমোগ্লোবিনের লেভেল টু পয়েন্ট ফাইভ-এ নেমে এসেছিল, এখন একটু বেড়েছে।"

আভাস মাকে জিজ্ঞেস করে,"আমি এই মেয়েটিকে বিয়ে করব?"

মা হাসেন,"হ্যাঁ।"

*****

'ডব্লু এন এস'-এ পাশ করলাম। পরীক্ষা দিয়ে মনে হয়েছিল নব্বই শতাংশ নম্বর পাব। অনলাইন-এ আমাকে সার্টিফিকেট পাঠানো হল। কিন্তু তাতে নম্বরের কোন উল্লেখ নেই, শুধু লেখা আছে পাশ। গোয়া থেকে ফিরেই জ্ঞানের সামান্য পুঁজি নিয়ে আভাসের কম্পানিতেই আবেদন করলাম। আশাতীতভাবে তিনদিনের মধ্যে ইন্টারভিউ হল। স্পটেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পেলাম। জুন-এ জয়েন করব। একমাস মুখ বন্ধ রেখে কাজ করে প্যানাসিয়াতে রেজিগনেশন লেটার দেব। আভাসকে বললাম,"আমাকে লিনক্সটা শিখিয়ে দাও।"

সায়লি অফিসে ডিজাইনিং-এর কাজ করে। ডিজাইনিং করতে করতে সায়লি নিজের জন্য একটা আদর্শ হাজব্যান্ড-এর কল্পনা করে ফেলেছে। সে সেইসব গুণাবলীতে ভরা থাকবে যেসব সায়লি তার মধ্যে আশা করে।

শনিবারে সে ফোন করে বলে,"বিয়ের আগে সব বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে সবরকম অভিজ্ঞতার লম্বা লিস্ট তৈরি করতে হবে। তা থেকে স্পষ্ট হবে তার সঙ্গে দীর্ঘদিন একই ছাদের নিচে কাটানো সম্ভব হবে কিনা।"

"সাব্বাস, আজই আমার বাড়িতে চলে আয়।"

"আভাস গেছে?"

"হ্যাঁ।"

আভাসকে আমি যেতে দিইনি। দুর্বুদ্ধির শিকার হয়ে আভাসের সঙ্গে সায়লির পরিচয় করিয়ে দিতে চেয়েছিলাম। আভাস এখন আমার পেছনে,"এম ও ইউ নিয়ে কিছু বলছ না যে?"

আমি বুঝে গেছি তুমি আমাকে ছেড়ে থাকতে পারবে না। "এম ও ইউ-এর দরকার নেই। সোজা বিয়ে করব।"

"কবে?"

"হানি, এত তাড়াহুড়োর কি আছে!"

"তোমার তাড়াহুড়ো না থাকলেও আমার আছে। শুনলে না মা হ্যাঁ বলে দিয়েছেন?

"শুনেছি।"

"তবে?"

"আগে জয়েন করি। তোমার আরেকটা সুইচ হোক।"

"কেন?"

"মাকে বলেছি বিয়ের পর আমরা আমাদের নতুন বাড়িতে থাকব। আগে আমাদের বাড়ি কিনতে হবে হানি।"

"এই বাড়িতে থাকার প্রয়োজনই বা কি? আমাদের বাড়িতে যাবে।"

প্রথম শিফট করে সন্ধে ছ'টায় বাড়ি ফিরলাম। স্নান করে ফ্রেশ হতেই সায়লি এল। আভাসকে দেখে সে খুব অপ্রস্তুত। বললাম,"কতদিন পালিয়ে পালিয়ে থাকতে পারবি? সেই পরিচয়ের পর থেকে আমার চেতনায়, স্বপ্নে সব জায়গায় আমি একেই দেখছি। চোখ খুলেও একে দেখছি, চোখ বন্ধ করেও একে দেখছি। সব দোষগুণকে সঙ্গে নিয়েই দেখছি। তাই আজ মনে হলে, তোকেও দেখিয়ে দিই।"

সায়লি আমরা সাদা স্টুলটা নিজের জন্য টেনে নিল। আভাস খাটে বসে। "কনগ্র্যাচুলেশনস," আভাসের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল সে। আমি আভাসের পাশে ধপাস করে বসেই উঠে পড়ি,"ভেজা টাওয়ালটা আবার এখানে?"

"আমি রাখিনি হানি, তুমি রেখেছ।"

"আ হা।"

Click Here For
More Books>>

banglabooks.in